ওদের জানিয়ে দাও

শাহরিয়ার কবির

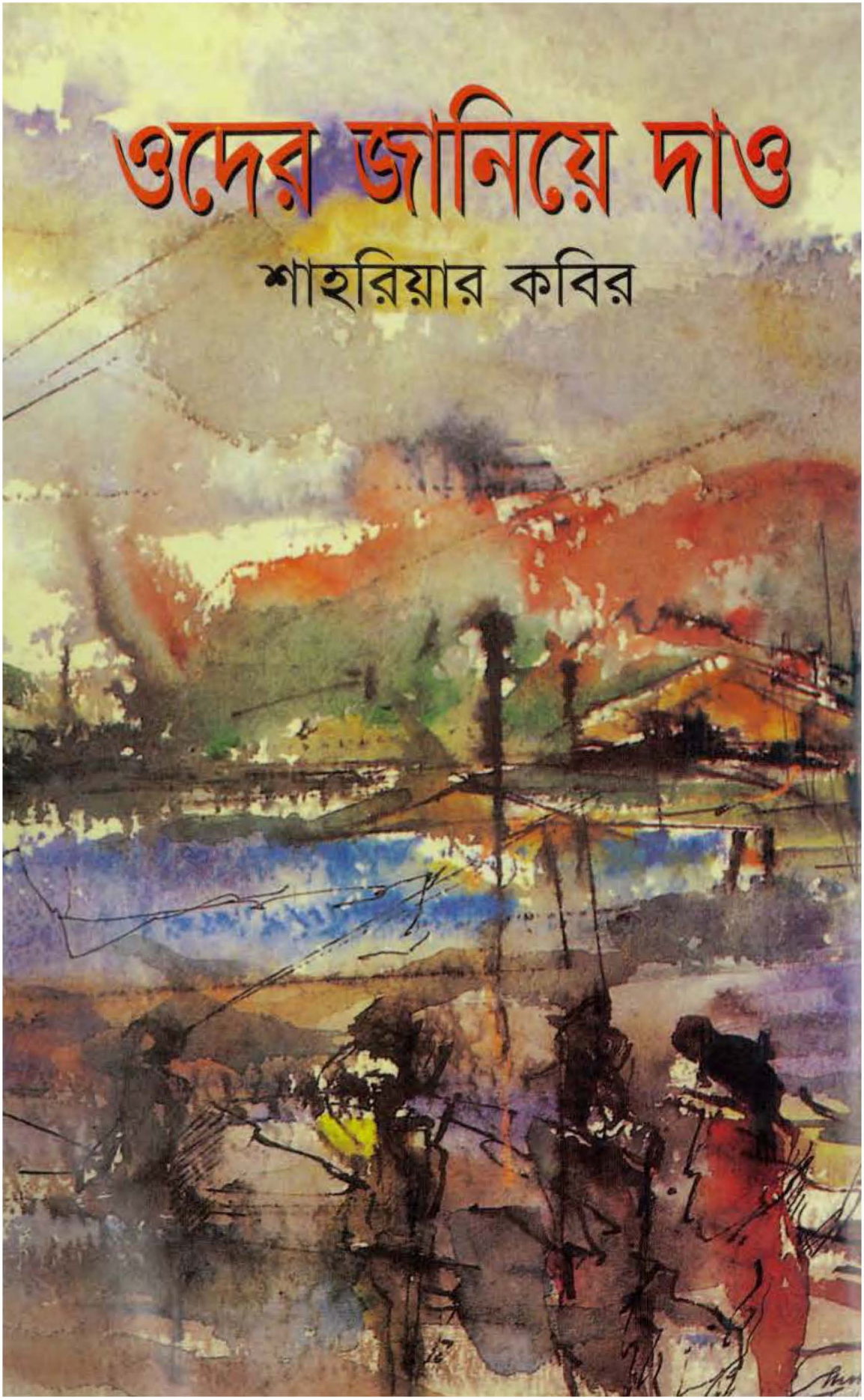

লেখকের অন্যান্য বই

পুবের সূর্য ❑ হারিয়ে যাওয়ার ঠিকানা ❑ নুলিয়াছড়ির সোনার পাহাড় ❑ একাত্তরের যীশু আবুদের এ্যাডভেঞ্চার ❑ কমরেড মাও সেতুঙ ❑ জনৈক প্রতারকের কাহিনী সীমান্তে সংঘাত ❑ নিকোলাস রোজারিওর ছেলেরা ❑ আনোয়ার হোজার স্মৃতি ঃ রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে ❑ হানাবাড়ির রহস্য ❑ মওলানা ভাসানী ❑ মিছিলের একজন পাথারিয়ার খনি রহস্য ❑ মহা বিপদসংকেত ❑ নিশির ডাক ❑ বার্চবনে ঝড় ক্রান্তিকালের মানুষ ❑ বিরুদ্ধ স্রোতের যাত্রী ❑ রাজপ্রাসাদের ষড়যন্ত্র ❑ কয়েকটি রাজনৈতিক প্রতিবেদন ও সাক্ষাৎকার ❑ কার্পেথিয়ানের কালো গোলাপ ❑ বহুরূপী অন্যরকম আটদিন ❑ চীনা ভূতের গল্প ❑ অন্তরঙ্গ হুমায়ূন আহমেদ ❑ অনীকের জন্য ভালবাসা ❑ বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার চালচিত্র ❑ গণআদালতের পটভূমি একাত্তরের পথের ধারে ❑ লুসাই পাহাড়ের শয়তান ❑ বাভারিয়ার রহস্যময় দূর্গ সাধু গ্রেগরির দিনগুলি ❑ আলোর পাখিরা ❑ বাংলাদেশে মৌলবাদ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ❑ হাত বাড়ালেই বন্ধু ❑ জাহানারা ইমামের শেষ দিনগুলি ❑ ঘাতকের সন্ধানে ❑ মরু শয়তান ❑ রত্নেশ্বরীর কালো ছায়া ❑ ভয়ঙ্করের মুখোমুখি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা ❑ শেখ মুজিব ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা রবিনের বিজয় ❑ অপহরণ ❑ মুক্তিযুদ্ধের বৃত্তবন্দী ইতিহাস ❑ নির্বাচিত রচনাবলী ❑ কিশোর সমগ্র ❑ একাত্তরের গণহত্যা নির্যাতন ও যুদ্ধপরাধীদের বিচার কাশ্মীরের আকাশে মৌলবাদের কালো মেঘ

লেখকের কথা

চুয়াত্তরের নভেম্বরের শেষের দিকেএই উপন্যাসটি সংক্ষিপ্ত আকারে সাপ্তাহিক বিচিত্রায় প্রকাশিত হয়েছিলো। ঠিক সেই সময়ের কিছু রাজনৈতিক চরিত্র ও ঘটনা এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। বলা যেতে পারে ঘটনার একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে বসে লেখা। দশ বছর পর গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার সময় মনে হলো, সময়ের পরিধি না বাড়ালে কিছু চরিত্র অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই বর্তমান গ্রন্থে এই উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনার সময়সীমা চুয়াত্তরের নভেম্বর থেকে পঁচাত্তরের জানুয়ারী পর্যন্ত বাড়াতে হয়েছে। অপ্রয়োজনীয় মনে করে কিছু অংশ বাদও দিয়েছি। এতে উপন্যাসের আঙ্গিকের কোন ক্ষতি হয়েছে কিনা সমালোচকরা বলবেন, আমি বিশ্বস্ত থাকার চেষ্টা করেছি কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতি। বিচিত্রায় এটি প্রকাশিত হবার পর বিভিন্ন মহলে প্রশংসা ও নিন্দার ঝড় বয়ে গিয়েছিলো। অনেকে ব্যাখ্যাও চেয়েছিলেন। একটি বিষয়ে বলা দরকার, বিচিত্রায় তখন বিশেষ কারণে উল্লেখ করতে হয়েছিলো 'উপন্যাসে বর্ণিত চরিত্রগুলো কাল্পনিক'—আসলে তা নয়। তবে কারো প্রকৃত নাম উল্লেখ করিনি এ কারণে যে, তাঁরা ছিলেন একটি গোপন বিপ্লবী দলের সদস্য। তাঁদের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করাটা হতো রাজনৈতিক অসততা। একই কারণে আসল জায়গার নামও গোপন রাখতে হয়েছে। যাঁদের প্রকৃত নাম ব্যবহার করা হয়েছে তাঁরা কেউ তখন গোপন কোন রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না।

উপন্যাসে পাদটিকা ব্যবহার অবাঞ্ছিত হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে পাঠককে সাহায্য করার জন্য তা করতে হয়েছে। যে রাজনীতি এ উপন্যাসের প্রধান বিষয় তার সব দিক আলোচনা সম্ভব হয়নি। কারণ সব সময় মনে রাখতে হয়েছে, আমি উপন্যাস লিখছি, প্রবন্ধ নয়।

উপন্যাসের নাম জহির রায়হানের একটি কবিতা থেকে নেয়া হয়েছে। এই নামে কবিতাটি ১৯৪৮ সালে 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো। প্রতিকূল এক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সাপ্তাহিক বিচিত্রায় এই উপন্যাসটি প্রকাশের সাহস প্রদর্শনের জন্য ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক শাহাদত চৌধুরী শুধু আমার নয় এই পত্রিকায় অসংখ্য পাঠকের প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। গ্রন্থ প্রকাশের মুহূর্তে তাঁর এই সাহসের কথা আবার স্মরণ করছি। ছাপাখানার কর্মীরা একুশে ফেব্রুয়ারী তারিখে এই উপন্যাসটি প্রকাশের জন্য যে প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছেন তাঁদের প্রতিও' এই সুযোগে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি

শা. ক.
জানুয়ারি ১৯৮৫

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে

প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ার বহু দিন পর ওদের জানিয়ে দাও-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো। বর্তমান সংস্করণে কিছু বানান এবং বাক্য গঠন পরিবর্তিত হয়েছে, যদিও মুদ্রণ প্রমাদ সম্পূর্ণ দূর করা যায়নি।

বর্তমান সংস্করণের জন্য নতুনভাবে প্রচ্ছদ এঁকেছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রশিল্পী মনিরুল ইসলাম। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি

শা. ক.
জুলাই ১৯৯৩

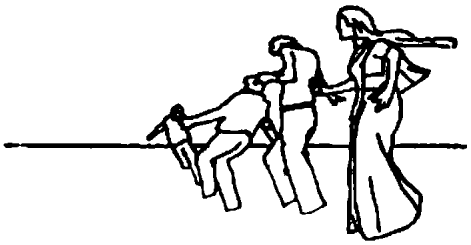

বিকেলের সূর্যকে আড়াল করে সে দাঁড়িয়েছিল। ওরা তিনজন ছিল সূর্যের মুখোমুখি। ওদের চোখের সামনে সে ছিল এক টুকরো জমাটবাঁধা কালো ছায়ার মতো। দুপুরের পর থেকে রোদ ঝলসানো শাণিত আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে সূর্যস্নাত তিনজন তরুণ তার কথাগুলো গভীরভাবে উপলব্ধি করতে চাইছিল।

শান্ত আবেগবর্জিত কণ্ঠে সে বলল, 'আমাদের এই যুগ আত্মরক্ষার নয়, আত্মত্যাগের যুগ। কমরেডস, কথাটা কখনোই ভুলে থাকা চলবে না। জীবন দেয়ার অগ্রাধিকার পেয়েছি বলেই তো আমরা কমিউনিস্ট। মহান নেতা কমরেড চারু মজুমদারের লেখা আপনারা পড়েছেন। শ্রেণীশত্রুর রক্তে হাত না রাঙালে কমিউনিস্ট হওয়া যায় না।'

দৈববাণীর মতো যে কথাগুলো সে ঈষৎ উঁচু জায়গা থেকে ওদের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছিল, তার প্রায় সবই ওদের জানা। প্রতিটি খতম অভিযানে যাওয়ার আগে এ ধরনের কথা ওদের শুনতে হয়। এ বিষয়ে কমরেড রফিকের কোন শৈথিল্য ওরা কখনো দেখে নি। মহান সি এম*-এর শ্রেণীশত্রু খতমের রাজনীতির প্রতি তার অবিচল আনুগত্য অল্প সময়ের ভেতর তাকে ওদের গোপন কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান ব্যক্তিতে পরিণত করেছে।

দুপুর থেকে বিকেলের পথে এগিয়ে চলা সূর্য তখনও সমান তেজে জ্বলছে। অনেকক্ষণ রোদ ঝলসানো আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকার জন্য ওদের চোখের সামনে অসংখ্য আলোর ফুলকি ইতস্তত ভেসে বেড়াচ্ছে। সামনে দন্ডায়মান কমরেড রফিককে মনে হচ্ছে কালো গ্রানাইট পাথর কেটে বানানো প্রাচীন কোন মূর্তি। তার চারপাশে সূর্যের ধারা বৃষ্টির মতো আকাশ থেকে গলে গলে পড়ছে।

নিরুত্তাপ কণ্ঠে রফিক বলল, 'কমরেড দীপুর প্রথম খতম অভিযান এটা। খতমের মাধ্যমে শত্রুর প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করুন। যে জোতদারকে আজ রাতে আপনি খতম করবেন তার চরিত্র সম্পর্কে নতুন কিছু বলার নেই। ওর সাড়ে চারশ বিঘা জমির ধান আমরা দরিদ্র ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিলিয়ে দেব। ঠিক এভাবেই আমরা রাষ্ট্রযন্ত্রকে আঘাত করে যাব। এগিয়ে যান কমরেডস, জয় আমাদের হবেই।'

দীপু, জাফর আর রাজু প্রায় নিষ্পলক চোখে দলনেতা রফিকের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। তার দীর্ঘ অবয়ব দীপুর চোখে ছায়া ফেলেছে। সামনে এগিয়ে এল সে। কালো ছায়া সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম আকাশের তেজী সূর্য দীপুর চোখের সামনে ঝলসে উঠল। মুহূর্তের জন্য সে চোখ বুজল। পকেট থেকে ছোট্ট কালো পিস্তলটা বের

*ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-র প্রয়াত নেতা চারু মজুমদার

করে রফিক ওর হাতের মুঠোয় ধরিয়ে দিল। ঠান্ডা ধাতব অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল দীপুর সারা শরীরে। ওর চোখে বুঝি মুহূর্তের জন্য ভয়ের ছায়া পড়েছিল। কমরেড রফিকের আবেগহীন ধারাল দৃষ্টি সেই ভয়ার্ত চোখকে ছুরির ফলার মতো গেঁথে ফেলল। ওর সারা মুখে হীরের কুচির মতো বিন্দু বিন্দু ঘামের কণা, সামনে শব্দহীন শালবন, অল্প দূরে নিঃশব্দে বহমান নদী, সিসার পাতের মতো মসৃণ আকাশ আর সঙ্গীদের নিরব উপস্থিতি— সব কিছু দীপুর চোখে অচেনা, অপার্থিব কোন জগতের মতো মনে হল।

রফিক নিরুত্তাপ কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'আপনি কি ভয় পেয়েছেন কমরেড?'

দীপুর বুকের ভেতর শীতল এক ধাতব কণ্ঠের প্রতিধ্বনি বেজে উঠল। ওর জন্য এটা এক অনাস্বাদিত অভিজ্ঞতা। সে তখন সম্পূর্ণ বোধশূন্য। কর্কশ এক কাক অবিরাম ডাকতে ডাকতে শালবনের দিকে উড়ে গেল। দীপুর পৃথিবী শব্দহীন। নদী থেকে এক ঝলক ঠান্ডা বাতাস উঠে এসে শালবনে কাঁপন ধরাল। রাজু আর জাফর একসঙ্গে দীপুর দিকে তাকাল। অস্তগামী সূর্যের উত্তাপ সংগ্রহ করে দীপু অস্ফুট কণ্ঠে বলল, 'না।'

ওকে আর কোনো কথা না বলে রফিক ওদের তিনজনের সঙ্গে একে একে হাত মেলাল। তারপর— 'আবার দেখা হবে', বলে দীর্ঘ পদক্ষেপে শালবনের দিকে এগিয়ে গেল। ওর কালো ছায়া আরও প্রলম্বিত হল। সেই ছায়াকে সঙ্গে নিয়ে সে শালবনের ভেতর হারিয়ে গেল।

রাজু বা জাফরের কাছে খতমের অভিজ্ঞতা নতুন নয়। নতুন দীপুর কাছে। এই খতমের অভিজ্ঞতা ওকে কমিউনিস্ট হিসেবে পার্টির স্বীকৃতি এনে দেবে। শ্রেণীশত্রুর রক্তে হাত না রাঙানো পর্যন্ত দীপু নিজেকে রফিকদের গোপন সংগঠনের সক্রিয় কর্মী ভাবতে পারছিল না। পার্টিতে যোগ দেয়ার আগে গোপন রাজনৈতিক কার্যকলাপ সম্পর্কে অদ্ভুত এক মোহ ছিল ওর। পার্টিতে ঢোকার পর প্রথম দিকে যথেষ্ট বিব্রত বোধ করত, যখন শুনত অন্য কমরেডদের শ্রেণীশত্রু খতমের বিচিত্র অভিজ্ঞতা। নিজেকে তখন মনে হত বহিরাগত। পার্টিতে তখন শ্রেণীশত্রু খতম করা ছিল কমিউনিস্ট হওয়ার একমাত্র মাপকাঠি। ইচ্ছার গভীরে দীপু বার বার কমিউনিস্ট হতে চেয়ে রক্তাক্ত হয়েছে। ওর ইউনিটের রাজু আর জাফরকে বারবার বলেছে সুযোগ দেয়ার জন্য। জাফর কখনো ওর অদম্য উৎসাহকে লঘু পরিহাসে ডুবিয়ে দিয়েছে, আবার কখনো নিজের অভিজ্ঞতাকে ভয়াবহভাবে বর্ণনা করেছে। তবু দীপু বলেছে— 'পারব'। মনে মনে বলেছে, 'পারতেই হবে'।

রফিক ভাই নিজে ওর হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছে। চাদরের ভেতর বুকের কাছে পকেটে রাখা ঠান্ডা ভারী সেই পিস্তলের স্পর্শ দীপুকে বারবার শিহরিত করে। এ যেন এক নতুন দীক্ষা। রফিক ভাই'র একটা লেখায় দীপু পড়েছে, 'মহান নেতা চারু মজুমদার আমাদের গুরু। তাঁকে আমরা দেখিনি তবু আমরা একলব্যের মতো তাঁর সংগ্রামী ও নিবেদিত শিষ্য।'

পার্টিতে ঢোকার এক বছর পর দলের নেতা রফিককে এবারই প্রথম দেখল দীপু। বয়স বেশি নয়। রাজুদের চেয়ে তিন চার বছরের বড় হবে। মাত্র তিরিশের কোঠায় পা দিয়েছে, অথচ চেহারায়, চলা-ফেরা আর কথায় সুস্পষ্ট কর্তৃত্ব ছড়িয়ে রয়েছে। তার

অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, শাণিত কণ্ঠস্বর আর শক্ত হাতের ঘর্মাক্ত স্পর্শ—সব কিছু মিলিয়ে আনন্দ, উত্তেজনা আর ভয়ের অবিমিশ্র অনুভূতি দীপুর চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। ওর উত্তেজনাকে রফিক ভাই অন্য কিছু ভেবেছে। ভয় ছিলো রফিক ভাইকে, খতমকে নয়। দীপু ধীরে ধীরে অনুভব করল— ভয় নয়, রফিক ভাই'র অস্তিত্ব ওর চেতনা জুড়ে প্রচন্ড সাহসের মতো অবস্থান করছে।

রাজু এগিয়ে এসে দীপুর কাঁধে হাত রাখল। দীপু কোন কথা না বলে নির্বিকার দাঁড়িয়ে রইল— আত্মমগ্ন ভঙ্গিতে। ওর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর রাজু বুঝতে পারল, অচেনা এক ভয় থেকে নিজেকে মুক্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। এরকম সবারই হয়। শুধু ঘৃণা দিয়ে ভয় অথবা ভালোবাসাকে অতিক্রম করা যায় না। আদর্শের বলিষ্ঠ ভিত্তি থাকা দরকার। নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে দীপুকে অনুভব করতে চাইল রাজু। মৃদু হেসে বলল, 'ভয় কি দীপু, আমরা তো আছি!'

দীপুর জন্য জাফরের দুঃখ হল। এমনও সময় ছিল যখন এক রাতে সতেরটা শ্রেণীশত্রু খতম করেও জাফর বিচলিত হয়নি। হাতে লেগে থাকা রক্ত হয়তো সবটুকু না ধুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমের ভেতর রাজু, পূরবী কিম্বা অন্য কোনো কমরেড সেই রক্ত ধুয়ে দিয়েছে। পরদিন কমরেডরা জাফরের অভিজ্ঞতা শুনে রোমাঞ্চিত হয়েছে, কেউ হয়তো ঈর্ষাও করেছে। সবচেয়ে সাহসী পার্টিজান হিসেবে জাফরের পরিচিতি জেলার বাইরেও বিস্তৃত। এখন অবশ্য খতমের আগে জাফরকে অনেক কিছু ভাবতে হয়। রাজুই তাকে বাধ্য করেছে ভাবতে।

রাজুর এখনকার চিন্তাভাবনা জাফরের কাছে পুরোপুরি স্বচ্ছ মনে না হলেও ওর ভেতর যে পরিবর্তন এসেছে এটা জাফর ছাড়াও পার্টির অনেকে লক্ষ্য করেছে। রফিক সহ পার্টির অন্যান্য নেতারা জাফরকে তার পুরোনো দিনের কথা বলে উদ্দীপ্ত করতে চায়, রাজুর প্রতি নির্ভরশীলতার জন্য সমালোচনাও করে। জাফর ক্রমশ বুঝতে পারছে রাজুকে তার নবতর উপলব্ধির জন্য বর্তমান নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সরাসরি সংঘর্ষে আসতে হবে। মহান নেতা কমরেড চারু মজুমদারের খতমের রাজনীতি থেকে রাজু ধীরে ধীরে সরে আসছে। গত এক বছরে রাজু একবারও খতম অভিযানে যায়নি। জাফর গিয়েছে কিছুটা আড়ষ্টতা নিয়ে, এখন যেমন যাচ্ছে দীপুর সঙ্গে।

দীপু যখন জাফরকে খতম অভিযানে অংশ নেয়ার কথা বলল, জাফর তখন ওকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু দীপুকে বোঝানো যায়নি। খতমে যাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল ও। জাফর একরকম বাধ্য হয়েই রফিককে দীপুর কথা বলেছে। তবে হালদার হাটের সাহেবালী মন্ডল যদিও তালিকার প্রথম দিকে ছিল, তাকে খতম করার সিদ্ধান্ত রাজু সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। রাজু তার ফোরামে রফিকের মুখের উপরই বলেছিল, 'সাহেবালীকে খতম করা ঠিক হবে না।'

অত্যন্ত শীতল কণ্ঠে কমরেড রফিক জানতে চেয়েছে— 'কেন!'

একটু দমে গিয়ে রাজু জবাব দিয়েছে, 'হালদার হাটে পার্টির তেমন কোনো কাজ নেই। তাছাড়া সাহেবালীকে সেভাবে শ্রেণীশত্রু হিসেবে চিহ্নিত বা প্রচার করা হয়নি....।'

বাধা দিয়ে রফিক কর্তৃত্বব্যঞ্জক কণ্ঠে অনুশীলন, প্রয়োগ, শৃঙ্খলা এসব বিষয়ের

ওপর এক দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে বলেছিল, 'এটা পার্টির সিদ্ধান্ত। দীপুর সঙ্গে তুমি আর জাফর দুজনেই যাবে।'

রাজু চুপ করে ছিল। রফিক ওর নিরব প্রতিবাদকে প্রতিহত করার জন্য বলেছিল, 'মহান নেতার রাজনীতি তুমি এখনো গ্রহণ করতে পারনি। যথেষ্ট সময় দেয়া হয়েছে তোমাকে। আমি চাই না তোমার প্রভাবে পূরবী, জাফর বা দীপুর মতো কমরেডরা নিষ্ক্রিয় হয়ে যাক। তোমার নিষ্ক্রিয়তাকে আমরা পার্টিবিরোধী কাজ হিসেবে ধরে নিতে বাধ্য হব।' রফিকের এসব কথা জাফর শুনেছে রাজুর মুখে।

দীপু অবশ্য অনেক ঘটনাই জানত না। আজ রাতে ও একজন ঘৃণ্য শ্রেণীশত্রু খতম করবে, অথচ রাজু আর জাফরের মতো কমরেডরা তাকে উৎসাহিত করছে না— উদ্দীপনার পাশাপাশি অন্য এক ধরনের অনুভূতি সমানভাবে ওকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো।

দীপুর মুখের দিকে তাকিয়ে জাফরের মনে হল, ঝড়ে সমুদ্রে দিশেহারা কোন নাবিকের মতো। জাফর ওর কাছে এসে হালকা গলায় বলল, 'প্রথম খতমের সময় আমারও এরকম হয়েছিল দীপু। পরে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

দীপু একবার জাফরের দিকে, আরেকবার রাজুর দিকে তাকাল। রাজু কিছু না বললেও দীপু অন্তত এটুকু বুঝতে পেরেছে, রফিক ভাই'র খতম সম্পর্কে যতটা আগ্রহ রাজুর অনাগ্রহ তার চেয়ে এতটুকু কম নয়। কয়েকবার রাজুকে সে প্রশ্নও করেছিল। উত্তর এড়িয়ে রাজু অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করেছে। তবু সেই মুহূর্তে রাজুর চোখের দিকে তাকিয়ে পরম নির্ভরতা খুঁজে পেল সে। জাফরের চোখে ওর জন্য উদ্বেগ দেখে মৃদু হাসল দীপু। বলল, 'তোমরা যখন আছো তখন ভয় কি কমরেড!'

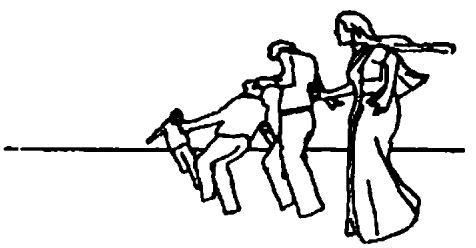

শালবনের ভেতর থেকে একঝাঁক হলুদ পাখি বেরিয়ে এসে খোলা আকাশে ছড়িয়ে পড়ল। তখনও সন্ধ্যা হয়নি। ঝকঝকে সাদা রোদের তেজ মরে গিয়ে শেষ বিকালের নরম কমলা রঙের আলো ফাঁকা মাঠে আর শাল গাছের পাতা জড়িয়ে শুয়ে আছে। নভেম্বরের বাতাসে মৃদু শীতের আমেজ। শালবনের ভেতর রূপোলি ফিতের মতো শান্ত নদীর তীরে সবুজ ঝোপে বিচিত্র বর্ণের গুচ্ছ গুচ্ছ ঝুমুর ফুল ফুটেছে। কর্পূরের মতো মিষ্টি ঝাঁঝালো গন্ধে বাতাস উতলা হয়ে বইছে।

ওরা তিনজন শালবনের ভেতর অনেক দিনের পুরোনো প্রায় বুজে আসা পায়ে চলার পথের চিহ্ন ধরে হাঁটছিল। পুরো ছয় মাইল পথ যেতে হবে বনের ভেতর দিয়ে। জাফর হালকা গলায় বলছিল, 'গ্রামের লোকদের দূরত্ব সম্পর্কে ধারণা কিন্তু খুব মজার।

আমি প্রথম যেবার হালদার হাটে গেলাম— পথে একজনকে জিজ্ঞেস করতে বলল, এইতো বাঁক পেরুলি হালদার হাট। বাঁক পেরিয়ে আরেকজনকে জিজ্ঞেস করলাম। সে বলে, এখান থেকে মাইল সাতেকের কম হবি না। বোঝ তখন আমার কী অবস্থা!'

জাফরের বিড়ম্বনার কথা মনে করে ওরা একসঙ্গে হেসে উঠল। ওদের চোখের সামনে তীরের ফলার মতো বিশাল এক ঝাঁক বুনো হাঁস উড়ে গেল। আকাশের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে জাফর বলল, 'বিলে এবার প্রচুর পাখি এসেছে। কাল সাইবেরিয়ান ডাক দেখেছি।'

কথা বলতে বলতে জাফরের চোখ দুটো স্বপ্নময় হয়ে অতীতের কোন সুখকর মুহূর্তের কাছে চলে গেল। অনেক কথা ভুলে গেলেও অতীতের কিছু স্মৃতি এখনও ওর মনে হেমন্তের শেষ বিকেলের রোদের মতো কোমল উত্তাপ ছড়ায়। জ্যোৎস্নাভরা কুয়াশাচ্ছন্ন রাতের বুনো হাঁসের ঝাঁক এখনও ওর স্বপ্নের ভেতর অবিরাম ডানা মেলে উড়ে বেড়ায়। জাফর আপন মনে বলে, 'আট বছর আগে বাবার সঙ্গে এই বিলে পাখি শিকার করতে এসেছিলাম। মনে হয় সেদিনের কথা।'

জাফরের স্বপ্ন কিছুক্ষণের জন্য দীপুকেও আচ্ছন্ন করে। দীপু বিড় বিড় করে বলে, 'সময় খুব তাড়াতাড়ি চলে যায়।'

এরপর অনেকক্ষণ ওরা কোন কথা না বলে হাঁটল। বনের ভেতর গাছের নিচে অন্ধকার দ্রুত জমাট বাঁধছিল। পাখিদের কোলাহল কমে আসছিল। বাসি রক্তের মতো পশ্চিমের কালচে লাল আকাশের দিকে তাকিয়ে দীপু বলল, 'আমরা ঠিক পথে যাচ্ছি তো রাজু?'

রাজু ম্লান হাসল, 'অনেক দিনের চেনা পথ। ভুল হবার তো কথা নয়।'

জাফর রাজুর দিকে তাকিয়ে রসিকতা করতে চাইল— 'আমার কিন্তু ধারণা ছিল আমরা ভুল পথে যাচ্ছি।'

রাজু কি যেন ভাবছিল। অন্যমনস্কভাবে দীপুকে বলল, 'একটু পরেই চাঁদ উঠবে।'

জাফরের মনে পড়ল আজ পূর্ণিমার রাত। ওর কৈশোর আর বয়সন্ধির অনেক দুর্লভ সময় এই শালবনের ভেতর ছড়িয়ে আছে। তখন ছিল আবিষ্কারের সময়, যে বয়সে অনেক পরিচিত দৃশ্যও হঠাৎ অন্যরকম মনে হয়। দীপুর পথ হারাবার উদ্বেগ লক্ষ্য করে জাফর মনে মনে হাসল। এখন এমনই সময় হারিয়ে যেতে চাইলেও যাওয়া সম্ভব নয়। কৈশোরের সেই রূপোলি দিনগুলো ছিল অন্যরকম। ইচ্ছে হলে তখন নিজের কাছেই হারিয়ে থাকা যেত। বার বার নিজের ভেতর নিজেকে হারিয়ে ফেলা আর খুঁজে বেড়ানোর ভেতর এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ রয়েছে। জাফর আপন মনে বলল, 'সেবার আমি পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম।'

দীপু চমকে উঠল, 'কখন, কোথায়?'

আগের মতো স্বপ্নের ঘোরে জাফর বলল, 'বাবার সঙ্গে শিকারে এসেছিলাম। বুঝলে দীপু, শিকারে এলে আমরা কয়েকদিন বনে কাটাতাম। সারাদিন বনে ঘুরতাম। বাবা আমাকে গাছ চেনাতেন আর পাখি মারতেন। আমার কাজ ছিল কুড়িয়ে আনা। সঙ্গে অবশ্য লোক থাকত। পাখি আর বুনো ফুল দেখে সময় কাটত। বিলের ধারে কয়েক

জায়গায় এ সময়ে নাগেশ্বর ফোটে। জ্যোৎস্নায় এই ফুল হালকা গন্ধ ছড়ায়। দিনে গোলাপি আর বেগুনি ফুলগুলো সারা বন আলো করে রাখে। . . .'

কথা বলতে বলতে জাফর স্বপ্নের গভীরে যেতে থাকে—'সেবার শিকারে এসে বাবা আমাকে বন্দুকের তাক শিখিয়েছিলেন। সেই থেকে আমার গুলি ফসকায় না।'

আকাশে তখন পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে। চাঁদের আলোছায়ায় হাঁটতে হাঁটতে জাফরকে অন্য কোনো জগতের অধিবাসী মনে হয় দীপুর। একটু পরে ও সাহেবালী মন্ডল নামের অচেনা এক ব্যক্তিকে শ্রেণীশত্রু হিসেবে গুলি করে মারতে যাচ্ছে। জীবনে প্রথমবারের মতো একজন মানুষকে সে হত্যা করবে। সাহেবালী লোকটা কেমন দেখতে? বয়স কত? ওর কি কোন সন্তান আছে? মা বাবা বেঁচে আছে? দুপুরে রফিকের কথা শুনে কুৎসিৎ দর্শন স্থূলকায় এক ব্যক্তিকে শ্রেণীশত্রু সাহেবালী হিসেবে কল্পনা করেছিল দীপু। তখন মনে হয়েছিল অনায়াসে একশ সাহেবালীকে হত্যা করতে পারে সে। জাফরের স্বপ্নের কথা শুনতে গিয়ে, চাঁদের নরম আলোর সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে একবার ওর মনে হল, গুলি যদি ফসকে যায় তাহলে কী হবে? কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক অচেনা ভয় ওর বুকের ভেতর বাসা বাঁধতে থাকে।

রাজু অনেকক্ষণ কথা না বলে চুপচাপ হাঁটছিল। দীপু বলল, 'তুমি তো তদন্ত করতে গিয়েছিলে রাজু। সেদিন তুমি রফিক ভাইকে কেন বললে খতম ঠিক হবে না? তুমি কি বলতে চাও তিনি ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?'

রাজু ভেবেছিল ওর সঙ্গে নেতৃত্বের মতবিরোধের কোন কথা দীপু জানে না। একবার দীপুর মুখের দিকে তাকাল। দীপুর নিষ্পাপ চোখ দুটো ওকে বলে দিল, ভয়ের কোন কারণ নেই। দীপু কখনো রাজুকে ছেড়ে যাবে না। তবু রাজু সাবধানে বলল, 'কথাটা আমি তদন্তের ভিত্তিতেই বলেছিলাম।'

'আমি তোমার কাছে সেই তদন্তের কথাই শুনতে চাই।' একটু থেমে দীপু সরাসরি রাজুকে প্রশ্ন করল, 'তুমি কি বলতে চাও এ লোকটা ঘৃণ্য জোতদার নয়? গরিব কৃষকদের শোষণ করে না?' বলতে বলতে ঘৃণা আর উত্তেজনায় কেঁপে উঠল দীপু।

রাজু শান্ত গলায় বলল, 'যারা শোষিত আর অত্যাচারিত তারা কি চায় সাহেবালীকে হত্যা করা হোক? আমি মনে করি আমাদের কাজ হওয়া উচিৎ শ্রেণীশত্রু সম্পর্কে কৃষকদের ব্যাপকভাবে সচেতন এবং ঐক্যবদ্ধ করা। শত্রুকে সামনে রেখেই এটা করা সম্ভব, তাকে হঠাৎ গোপনে হত্যা করে নয়। চীনে, ভিয়েতনামে প্রকাশ্য গণ আদালতে বিচার করেই শ্রেণীশত্রুদের হত্যা করা হয়েছে।'

একটু থেমে রাজু আবার বলল, 'হালদার হাটে সাহেবালীর চেয়েও ঘৃণ্য শত্রু আছে। স্বাধীনতার পর থেকে নূরুল গাজী আর রতন সাঁই আওয়ামী লীগের নেতাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কোটি কোটি টাকার ধান, পাট আর ওষুধ পাচার করছে ইন্ডিয়ায়। ওদের বিরুদ্ধে আমাদের কোন বক্তব্য নেই, কারণ ওদের তেমন কোন জমি নেই। ওদের টাকা জমছে ইন্ডিয়ার ব্যাংকে। গ্রামেও তেমন থাকে না ওরা। আওয়ামী লীগ জাসদ সব দলেই মোটা চাঁদা দেয়। রফিক ভাই বলছেন, আমাদের প্রধান দ্বন্দ্ব সামন্তবাদের সঙ্গে। তাঁর বিচারে নূরুল গাজী আর রতন সাঁইদের চেয়ে সাহেবালী বড়

শত্রু। কারণ ওর জমি বেশি।'

দীপু বলল, 'আমরা তো রতন সাঁইদেরও খতম করতে পারি। আমি শুনেছি রতন সাঁই গত রোববার বাড়ি এসেছে।'

রাজু একবার দীপুর দিকে, আরেকবার জাফরের দিকে তাকাল। জাফর তখনও স্বপ্নের ভেতর ডুবে আছে। রাজু শান্ত গলায় দীপুকে বলল, 'এই মুহূর্তে আমি কাউকেই খতম করতে বলব না।'

দীপু কি যেন বলতে যাচ্ছিল— বাধা দিয়ে রাজু বলল, 'খতমের লাইন সম্পর্কে তোমার সঙ্গে পরে কথা বলব।'

রাজু জানে রফিক জেনেশুনেই ওকে একটা ভুল খতমে পাঠিয়েছে। নিজের মতের কোনরকম বিরোধিতা সে মানতে রাজী নয়। অনেক তর্ক করেছে রফিকের সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত রফিক যখন বলে, 'এটাই কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত' তখন রাজুর আর কিছু করার থাকে না। ক্ষুব্ধ হয় রহমান ভাইদের ওপর, যাঁরা রফিকদের আগে পার্টির নেতৃত্বে ছিলেন, খতমের লাইনকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেননি বলে যাঁদের নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। রাজু ভাবে অন্তত রহমান ভাই যদি এ সময় বলিষ্ঠভাবে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরতেন তাহলে রাজুদের এতটা অসহায় অবস্থায় পড়তে হত না। যে পার্টিকে বাইরের সবাই রহমান ভাইর নামে চেনে, সেখানে তিনি রফিকদের আমলাতান্ত্রিকতার চাপে কোনঠাসা হয়ে রয়েছেন। মাঝে মাঝে রাগও হয় রহমান ভাই'র ভীরুতা দেখে। দু'মাস পরে পার্টির কংগ্রেস। কেন্দ্র সিদ্ধান্ত নিয়েছে সি এম বিরোধীদের পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হবে। বেশি বিপদজনকদের খতমও করা হতে পারে। রাজু ভাবতে থাকে নিজের পরিণতির কথা। কেন্দ্রীয় কমিটি ওর বিরুদ্ধে নেতৃত্বকে অমান্য করার গুরুতর অভিযোগ আনবে। আট বছর পার্টি করার পর, পার্টির জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করার পর, চার বছর আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকার পর, বিশ্বাসঘাতকের অপবাদ নিয়ে ওকে পার্টি থেকে বেরিয়ে যেতে হতে পারে। মাঝে মাঝে নিজের ওপরই রাগ হয়। রাজু একবার বলেছিল, খতমের ওপর পার্টিতে দুই লাইনের সংগ্রাম চালাতে। কেন্দ্র ওর প্রস্তাব বাতিল করে দিয়েছে। নির্মম এক দ্বন্দ্বের আর্বত থেকে রাজু মুক্তির কোন পথ খুঁজে পায় না।

জাফর এ সম্পর্কে কিছুই ভাবতে চায় না। ও জানে রাজু ঠিকই পথ খুঁজে বের করবে। রাজু যদি ওকে বলে রফিককে খতম করা দরকার, জাফর এতটুকু দ্বিধাবোধ করবে না। সাহেবালী খতমের ব্যাপারে রাজুর উৎসাহ না দেখে জাফর প্রথম সায় দেয়নি। পরে দীপুর একগুঁয়েমিতে নিজেও বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। দীপুর ঘোর কাটতে সময় লাগবে। মাঝে মাঝে নিজেকে পেশাদার খুনীর মতো মনে হয়। রক্তাক্ত স্মৃতি ভুলে থাকার জন্য স্বপ্ন ওর একমাত্র আশ্রয়। কখনও স্বপ্নের ভেতরও রক্তাক্ত লাশগুলো এসে হাজির হয়, গুলিবিদ্ধ রক্তমাখা বুনোহাঁসের আর্তি নিয়ে।

রাত খুব বেশি হয়নি। তবু গোটা শালবন জুড়ে শুকনো পাতা মাড়িয়ে তিন জোড়া পায়ের চলার শব্দ ছাড়া তখন আর কোন শব্দ ছিল না। এদিকটায় গাছপালা খুব ঘন নয়। অকৃপণ ধারায় জ্যোৎস্নার ঝর্ণা নেমে এসেছে শালগাছের শরীর বেয়ে। দীপুর মনে হল ওরা যেন সভ্য জগৎ থেকে বহু দূরে অন্য কোন গ্রহে চলে এসেছে। এ জগতের

বাইরে আরেকটা জগৎ আছে, যেখানে ওর মা থাকেন, তিতাসের তীরে এক গ্রামে। সেখানে হাসিনা নামের স্নিগ্ধ সরল এক মেয়ে তার দীপু ভাইর বাড়ি ফেরার অপেক্ষায় দিন গোনে। মা হয়তো এখন এশার নামাজের পর জায়নামাজে বসে ওজিফা পড়ছেন, কিম্বা কোন প্রতিবেশী মহিলার সঙ্গে গুনগুণ করে কথা বলছেন। আর হাসিনা হারিকেনের আলোয় চন্দন কাঠের বাক্সে জমিয়ে রাখা দীপুর চিঠি পড়ছে। চিঠি যা লিখেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়। পার্টিতে যোগ দেয়ার পর যেগুলো লিখেছে, সেগুলোকে চিঠি না বলে চিরকুট বলাই ভালো। হাসিনা একথা অনেকবারই ওকে লিখেছে, রাতে যখন কোনো কাজ থাকে না, একা সময় কাটতে চায় না, তখন তোমার পুরোনো চিঠিগুলো বার বার পড়ি। তুমি যদি রোজ চিঠি লিখতে! তোমার চিঠির গায়ে চন্দনের গন্ধ মাখা থাকে।

হঠাৎ একটা কাক ডানা ঝাপটে কর্কশ শব্দে ডেকে ওঠে। দীপু নিজের জগতে ফিরে আসে। এসব কথা এখন কেন ওর মনে হচ্ছে? সে তো স্বেচ্ছায় সকল বন্ধন ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছে! রফিক ভাই'র কাছে দীপু ভীরু, অক্ষম কর্মী হিসেবে চিহ্নিত হতে চায় না। সাহেবালীকে খতম করার পর বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে দীপুর সবরকম সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে, তবু এসব কথা সে আর ভাববে না। কি মনে হতে রাজুকে প্রশ্ন করল, 'এ পর্যন্ত তুমি কতগুলো খতম করেছো রাজু?'

প্রশ্নটা দীপু হালকা গলায় করলেও রাজু চমকে উঠল। মনে হল দীপু নয়, এ প্রশ্ন যেন ওর ভেতর থেকে কেউ করেছে। বিড় বিড় করে বলল, 'জানি না দীপু, মনেও রাখতে চাই না।'

দীপু সরাসরি রাজুর মুখের দিকে তাকাল— 'কটা খতম করেছো মনে রাখার দরকার নেই বলতে চাও?'

রাজু হাঁটতে হাঁটতে দীপুকে একবার দেখল। সরল কৌতূহল ছাড়া সেখানে অন্য কিছু নেই। বলল, 'ঠিক মনে নেই। দশ বারোটা হতে পারে। সবই একাত্তরের যুদ্ধের সময়। রাজাকার অবশ্য শ্রেণীশত্রুর ভেতর পড়ে না।' থেমে থেমে কথা শেষ করল রাজু।

দীপুর কপালে সামান্য ভাঁজ পড়ল। মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আর জাফর?'

দীপুর কণ্ঠে উত্তেজনা লক্ষ্য করে জাফর হেসে ফেলল— 'রাজুর চেয়ে আমি অনেক বেশি খতম করেছি দীপু। পার্টিতে সম্ভবত আমার চেয়ে বেশি কেউ করেনি।'

'সংখ্যাটা কি তোমারও মনে নেই?'

দীপুর কণ্ঠস্বর ঈষৎ তীক্ষ্ণ মনে হল। একটুকরো ধারালো হাসির রেখা ফুটে উঠল জাফরের ঠোঁটের ফাঁকে। গম্ভীর গলায় বলল, 'তিনশ সাতাশিটা খতম আমি নিজ হাতে করেছি।' তারপর একটু থেমে স্বগতোক্তির মতো উচ্চারণ করল— 'আমি কিছুই ভুলি না দীপু। প্রত্যেকটা খতমের কথা আমার মনে আছে।'

চাঁদের কুয়াশা ভেজা আলোয় দীপুকে কিছুটা বিষণ্ন আর অসহায় মনে হল জাফরের। গভীর মমতায় বুকটা ভরে গেল। জাফরের চেয়ে বয়সে দু'তিন বছরের ছোটই হবে। বয়ঃসন্ধির কিছু নিষ্পাপ বিশ্বাস এখনো ওকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

জাফরের মনে পড়ল আট বছর আগের এক জ্যোৎস্নাভেজা রাতের কথা। মৃদু কণ্ঠে দীপুকে বলল, 'জানো দীপু, একবার বাবার সঙ্গে এই বনে শিকারে এসে এরকম একরাতে আমি হারিয়ে গিয়েছিলাম। এই বন তখন আরো গভীর ছিল। সন্ধ্যার দিকে বিল থেকে ওঠে আসা বুনোহাঁসের এক বড় ঝাঁকের ওপর বাবা আর আমি একসঙ্গে গুলি করেছিলাম। অনেকগুলো হাঁস গুলি খেয়ে বনের ভেতর ছড়িয়ে পড়েছিল। আমি মরা হাঁসগুলো খুঁজছিলাম। কয়েকটা খুঁজে পেলাম। আরও খুঁজলাম। খুঁজতে খুঁজতে পথ হারিয়ে বিলের বঁকে চলে এলাম। চাঁদ তখন মাথার ওপর। যখন মনে হলো আমি হারিয়ে গেছি, তখন ভীষণভাবে বাবার অভাব অনুভব করলাম। মনে হলো বাবাকে না পেলে কোনোদিন আর এই বন থেকে বেরোতে পারবো না। হাতে ধরা মরা হাঁসগুলোর মতো অসহায় মনে হচ্ছিল নিজেকে। ভীষণ কান্না পাচ্ছিল। বিড় বিড় করে শুধু বাবাকে ডাকছিলাম। হঠাৎ বহুদূরে বাবার গলা শুনলাম। বাবা আমার নাম ধরে ডাকছিলেন। বনের ভেতর বাবার গলার প্রতিধ্বনি হচ্ছিল। মনে হল সারাবন জুড়ে বাবা আমাকে ডাকছেন। তারপর বাবাকে দেখলাম। ঠিক তখনই সাদা মেঘের মতো এক ঝাঁক বুনোহাঁস বিলে এসে নামল। রূপোলি আয়নার মতো স্থির পানি ওদের ডানা ঝাপটানিতে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। আমাদের দিকে ওরা ফিরেও তাকায়নি। বাবা কাছে এসে বললেন, 'অনেক মেরেছি, আর নয়। চল ফিরে যাই।'

কথা বলতে বলতে জাফর স্বপ্নের সিড়ি বেয়ে আট বছর আগের জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল এক স্মৃতিভেজা সময়ের কাছে আত্মসমর্পণ করল, যেখানে পূর্ণিমার আকাশের নিচে কোনো রূপোলি জলাশয়ে হাজার হাজার বুনোহাঁস অবিরাম ডানা ঝাপটায়।

দীপু ভাবছিল, জাফর কত অনায়াসে স্বপ্নের কাছে সমর্পিত হতে পারে, অথচ আজ রাতে ওকে একজন মানুষের মৃত্যু দেখতে হবে। বুকের কাছে লুকিয়ে রাখা পিস্তলের ঠান্ডা ধাতব অনুভূতি ওর সারা শরীরে অনুভব করল।

রাজু দেখল, নভেম্বরের হিমেল রাতে দীপুর কপালে হীরের কুচির মতো ঘামের কণা জমেছে। কাছে এসে ওর কাঁধে হাত রাখল। দীপুর ভেতর প্রচন্ড সম্ভাবনা রয়েছে। অথচ একটা ভুল খতমের অভিজ্ঞতা ওর সকল সম্ভাবনাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে পারে। দীপুর কথা ভেবে নিজেকে বড় অসহায় মনে হল রাজুর। রফিকের বিরুদ্ধাচরণ করে পার্টিতে টিকে থাকা যে কি ভয়ঙ্কর দুঃসাধ্য কাজ— অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে রাজু সেটা ভালোভাবেই জানে।

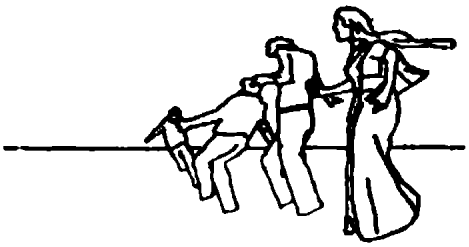

রাজুদের স্কোয়াডকে খতমে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে রফিক পার্টিতে গোপন আস্তানায় ফিরে দেখে— গোটা কেন্দ্রীয় কমিটি ওর জন্য অপেক্ষা করছে। একরকম তাড়াহুড়ো

করেই সিসি*র বৈঠক ডেকেছিল রফিক। পাঁচটি জেলা থেকে রিপোর্ট এসেছে— সেখানকার কমিটি মহান নেতা চারু মজুমদারের খতমের লাইন সঠিক মনে করে না। দলের ভেতর এক ধরনের উপদলীয় চক্রান্ত চলছে এটা সে বেশ কিছুদিন ধরে বুঝতে পারছিল। এর জন্য যে বুড়ো মতিউর রহমানই দায়ী— এতো সন্দেহের কোনো কারণ নেই। চিরকাল কমিউনিস্ট পার্টি করার নামে মওলানা ভাসানীর ন্যাপ আর কৃষক সমিতি করে শ্রেণী আপোষের লাইন বুড়োর মাথায় গিজগিজ করছে। সিএম লাইন পার্টিতে গৃহীত হওয়ায় আগে পর্যন্ত মতিউর রহমানই ছিলেন পার্টির অবিসম্বাদী নেতা। সত্তুরের বিশেষ কংগ্রেসে নতুন লাইন গ্রহণ করার পর মতিউর রহমান স্বেচ্ছায় নিজেকে মূল নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে নিয়েছেন। তবে গোপনে শ্রেণী আপোষের লাইন সুযোগ পেলেই কর্মীদের কাছে প্রচার করেছেন। পার্টির গৃহীত রাজনীতি এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে রক্ষার জন্য অবিলম্বে কিছু সিদ্ধান্ত নেয়া তাই জরুরি হয়ে উঠেছিল। সিদ্ধান্ত কি নেবে রফিক সেটা আগেই ভেবে রেখেছে। বৈঠক ডেকেছে আনুষ্ঠানিকভাবে কেন্দ্রের অনুমোদনের জন্য। তবে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হলেও মতিউর রহমান এ বৈঠকে নেই। তিনি এখন জেলার বাইরে।

যমুনার পুব তীরে এক ছোট্ট মফস্বল শহরের উপকণ্ঠে পার্টির পুরোনো শেল্টারে কেন্দ্রের বৈঠক বসেছে। সন্ধ্যার পর থেকে বৈঠকের সবাই তুমুল আলোচনায় উত্তপ্ত। পাঁচটি জেলার রিপোর্ট পর্যালোচনার পর রফিক মতিউর রহমানের প্রসঙ্গ টানলো— 'আপনারা এটা ভাল করেই জানেন কমরেডস, জেলা কমিটিগুলো এ ধরনের রিপোর্ট কখনোই কেন্দ্রে পাঠানোর সাহস করতো না, যদি না কমরেড রহমান এদের প্রশ্রয় দিতেন। তাঁর সিএম বিরোধী তৎপরতা বিভিন্ন সময়ে আমার কাছে ধরা পড়েছে। গত বছর আমার অনুপস্থিতিতে পার্টির পত্রিকায় যে আর্টিকেল লিখেছেন, তাতে পরিষ্কার সিএম বিরোধী বক্তব্য ছিলো। তিনি বলেছেন কানু সান্যালদের দলিল আমাদের পার্টিতে সার্কুলেট করার জন্য। আমি খবর পেয়েছি ভারতে আমাদের ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টি ওই দলিলের সত্যতা অস্বীকার করেছে। আমরা নীতিগতভাবে এই দলিল প্রচার করতে পারি না। ফ্রন্টইয়ার আর সংস্কৃতি পত্রিকায় চীনের পার্টির নামে মহান নেতা কমরেড চারু মজুমদারের একটা সমালোচনা বেরিয়েছে। নিজেরা ব্যর্থ হয়ে বুর্জোয়ারা এখন মহান চীনা পার্টির নেতাদের নাম করে সিএম লাইনের সমালোচনা করছে। আর আমাদের বিজ্ঞ কমরেড মতিউর রহমান বুর্জোয়াদের সেই গলাবাজীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে, সংস্কৃতিতে যে লেখা বেরিয়েছে সেটা পার্টিতে প্রচার করতে বলছেন। এটা রীতিমতো শৃঙ্খলাবিরোধী কাজ। তিনি তার ফোরামের বাইরে পার্টির অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন— তার বহু প্রমাণ আমি পেয়েছি। আজ হালদার হাটের কুখ্যাত জোতদার সাহেবালীকে খতম করার জন্য আমি দীপুকে পাঠিয়েছি। রাজু আর জাফরকে দিয়েছি ওর সঙ্গে। রাজু আজ দুপুরে আমার মুখের উপর বলেছে, এ খতমকে সে সঠিক মনে করে না, খতমের লাইন সম্পর্কে আমাদের নাকি নতুন করে ভাবা উচিৎ। কমরেডস, এসব কথা রাজু বলতে পারছে কমরেড রহমানের উস্কানিতে।'

---

*সেন্ট্রাল কমিটির সংক্ষেপে

রফিক সব সময় গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে কথা বলে। কর্তৃত্বের সঙ্গে গুছিয়ে কথা বলার এক দুর্লভ গুণ রয়েছে ওর। সাধারণ শ্রোতাকে স্বমতে আনতে তার বেশি বেগ পেতে হয় না। মতিউর রহমান দীর্ঘদিন গণসংগঠন করেছেন, জনসভায় বক্তৃতাও কম দেননি, কিন্তু তিনিও রফিকের মতো গুছিয়ে কথা বলতে পারেন না। বরং ইদানীং তিনি অল্পেই উত্তেজিত হন, রেগে যান, গালাগালিও করেন। রফিক কখনও উত্তেজিত হয় না। অনর্গল উদ্ধৃতি দিতে পারে মাও সেতুঙ আর চারু মজুমদারের— যা মতিউর রহমানদের ধরাশায়ী করার জন্য যথেষ্ট।

বৈঠকে সবাই হোগলার চাটাইয়ে গোল হয়ে বসেছিল। মাঝখানে একটি চিমনিভাঙা হারিকেন জ্বলছে। ধোঁয়া আর কেরোসিনের গন্ধ ভরা ম্লান আলোয় ঘরের ভেতর একটা অস্বস্তিকর পরিবেশ। রফিকের বক্তব্য শেষ হওয়ার পর রাজশাহীর বারেক বলল, 'কমরেড সভাপতি, যে পাঁচটি জেলার রিপোর্ট পড়া হল সে সব জায়গায় বিভিন্ন সময়ে রাজু, জাফর আর পূরবী দায়িত্বে ছিল। এই তিনজন হচ্ছে বুড়োর প্রধান হাতিয়ার। তাছাড়া এ পাঁচটি জেলার ভেতর তিনটির কংগ্রেসে কমরেড রহমান নিজে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে আমাদের নতুন অনেক কমরেডের এখনও দুর্বলতা আছে।'

সভার বিবরণী লিখছিল কেন্দ্রের কনিষ্ঠতম সদস্য মানু। দীপুর চেয়ে ওর বয়স বেশি নয়। খতমের সংখ্যা জাফরের চেয়ে খুব একটা কম হবে না। এখনও খতম সম্পর্কে ওর প্রচন্ড আগ্রহ রয়েছে। মানু লেখা থামিয়ে বলল, 'কমরেড সভাপতি, আমি যতদূর জানি, এই দুর্বলতার জন্যই বুড়োকে ওখানে পাঠানো হয়েছিল। ওই তিন জেলা আগেই জানিয়েছিল বুড়োকে ছাড়া ওরা কংগ্রেস করবে না। আমি মনে করি বুড়োকে ওসব জায়গায় পাঠানোই উচিৎ হয়নি।'

বারেক হাত তুলে মানুকে থামিয়ে দিল— 'আমাকে বলতে দিন কমরেড। বুড়োকে ওখানে পাঠানোটা আমি ভুল মনে করি না। তবে উচিৎ ছিল আমাদের কারো বুড়োর সঙ্গে যাওয়া। তিনি একা গিয়ে নিশ্চিন্তে ফ্রি ষ্টাইলে কাজ করেছেন। এ ধরনের কাজে তাঁর জুড়ি নেই। তিনি যাকে যখন পান তার সামনেই ভুল খতমের কাঁদুনি গাইতে শুরু করেন। অথচ সঠিক খতমগুলো সম্পর্কে তিনি কোন কথা বলেন না। কমরেড সভাপতি, আমি মনে করি এ বিষয়ে কমরেড রহমানের উচিৎ লিখিত আত্মসমালোচনা হাজির করা।'

কেন্দ্রের অপেক্ষকৃত বয়স্ক সদস্য ইউসুফ মাথা নেড়ে সায় জানাল— 'আমিও মনে করি কমরেড রহমানের আত্মসমালোচনা করার সময় হয়েছে। ফোরামের বাইরে যার তার সঙ্গে পার্টির গৃহীত লাইনের বিরুদ্ধে কথা বলা ঘোরতর অন্যায়।'

মানু অধৈর্য কণ্ঠে বলল, 'আত্মসমালোচনা করলেই বুড়ো শোধরাবে আমি মনে করি না। তার ব্যাপারে আরো কড়া সিদ্ধান্ত নেয়া উচিৎ। আমাদের কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে রাজু আর জাফর সম্পর্কে। এরা দুজন বুড়োর লাঠির মতো কাজ করছে। লাঠি ছাড়া বুড়ো এক পাও নড়তে পারবে না।'

কেরোসিনের ধোঁয়া জমে ঘরের ভেতরটা ক্রমশঃ ম্লান হয়ে আসছিল। কারো

চেহারা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। মাঝে মাঝে শুধু দেয়ালের গায়ে কালো ছায়াগুলো কাঁপছিলো।

রফিক প্রত্যেকের কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভেতরটাও যাচাই করে নিচ্ছিল। মানুর শেষের কথা শুনে মুহূর্তের জন্য ঈষৎ হাসল। তারপর শান্ত গম্ভীর গলায় বলল, 'কমরেডস, রাজু আর জাফর সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা আমিও ভেবেছি। কমরেড মানু ঠিকই বলেছে, এদের বাদ দিয়ে কমরেড রহমান অচল। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে এ মুহূর্তে কমরেড রহমান সম্পর্কে চরম কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার পক্ষপাতী নই। কারণ বাইরে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। কিন্তু রাজু বা জাফর যা করছে সেটা কোনো অবস্থাতেই অনুমোদন করা যায় না। মহান নেতা কমরেড চারু মজুমদার বলেছেন, 'ভুল রাজনীতি, ভুল চিন্তাধারা, বিপ্লবের শত্রু।' কথাটার সারবস্তু আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। শ্রেণী আপোষের লাইন হচ্ছে সংশোধনবাদ। এর বিরুদ্ধে পার্টির বাইরে যেমন লড়তে হবে, পার্টির ভেতরও লড়তে হবে। পার্টির ভেতরে শ্রেণী আপোষের বীজ রেখে আমরা কখনোই শ্রেণী সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো না। সংশোধনবাদীদের আমরা সব সময় শ্রেণীশত্রু হিসেবে গণ্য করে আসছি। তাই আমি মনে করি রাজু আর জাফরকে খতমের সিদ্ধান্ত আমাদের নেয়া উচিৎ। এদের সম্পর্কে বা এদের রাজনীতি সম্পর্কে কোন রকম নমনীয়তা বা উদারতাবাদ দেখানোও হবে সংশোধনবাদ। এ বিষয়ে আমি আপনাদের মত জানতে চাই।'

রফিকের আবেগহীন ধারাল কণ্ঠস্বর, পার্টির দুজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য সম্পর্কে তার চরম সিদ্ধান্ত সবাইকে কিছুক্ষণের জন্য নির্বাক করে দিল। মানু এবং আরও দু'একজন ভেতরে ভেতরে এত বেশি উত্তেজনা বোধ করছিল যে ঘরের বাইরে লঘু পায়ের শব্দ কারো কানে গেল না।

পূরবী তখনই গ্রাম থেকে ফিরেছে। পাশাপাশি দুটো গ্রামে রাতে ওর দুটো বৈঠক ছিল। সারা রাত সেই বৈঠকে থাকার কথা ওর। রফিক জানত সে রাতে শেল্টারে ফিরবে না। কিন্তু পাশের গ্রামে পুলিশের হামলা হওয়াতে পূরবী দুটো বৈঠক বাতিল করে, কুরিয়ারের হাতে খবর পাঠিয়ে, শেল্টারে ফিরে এসেছে।

সারাদিন যথেষ্ট ছুটোছুটির মধ্যে কেটেছে পূরবীর। পুলিশি হামলার কথা শুনে কয়েক জায়গায় খবর পাঠাতে হয়েছে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়ার জন্য। বিকেলে এক কৃষক কমরেডের বাড়িতে একটা কলাই'র রুটি খেয়েছে। এ ছাড়া সারাদিন পেটে কিছু পড়েনি। বেশ ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। তাই ঠিক করেছিল শেল্টারে ফিরে শুয়ে পড়বে।

শেল্টারে এসে ঘরের ভেতর আলো দেখে পূরবী কিছুটা অবাক হয়েছে। রফিক সকালেই ওকে বলেছে রাজুরা রাতে এ্যাকশনে যাবে, ফিরতে ফিরতে ভোররাত হবে। তাই ওর বৈঠক যদি আগে শেষ হয়ে যায় পূরবী যেন রাতে শেল্টারে না ফেরে। পুলিশের হামলা না হলে পূরবী গ্রামেই থেকে যেতো। একবার মনে হল, বাইরের কেউ শেল্টারে ঢোকে নি তো! দ্বিধা আর শঙ্কা নিয়ে পূরবী মৃদু পায়ে ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। কাছে যেতেই রফিকের গলা শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। সেই সঙ্গে একটু

অবাকও হল। কমরেড রফিক এই শেল্টারে কাদের নিয়ে বৈঠক করছে? কেন্দ্রীয় কমিটি ছাড়া এই শেল্টারে অন্য কারো বৈঠক করার নিয়ম নেই। পর মুহূর্তে রফিকের শেষের দিকের কথাগুলো পূরবীর কানে যেতে ওর সারা শরীরে প্রচন্ড শক্তিশালী বিদ্যুৎ প্রবাহ বয়ে গেলো। মুহূর্তের জন্য নিজের শ্রবণশক্তির উপর আস্থা হারিয়ে ফেলল সে। এসব কি শুনছে? রাজু আর জাফর শ্রেণীশত্রুর মতো বিপদজনক? এদের খতম করার সিদ্ধান্ত নেয়া উচিৎ?

রফিকের কথাগুলো ওর কানে গলানো সিসা ঢেলে দিল। আর এগুতে পারল না পূরবী। প্রথমে দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারপর কখন যে অন্ধকার সরু বারান্দায় বসে পড়েছে টেরও পায় নি। ক্লান্তি আর উত্তেজনায় গলার ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। এক ধরনের বোধশূন্যতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে রইল। অনেকক্ষণ। মনে হল পথ ভুল করে সে শত্রুর কোনো কঠিন ফাঁদে ধরা পড়েছে অথবা কোনো দুর্ভেদ্য কারাগারে অবরুদ্ধ হয়েছে চিরদিনের জন্য।

একবার ভাবল চিৎকার করে বলে, 'এসব তোমরা কি বলছো রফিক? রাজু আর জাফরের মতো বিপ্লবী কর্মী ক'জন আছে আমাদের পার্টিতে? তুমি কতটুকু জানো ওদের? আরো অনেক কথা পূরবীর গলার কাছে এসে কাটা মুরগীর মতো ছটফট করতে লাগল, কিন্তু কিছুই বলতে পারল না। কিছুক্ষণের জন্য ওর চারিদিকে এক ভৌতিক নীরবতা ছড়িয়ে রইল। তারপর সে মানুর গলা শুনল।

'কমরেড সভাপতি, রাজু আর জাফরকে খতম করার সিদ্ধান্ত আমি পুরোপুরি সমর্থন করি। আমি আরও মনে করি এ সিদ্ধান্ত অবিলম্বে কার্যকর হওয়া উচিৎ। অতীতে এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পরও আমাদের অনেকে দোদুল্যমানতায় ভুগেছেন। দীর্ঘসূত্রিতার কারণে অপরাধীরা শত্রুর শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে। কেন্দ্রীয় কমিটি যদি আমাকে দায়িত্ব দেয় তাহলে আজ রাতের ভেতরই এ কাজ আমার স্কোয়াড করে ফেলতে পারবে। দেরি হলে পরিস্থিতি আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। আমি গোটা ব্যাপারটাকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করছি। ওদের বিরুদ্ধে আমার কোনো ব্যক্তিগত আক্রোশ নেই . . .

চাপা উত্তেজিত গলায় কথা বলছিল মানু। কথা বলার সময় রফিককে অনুকরণ করার চেষ্টা করে সে। ওর শেষের দিকের কথাগুলো পূরবীর কানে পৌঁছল না। ওর চোখের সামনে রাজুর বিষণ্ন কোমল দৃষ্টি, জাফরের বলিষ্ঠ কান্তিমান চেহারা, দীপুর বুদ্ধিদীপ্ত ধারালো অবয়ব, পরিচিত বহু ঘটনা, অন্তরঙ্গ অনেক মুহূর্ত ভেসে বেড়াতে লাগল। যেভাবেই হোক রাজুদের রক্ষা করতে হবে। পূরবী মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। কিন্তু কোথায় কিভাবে ওদের দেখা পাবে ভেবে কোন থই পেল না। একবার ভাবল মানু যখন বেরোবে ওকে দূর থেকে অনুসরণ করবে। পূরবীর কাছেও পুরো ম্যাগজিন ভর্তি পিস্তল রয়েছে। প্রয়োজন হলে ব্যবহার করবে। না, মনের ভেতর থেকে কোন সাড়া পেল না। মানুর কথা শুনে মনে হয় ও প্রচন্ড এক নেশার ঘোরে রয়েছে। রাজুদের কিভাবে বাঁচাবে সে? প্রচন্ড এক ঘূর্ণিঝড় পূরবীর সমস্ত বোধশক্তিকে এমনই আচ্ছন্ন করে দিয়েছে যে বার বার চেষ্টা করেও ঝড়ের সেই বৃত্ত থেকে সে বেরোতে

পারছিল না।

পূরবীর মনে পড়ল পার্টিতে ঢোকার পর প্রথম দিকের সেই দিনগুলোর কথা। কত উদ্বেগমুক্ত, সহজ সময় ছিল তখন। আন্দোলন ছিল, লড়াই ছিল, কষ্টও সইতে হয়েছে অনেক, তবু গোটা পার্টিকে মনে হতো এক বিশাল যৌথ পরিবারের মতো। সিএম লাইন নিয়ে সত্তরে রফিকরা যখন নেতৃত্বে এল তখন থেকেই বিপর্যয়ের শুরু। একাত্তরে স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করতে গিয়ে গোটা পার্টি ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। রাজশাহীতে সালাম ভাইরা পার্টির কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়েছিল বলে সেখানকার কিছু এলাকা বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। রাজু তখন ওদের সঙ্গে ছিল। যুদ্ধের শেষের দিকে রফিকদেরও সেখানে আশ্রয় নিয়ে গা বাঁচাতে হয়েছিল। '৭২-এ আত্রাইর বিপর্যয়ের পর সালাম ভাইরা সবাই যখন গ্রেফতার হল, তখন রফিকরা গোটা পার্টি জীবনকে অন্যরকম করে ফেলল। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন সমস্যা আর আন্দোলনের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই রইল না। গোটা পার্টি আন্ডারগ্রাউন্ডে গিয়েও কঠোর গোপনীয়তার আশ্রয় নিল। ফোরামের বাইরে কেউ কাউকে চেনে না। চিনলেও কথা বলা যাবে না। নিয়ম শৃঙ্খলার নামে কঠিন যান্ত্রিকতা গোটা পার্টিকে গ্রাস করল।

অন্যান্য পুরোনো কর্মীদের মতো পূরবীও এ অবস্থা মেনে নিতে পারেনি। অস্বাভাবিক গোপনীয়তা নতুন কর্মীদের ভেতর এনে দিয়েছে পুরোনোদের প্রতি সন্দেহ আর নেতৃত্বের নিকটতর হওয়ার উচ্চাকাঙ্খা। বেশ কিছু ষড়যন্ত্রের সাক্ষী পূরবী নিজেও, কিন্তু শৃঙ্খলার দেয়াল ভেঙ্গে প্রতিবাদ করতে পারেনি। পুরোনো অনেক ছবির টুকরো টুকরো মিছিল পূরবীর চোখের পর্দায় সারিবদ্ধভাবে হেঁটে গেল।

ঘরের ভেতর রফিক নীচু গলায় কথা বলছিল। পূরবীর কানে কিছুই ঢুকছিল না। নভেম্বরের কুয়াশা ভেজা ঠান্ডা বাতাসের ভেতরও দরদর করে ঘামছিল সে। কানের ভেতর দিয়ে মাথার মগজ থেকে আগুনের হলকা বেরোচ্ছে। দু'চোখ বন্ধ করে অবসন্ন ভঙ্গিতে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসেছিল পূরবী।

বৈঠকের ধারাবিবরণীতে রাজু আর জাফরকে খতম করার সিদ্ধান্ত ততক্ষণে নেয়া হয়ে গেছে। আর এ খতমের দায়িত্ব মানুকেই দেয়া হয়েছে। রাতের ভেতর কাজ সেরে ফেলতে হবে। উত্তেজনায় মানুর চোখ দু'টো জ্বলজ্বল করছিল। মানু হিসেব করে দেখেছে, ওদের দু'জনকে খতম করতে পারলে ওর খতমের সংখ্যা জাফরের সমান হবে। জাফর আর রাজু সম্পর্কে এক ধরনের গোপন ঈর্ষা বহুদিন ধরে মানুর বুকে চাপা ছিল। মানু যদিও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, যা ওরা নয়, তবু রাজু সাধারণ কর্মীদের কাছে অনেক বেশি জনপ্রিয়। আর জাফরের খতমের সংখ্যা ছিল বেশি। মানু মনে মনে ঠিক করে ফেলেছে হালদার হাট থেকে ওদের ফেরার পথে এ্যামবুশ পাততে হবে। সাহেবালীকে খতম করার কথা দীপুর, পিস্তলটা ওর কাছেই থাকবে। জাফরের কাছে একটা ছুরি থাকে, দূর থেকে ও কিছু করতে পারবে না। আর রাজুর কাছে সাধারণত কোনো অস্ত্রই থাকে না। দূর থেকে দীপুকে সাবধান করেই গুলি চালাবে মানু। নিজের ওপর যথেষ্ট বিশ্বাস আছে ওর। দু'টোর বেশি গুলি খরচ করতে হবে না। পুরো ব্যাপারটাকে ব্যক্তিগত ঈর্ষা ছাড়াও বিরাট এক রাজনৈতিক বিজয় হিসেবে দেখছিল মানু।

কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক তখন শেষ হওয়ার পথে। পার্টির গৃহীত রাজনীতির উপর রফিক ভাষণ দিচ্ছিল— 'কমরেডস, যারা মনে করেন পূর্ব বাংলায় জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান, তারা আমাদের শত্রুদের হাতকেই শক্তিশালী করছে। শত্রুদের তারা বিপ্লবের মিত্র বানিয়ে তাদের রক্ষা করতে চাইছে। শোষক এবং শোষিত— ভারত, পাকিস্তান কিম্বা আমাদের পূর্ব বাংলায় সব এক চেহারার। আমাদের প্রধান শত্রু সামন্তবাদ। তারপর আসে সাম্রাজ্যবাদ। আপনারা জানেন আওয়ামী লীগ সরকার এদেশের সামন্ত, জোতদার, মহাজনদের প্রতিনিধিত্ব করছে; তাদের স্বার্থ পাহারা দিচ্ছে। শ্রেণীশত্রু খতমের মাধ্যমে আমরা সামন্তবাদকে আঘাত করছি, রাষ্ট্রযন্ত্রের চোখ কানা করছি। মহান নেতা কমরেড চারু মজুমদারের নির্দেশিত পথে আমরা এভাবেই এগিয়ে যাবো . .'

রফিকের ভাষণ শেষ হওয়ার আগেই পূরবী কঠিন এক সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। চাঁদের আলোয় দ্রুত একটা চিঠি লিখে জানালার পাশে গুঁজে রাখল। রাজু ছাড়া এ চিঠি আর কেউ পাবে না। ওরা যদি মানুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে শেল্টারে ফিরতে পারে, তাহলে পূরবীর পরিকল্পনা মতো কাজ হবে। নইলে সে জানে না পরদিন কি হবে, কে কোথায় থাকবে। রফিকদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছে পূরবী।

পাশের ঘর থেকে ওর ব্যাগে দ্রুত কিছু জিনিষপত্র গুছিয়ে অন্ধকারের ভেতর শেল্টার থেকে বেরিয়ে পড়ল। বাইরে যদিও চাঁদের আলো—পূরবী গাছপালার অন্ধকার ছায়ার ভেতর দিয়ে ষ্টেশনের দিকে এগিয়ে চলল। যমুনার তীরের ছোট্ট শহরটি তখন গভীর ঘুমে অচেতন। দূরে মাঝে মাঝে শেয়ালের ডাক আর একটানা ঝিঁঝি পোকার শব্দ ছাড়া অন্য কোনো শব্দ ছিল না কোথাও। পূরবীর মনে হল পঁচিশ বছরের জীবনে এই প্রথম সে অনিশ্চিত এক গন্তব্যের দিকে পা বাড়িয়েছে।

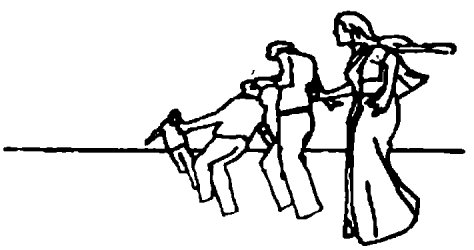

শালবনের আলোছায়ার আধো অন্ধকার পেরিয়ে রাজুরা খোলা মাঠে এসে নামতেই কুয়াশা ভেজা যুঁই ফুলের মতো নরম ধবধবে জ্যোৎস্না ওদের সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল। অন্ধকার থেকে হঠাৎ আলোয় এসে অস্বস্তি বোধ করল দীপু। দূরে হালদার হাটে নিশি পাওয়া এক কুকুর করুণ স্বরে একটানা ডেকে চলেছে। গ্রামের লোকের কাছে এই ডাক অমঙ্গলের বার্তাবাহক। রাজু দীপুর কাছে এসে ওর কাঁধে হাত রেখে বলল, 'সামনে যে আমবাগানটা দেখছো, ওটার ভেতর সাহেবালীর বাড়ি।'

জাফর দীপুর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল, অস্বাভাবিক উত্তেজনায় ওর চোখে মুখে ছড়িয়ে রয়েছে। চাঁদের আলোয় ঘামে ভেজা মুখখানা চকচক করছে। জাফর একবার ভাবল দীপুর বদলে সাহেবালীকে সে নিজে খতম করলে কেমন হয়। পর মুহূর্তে রফিকের ইস্পাত কঠিন দৃষ্টি ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল। কথাটা সে দীপুকে বলতে গিয়েও পারল না। রাজু ওদের ইউনিট প্রধান। ওর বোঝা উচিৎ, দীপুর যা অবস্থা— একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়া অসম্ভব নয়। রাজুর শান্ত, নির্বিকার মুখে কোন উত্তেজনা বা ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই। শুধু ওর কপালে আর নাকের ডগায় ঘামের বিন্দু চকচক করছিল। এটাকে জাফর রাজুর বৈশিষ্ট্য মনে করে। ওর ভেতর প্রচন্ড কোন ঝড় বয়ে গেলেও বাইরে তার কোন প্রতিফলন ঘটে না। এ জন্যে মাঝে মাঝে ক্ষুব্ধ হয় জাফর। আবার একই কারণে রাজুকে সে শ্রদ্ধাও করে।

খোলা মাঠ পেরিয়ে সাহেবালীর আমবাগানে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ঘনকালো অন্ধকার আবার ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দীপুর অস্বস্তি কেটে গিয়ে উত্তেজনা বেড়ে গেল। নিশি পাওয়া কুকুরটা তখনও থেমে থেমে কাঁদছিল। বাড়ির কাছে এসে রাজু ওদের ইশারায় থামাল। নিজে গিয়ে বাড়ির চারপাশটা ঘুরে দেখে এল। আমাবাগানে ঝিঁ ঝি পোকার তুমুল শব্দ। রাজু ফিশফিশ করে দীপুকে বলল, 'সাহেবালী ঘরে বসে কি যেন করছে। আমি আর জাফর দরজার কাছে থাকবো। তুমি জানালা দিয়ে গুলি করবে।'

দীপুর গলার ভেতরটা তখন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। ঢোক গিলে শুধু মাথা নেড়ে সায় জানাল। ওর চোখের সামনে রাজু জাফরকে নিয়ে অন্ধকারে হারিয়ে গেল। নিজেকে অসম্ভব একা আর অসহায় মনে হল দীপুর। চারপাশে তাকিয়ে সাবধানে একপা দু'পা করে খোলা জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। কার কাছে যেন শুনেছিল গত বছর সাহেবালীর বউ মারা গেছে বাচ্চা হওয়ার সময়। ঘরের ভেতর তাকাতেই প্রথমে ওর চোখে পড়ল চার পাঁচ বছরের একটা ছোট্ট মেয়ে জানালার কাছে বিছানার ওপর বসে পুতুল খেলছে, আর আপনমনে কথা বলছে। ঘরের সবটুকু দেখতে না পেয়ে আরও দু'পা এগিয়ে এল। এক টুকরো আলো ওর গায়ে এসে পড়ল। দীপুর তখন আলোর দিকে কোন খেয়াল নেই। ঘরের ভেতর সাহেবালী মন্ডলকে দেখতে পেয়েছে সে।

চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই এই সাহেবালী একজন ঘৃণ্য শ্রেণীশত্রু, অত্যাচারী মহাজন। খুবই সাধারণ চেহারা, গায়ে পাঞ্জাবী, পরনে লুঙ্গি, মাথায় টুপি, থুতনিতে একটুখানি দাড়ি। সাহেবালীর অত্যাচার সম্পর্কে রফিক ভাই যে বিবরণ দিয়েছে তার প্রতিটি অক্ষর দীপুর বুকের ভেতর গেঁথে আছে।

দীপু আরও এক পা এগিয়ে এসে কোটের ভেতরের পকেট থেকে পিস্তল বের করল। আর তখনই জানালার কাছে বসা মেয়েটা ওকে দেখে ফেলল। প্রথমে একটু অবাক হল মেয়েটা। কিছুক্ষণ দীপুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে হাসিমুখে আস্তে ডাকল— 'কাকু!'

ডাক শুনে ভীষণভাবে চমকে উঠল দীপু। পিস্তলটা হাত থেকে পড়ে গেল। দরজার

ওপাশে রাজু আর জাফর একে অপরের দিকে তাকাল। সাহেবালী মাথা না তুলেই বলল, 'কেরে ওখানে সোনা?'

সাহেবালীর কথা শুনে কোমর থেকে এক ঝটকায় ছুরিটা বের করে আনল জাফর। চাঁদের আলোয় মুহূর্তের জন্য ঝলসে উঠল ছুরির চকচকে ফলা।

মেয়েটা দীপুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাবা দেখ কাকু আসছে।'

পিস্তল তুলতে গিয়ে দীপুর হাত কেঁপে উঠল। মেয়েটার দিকে অসহায়ভাবে তাকাল। একটানা ঝিঁঝি পোকার ডাক ক্রমশ তীক্ষ্ণ হয়ে তখন ওর কানের ভেতর দিয়ে ঢুকে মগজকে খুবলে খাচ্ছে। নিশি পাওয়া কুকুরটা তখনও একটানা ডেকে চলেছে। ধীরে ধীরে শক্ত হাতে পিস্তলটা আবার তুলে ধরল। অত্যন্ত নিষ্পাপ কৌতূহল নিয়ে মেয়েটা প্রশ্ন করল, 'ওটা কি কাকু?'

ভুরু কুঁচকে সাহেবালী মাথা তুলে তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল। জানালার দিকে এক পা এগিয়ে এসে বলল, 'কার সঙ্গে কথা বলছিস . . . .?'

কথা শেষ হওয়ার আগেই ট্রিগারে চাপ দিলো দীপু। পরপর দু'টো গুলি সাহেবালীর বুকে এসে লাগল। দু'চোখে ভীষণ আতঙ্ক নিয়ে সাহেবালী বুক চেপে ধরল। সাদা পাঞ্জাবী রক্তে লাল হয়ে গেল। চিৎকার করতে চাইল, গলা দিয়ে শুধু ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরুল।

মেয়েটা ভয়ার্ত চোখে একবার ওর বাবাকে দেখল। তারপর দু'হাতে জানালার শিক ধরে চিৎকার করে দিপুকে ডাকল— 'কাকু!'

বারান্দার ওপাশ থেকে ছুটে এল রাজু আর জাফর। দীপুর চোখের সামনে সাহেবালীর শরীরটা ঘরের মেঝেতে লুটিয়ে পড়েছে। কোনোদিকে না তাকিয়ে ফাঁকা জায়গায় গুলি ছুঁড়ল দিপু। মেয়েটা তখন চিৎকার করে কেঁদে উঠল।

গুলির শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দূরে অনেকগুলো কুকুর একসঙ্গে তারস্বরে চিৎকার শুরু করেছে। আমবাগানের ভেতর কাকের কর্কশ ডাক আর ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ। কয়েকটা কাক ডাকতে ডাকতে উড়ে চলে গেল। কিছুক্ষণ বন্ধ থাকার পর ঝিঁঝিরা আবার দ্বিগুণ জোরে ডাকতে লাগল। মানুষের গলার শব্দ ধীরে ধীরে কোলাহলে পরিণত হল। রাজু চাপা গলায় বলল, 'পালাও দীপু।'

দীপুর মাথার ভেতর তখনও কয়েক লক্ষ ঝিঁঝি পোকা ডাকছে। পিস্তলটা তার হাতে ধরা। জাফর ওর হাত ধরে টানল— 'পালাতে না পারলে ছিঁড়ে ফেলবে।'

সম্বিত ফিরে দীপু দৌড়োতে আরম্ভ করল। পেছনে ছোট্ট মেয়েটার তীব্র কান্না, মানুষের সম্মিলিত কোলাহল এবং কুকুরের ডাক আরও জোরাল হল। দীপুর একটা হাত তখনও জাফরের হাতের মুঠোয়। প্রচন্ড গতিতে ওরা ছুটে চলল। আম বাগান থেকে খোলা মাঠ, তারপর শালবনে ঢুকেও ওরা দৌড়ানোর গতি কমাল না।

নির্দিষ্ট জায়গায় বাঁধা ছোট নৌকায় করে বিল পেরিয়ে বহুক্ষণ পর ওরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। দীপুর বুকের ভেতর তখনও কে যেন হাতুড়ি পেটাচ্ছিল। জাফর এতগুলো খতম করেছে কিন্তু এরকম দৌড়োতে হয়নি কখনও। আর একটু হলেই ধরা পড়ে যেতো দীপু। গুলি করে ও না পালিয়ে স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে থাকবে— এটা রাজু বা

জাফর কেউই আশা করেনি।

পুরোনো একটা শালগাছের নিচে এসে ওরা তিনজন অবসন্ন শরীর ঘাসের বুকে মেলে দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য চোখ বুজল। দীপুর সবকিছু তালগোল পাকিয়ে গেছে। বিড়বিড় করে একবার বলল, 'আমার হাতে যে রক্ত লাগল না?' এত আস্তে বলল— রাজু বা জাফর কারোই কানে গেল না। চোখ মেলে তাকাতেই নক্ষত্র ভরা কালো আকাশ ওদের চোখের সামনে ভেসে উঠল।

বেশ কিছুক্ষণ পর গায়ে যখন বাতাসের হিমেল স্পর্শ অনুভব করল, তখন দীপু আস্তে আস্তে বলল, 'আমরা এখন কতটুকু নিরাপদ রাজু?'

জাফর দীপুর একটা হাত নিজের হাতের মুঠোয় তুলে নিল। রাজু দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্বগতোক্তি করল— 'এদিকে কেউ আসবে না।'

শালবনের ভেতর তখন হু হু হিমেল বাতাস। কিছুক্ষণ আগে চাঁদ ডুবে গেছে। তারার অস্পষ্ট আলোয় কাছের গাছগুলোর অবয়ব দেখা যাচ্ছে। বিলের ওপর সাদা ঘন কুয়াশার চাদর বিছানো। আকাশে ছায়াপথে লক্ষ তারার মিছিল দেখতে দেখতে রাজুর তন্দ্রা এল। বিলের ধারে কোথাও কেয়াফুল ফুটেছে। বাতাসে মিষ্টি ঝাঁঝালো গন্ধ। আকাশের গা বেয়ে একটা নীল উল্কা বহুদূর অবধি নেমে এসে দীপুর চোখের সামনে হারিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ পর জাফর সিগারেট ধরাল। দেয়াশলাইর কাঠিটা পুড়ে শেষ হওয়া পর্যন্ত ধরে রাখল। দেয়াশলাইর আলোয় দেখল দীপু যেন ভাবলেশহীন এক পাথরে মূর্তি। হাত তুলে ঘড়িতে দেখল, একটা বেজে পনেরো মিনিট। দেয়াশলাইর নিভে যাওয়া কাঠিটা ছুঁড়ে ফেলে উঠে বসল জাফর। দীপু আগের মতোই নির্বিকার। হাই তুলে জাফর আপন মনে বলল, 'রাত শেষ হওয়ার আগে শেল্টারে ঢুকতে হবে।' তারপর রাজুকে ডাকল— 'কি হলো রাজু, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি!'

রাজু চোখ মেলে তাকালে জাফর বলল, 'যেতে হবে না?'

রাজু উঠে বসলো। হঠাৎ চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে দীপু বলল, 'শুনতে পাচ্ছো জাফর?'

জাফর চমকে উঠে দীপুর দিকে তাকালো

'কারা যেন আসছে। আমি পায়ের শব্দ শুনেছি।'

জাফর আর রাজু দু'জনেই কান পেতে শোনার চেষ্টা করল, শালবনের ভেতর শুধু বাতাসের একটানা হু হু শব্দ— মাঝে মাঝে কান্নার মতো মনে হয়। ম্লান হেসে রাজু বলল, 'ও কিছু নয় দীপু, ভুল শুনেছো।'

দীপু উঠে বসে জাফরের দিকে তাকাল। জাফর হেসে ফেলল— 'আসলে আমাদের লম্বা একটা ঘুম দেয়া দরকার। পূরবীকে বলবো কাল সারাদিন যেন কেউ আমাদের বিরক্ত না করে।'

দীপু কোন কথা বলল না। শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস শালবনের হিমেল বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল।

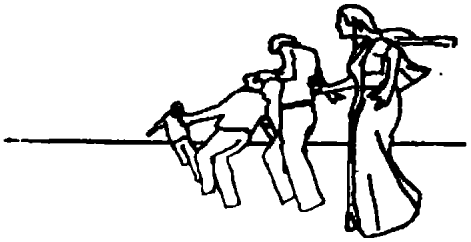

ওরা যখন শেল্টারে ফিরল তখনও ভোরের আলো ফোটেনি। শেল্টারের কোথাও আলো নেই। রফিকদের বৈঠক বহু আগেই শেষ। সবাই যে যার মতো আস্তানায় চলে গেছে। বারান্দায় উঠে জাফর দেয়াশলাই জ্বালাতে জ্বালাতে বিড় বিড় করে বলল, 'পূরবী ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি!'

দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল জাফর। পূরবীর দরজায় তালা ঝুলছে। রাজু আর দীপু এগিয়ে এসে দেখল।

দীপু অস্ফুট কণ্ঠে বলল, 'ঘরে তালা বন্ধ কেন?'

জাফর আর দীপু একসঙ্গে রাজুর দিকে তাকাল। জাফর বলল, 'পূরবীর ঘরতো খোলা থাকার কথা ছিলো!'

রাজু কোন কথা না বলে পাশের জানালার দিকে এগিয়ে গেলো। যা ভেবেছিলো ঠিক জায়গাতেই পেয়ে গেলো। জানালার ফাঁক থেকে পূরবী চিঠিখানা বের করে দেয়াশলাইর আলোতে পড়ল— 'কমরেডস, ভয়ানক চক্রান্ত শুনলাম। আজ রাতে কেন্দ্রীয় কমিটি হঠাৎ করে রাজু আর জাফরকে খতমের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মানুকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তোমরা এ চিঠি পাওয়া মাত্র শেল্টার ছেড়ে পালাও। দীপু আসতে না চাইলে থাক। চাবি তাকের ওপর আছে। শেষ রাতে জামতলি স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়বে। আমি কাছাকাছি অপেক্ষা করবো।— পূরবী'

দেয়াশলাইর কয়েকটা কাঠি জ্বালিয়ে ওরা চিঠিখানা পড়ল। শেষ কাঠিটা নিভে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওদের ভেতরের আলোও যেন সেই সঙ্গে নিভে গেল। দীপুর কিছুই বোধগম্য হচ্ছিল না। এ কেমন করে হয়? জাফরও অসহায় বোধ করল। শুধু রাজুর চোয়াল দু'টো কঠিন হয়ে এল। জাফর বিড় বিড় করে বলল, 'শেষ পর্যন্ত আমাদের এভাবে পালাতে হবে?'

রাজু দীপুর দিকে তাকাল— 'তুমি কি এখানে থাকবে?'

দীপু উদভ্রান্তের মতো একবার জাফর, আরেকবার রাজুকে দেখল— 'আমি কাদের সঙ্গে থাকবো? — না রাজু, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাবো। তোমাদের এভাবে ছেড়ে দিতে পারবো না।'

রাজু জাফরকে বলল, 'দরজা খুলে ভেতরে যাও। কয়েকটা বাড়তি কাপড় আর দরকারি জিনিষগুলো ব্যাগে গুছিয়ে নাও। এখনই জামতলি যেতে হবে।'

গ্রামের ভেতর দিয়ে স্টেশনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে ওরা তিনজন উদ্বেগের গভীর সমুদ্রে ডুবে গেল। তিনজন তরুণ, এ পৃথিবীকে যারা সাধারণ মানুষের বাসযোগ্য করে তুলতে চেয়েছিল মহান এক রাজনৈতিক বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে। জীবনের সকল মোহকে

ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সর্বহারা শ্রেণীর মুক্তির জন্য একটি বিপ্লবী পার্টির সদস্য হয়েছিল, যে পার্টির জন্য জীবন দিতে এতটুকু দ্বিধা নেই যাদের— সেই পার্টির নেতৃত্বের এক অবয়বহীন বিশাল ষড়যন্ত্র ওদের সমগ্র চেতনাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করল। যন্ত্রণার অদৃশ্য চাবুকে ওরা ক্রমাগত ক্ষতবিক্ষত হতে লাগল।

রাজুর একবার মনে হয়েছিল এভাবে না পালিয়ে রফিকদের মুখোমুখি দাঁড়াবে। কিন্তু পরিস্থিতি এমনই দাঁড়িয়েছে যে সেটাও হবে আরেক রোমান্টিকতা। পূরবী বুঝে শুনেই লিখেছে—এখন পালাতে হবে। সমাজ পাল্টাবার আগে পার্টির এই অবস্থা পাল্টাতে হবে। এর জন্য সময় আর প্রস্তুতি প্রয়োজন।

জাফর ভাবতে গিয়ে বারবার গুলিবিদ্ধ বুনোহাঁসের মতো মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো। শত্রুর মুখোমুখি লড়াই করে বুকে গুলি নিয়ে মরতে চেয়েছিল সে। কোনদিন ভাবেনি যে গুলি পেছন থেকে আসবে। ওদের দু'জনের জন্য দীপু আর পূরবীকেও চরম ঝুঁকি নিতে হচ্ছে। জামতলি থেকে কোথায় যাবে ওরা? পার্টির কোনো এলাকাকেই নিরাপদ মনে হচ্ছে না। উদ্বেগের অথৈ সমুদ্রে কোনো কূল খুঁজে পেল না জাফর।

আকাশে তখনও একটা দু'টো তারা দেখা যাচ্ছিল। পুব আকাশের অন্ধকার কিছুটা ফ্যাকাশে হয়ে এসেছে। স্টেশনের পাশে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের আড়ালে দাঁড়িয়েছিল পূরবী। একহাতে একটা টিনের সুটকেস, আরেক হাতে টিফিন ক্যারিয়ার, কাঁধে ফ্লাস্ক ঝোলানো। ঠিক একজন ট্রেন যাত্রীর মতোই সে অপেক্ষা করছিল।

দূর থেকে ওদের দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল পূরবী। চাপা গলায় বলল, 'ট্রেনে যাওয়া যাবে না। স্টেশনে টিকটিকি ঘুরছে।

দীপু বিভ্রান্তের মতো বলল, 'তাহলে?'

জাফর জিজ্ঞেস করল, 'চিনতে ভুল করোনি তো?'

পূরবী ম্লান হাসল— 'এতদিন পার্টি করছি, ছুটোছুটি করছি . ।'

রাজু বাধা দিয়ে বলল, 'এখানে দাঁড়িয়ে কাজ নেই। চলো শালবনের ভেতর হাঁটতে থাকি।'

ছোট্ট স্টেশনটায় অনেকক্ষণ ধরে একটা কয়লার ইঞ্জিন শান্টিং করতে গিয়ে কালো ধোঁয়া ছেড়ে ভোরের স্নিগ্ধ আকাশজন মলিন করে রেখেছে। প্ল্যাটফর্মে দু'তিনজন লোক কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে ঝিমুচ্ছে। কয়েকটা ভিখিরীর গায়ে ছেঁড়া চট আর সিনেমা হলের ব্যানারের ফেলে দেয়া ক্যানভাস জড়ানো। সাদা কুয়াশার সমুদ্রে গোটা স্টেশনটা দ্বীপের মতো ভাসছে। দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনটা যখন হুইসেল বাজিয়ে চলে গেল তখন দীপুর মনে হলো, বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে ওদের সমস্ত যোগাযোগ বুঝি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

কুয়াশার চাদর ছিঁড়ে সূর্য ওঠার আগেই ওরা শালবনে ঢুকে পড়েছিল। পাখিদের বিচিত্র কলরবে মুখরিত গোটা শালবন। কিছুক্ষণ পর ওরা দেখল গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে ভোরের আলোর ঝর্ণা অজস্র ধারায় নেমে এসেছে। পাখিদের শব্দ ধীরে ধীরে কমে এল। ওরা আরও ভেতরে ঢুকল। ঠান্ডা, নরোম, ভেজা এক পরিবেশ। গভীর ক্লান্তিতে ওদের সবার হাত পা অবশ হয়ে আসতে চাইছে। তবু ওরা হাঁটল, যতক্ষণ না পাহাড় থেকে নেমে আসা ঝর্ণার রেখা খুঁজে পেল।

রাজু পুরোনো এক সেগুন গাছের নিচে বসতে বসতে বলল, 'এবার কিছুটা নিশ্চিন্ত। এই ঝর্ণা আমাদের পথ দেখাবে।'

ওরা সবাই মাটিতে আধভেজা ঘাসের বুকে গা এলিয়ে দিল। ছোট ছোট নুড়ির ওপর দিয়ে মৃদু ছন্দে স্বচ্ছ ঝর্ণা বয়ে যাচ্ছে। পানির গভীরতা দেড় হাতের বেশি কোথাও হবে না। পূরবী কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে যা শুনেছে ওদের খুলে বলল। শুধু হতাশার কথা নয়, আশার কথাও। রহমান ভাই'র সঙ্গে পূরবীর দেখা হয়েছে দুদিন আগে। তিনি চট্টগ্রামে গিয়েছেন। সেখানেও নাকি জেলা কংগ্রেসে খতমের লাইনের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

রাজু বলল, 'লাইন না পাল্টালে গোটা পার্টি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এমনিতেই তো সাধারণ মানুষের সঙ্গে সব সম্পর্ক মিটে গেছে। রহমান ভাই'র উচিৎ কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দাগার আহ্বান জানানো, যেভাবে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় চেয়ারম্যান মাও করেছিলেন।'

রাজুর এ ধরনের কথা জাফর আগেও শুনেছে। পার্টির গেরিলা স্কোয়াড যে খতমগুলো করছে, খুব কম ক্ষেত্রেই সেগুলো সাধারণ মানুষের সমর্থন পেয়েছে। খতম করে স্কোয়াড পালিয়ে আসে গ্রাম থেকে। ভোগান্তি হয় নিরীহ মানুষের। পুলিশ আর রক্ষীবাহিনীর অত্যাচার খুবই বেড়েছে। জাফরের মনে হল এতদিন ধরে ওরা এক অলৌকিক স্বপ্নের পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছে। বিপ্লব এক ধাপও এগোয় নি।

রাজুর কথার জবাবে কেউ কিছু না বলাতে দীপু আরো বিভ্রান্ত হল। পূরবীর দিকে তাকিয়ে দেখল ও চা বানাবার আয়োজন করছে। পূরবীর চোখে রাজুর প্রতি নিরব সমর্থন। জাফর আধশোয়া হয়ে ঝর্ণার পানিতে একটা একটা করে পাথরের টুকরো ছুঁড়ছে। যেন কোন লক্ষ্যভেদ করতে চাইছে। দীপু অসহায় ভঙ্গিতে রাজুকে বলল, 'তাহলে কি সাহেবালীকে খতম করাও আমাদের ভুল হয়েছে?'

জাফর মুখ না ফিরিয়ে জবাব দিল, 'ভুল না হলে ওভাবে পালিয়ে এলে কেন?'

পূরবী সহানুভূতি ভেজা গলায় বলল, 'এ ভুলের জন্য আমরা দায়ী নই। দায়ী আমাদের নেতৃত্ব।'

দীপু তর্কের ঝোঁকে বলল, 'যে ভুল আমরা ধরতে পারছি— রফিক ভাইরা তা পারেন না, এ কেমন করে হয়?'

জাফর কিছুটা তিক্ত কণ্ঠে বলল, 'পারেন না বলছে কে? ঠিকই বুঝতে পারেন। তবে স্বীকার করলে তো নেতা থাকা যাবে না। নেতৃত্বের মোহটা কি কম! আমরা তো নেতাদের নির্দেশে চোখ মুখ বুজে খতম চালিয়ে গেছি। পার্টির কাগজে ফলাও করে ছাপা হয়েছে। খোদ সি এম-এর কাগজ দেশব্রতীও মাঝে মাঝে পিঠ চাপড়ে দিয়েছে। অথচ একবার হিসেব নিয়ে দেখা গেল, এক যশোরেই সাতশ খতমের ভেতর চারশ ছিলো ভুল। কর্মীরা ধরা পড়ে, রক্ষীবাহিনীর গুলি খেয়ে মরে, কখনও নেতারা বলেন আত্মত্যাগের যুগ, কোনো মৃত্যুই বৃথা যাবে না; আবার কখনো বলেন ওতো নিজের হটকারিতার জন্য মরেছে। একজন কর্মী তৈরি করতে বছরের পর বছর লেগে যায়, অথচ তাকে

জেনে শুনে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে কয়েক মুহূর্তও লাগে না। আমাদের নেতারা এভাবেই বিপ্লবের স্বপ্ন দেখছেন।'

কথা বলতে বলতে শেষের দিকে জাফরের কণ্ঠ ক্ষোভে আর উত্তেজনায় বুজে এল। পূরবী অস্বস্তি বোধ করল। দীপুর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারছিল, ওর কাছে পুরো ব্যাপারটা এখনও পরিষ্কার নয়। দীপুর জন্য গভীর মমতায় ওর বুকটা ভরে গেলো। কতইবা বয়স হবে! এখনও চেহারা থেকে কৈশোরের কমনীয়তা মুছে যায়নি। চোখ দুটো আশ্চর্য রকম নিষ্পাপ। এক অসহায় আর্তি ঘিরে রেখেছে সেই নিষ্পাপ দৃষ্টি। প্রসঙ্গ বদলাবার জন্য পূরবী বলল, 'চা খেতে চাইলে কেউ আমাকে আগুনটা জ্বেলে দিয়ে সাহায্য করো।'

রাজু মৃদু হেসে উঠে বসল— 'আমি দিচ্ছি পূরবী।'

জাফরের লম্বা ছুরি দিয়ে রাজু মাটি কাটল। শুকনো কিছু ডাল পাতা কুড়িয়ে আনল। আর পূরবী টিফিন ক্যারিয়ারের একটা বাটি থেকে রুটি বের করে ঝর্ণার পানি আনল। জাফর তাকিয়ে দেখল ওদের দুজনকে। বিপদের সময় রাজু আর পূরবী সব সময় মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করতে পারে। দীপুর চেহারা দেখলেই বোঝা যায় ওর ভেতরে প্রচন্ড ঝড় বইছে। ঝর্ণার দিকে তাকিয়ে দেখল, সূর্যের আলোয় পানির তলায় নানা রঙের নুড়ির ফাঁকে ছোট মাছের ঝাঁক ছুটোছুটি করছে। জীবন কত শান্ত সুন্দর এখানে। অথচ ওরা চারজন কি ভয়ঙ্কর এক দুঃসময়ের সমুদ্রে সাঁতার কেটে চলেছে।

রাজু আর পূরবী বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টার পর আগুন ধরিয়েছে। ধোঁয়ার ভেতর অচেনা মিষ্টি গন্ধ। নীচু গলায় ওরা দুজন কথা বলছিল। দীপুর মনে অসংখ্য প্রশ্ন, দ্বন্দ্ব আর উৎকণ্ঠা ক্রমাগত ঘুরপাক খাচ্ছে। রাজুর একটা কথা ওর কানে এল— 'কাল রাতে দীপু ভয় পেয়েছিল।'

পূরবীর চোখে কি যেন পড়েছে— কচলাতে কচলাতে বলল, 'পাওয়াটাইতো স্বাভাবিক। তুমি কি তোমার প্রথম খতমের কথা ভুলে গেছো?'

রাজু ম্লান হেসে বলল, 'আমি কোনো খতমের কথাই মনে রাখতে চাই না।'

রাজুর কথা জাফরের কানে যেতেই ও উঠে বসল— 'মনে রাখতে চাই না বললে তো চলবে না কমরেড। আমি তো একটার কথাও ভুলিনি। নেতাদের মুখোমুখি হলে প্রত্যেকটার জন্য কৈফিয়ৎ চাইবো। ভুল খতম বললেই তো হয় না। ভুলের জন্য যারা মরল, ভুল স্বীকার করলেই কি তারা বেঁচে উঠবে? তুমি দেখে নিও রাজু, আমার পিস্তলে এখনো পাঁচ রাইন্ড গুলি আছে। ওদের পাঁচজনের জন্য এর বেশি দরকার হবে না।'

পূরবী মৃদু তিরস্কার করে বলল, 'ছিঃ জাফর, এভাবে বলছো কেন? ভুলে যেও না তুমি একজন কমিউনিস্ট।'

জাফর তিক্ত হেসে বলল, 'সেজন্যই স্ক্রাউন্ড্রেলগুলো এখনও নেতাগিরি ফলাতে পারছে।'

চুলোর আগুনটাকে একটু উস্কে দিয়ে পূরবী শান্ত কঠিন গলায় বলল, 'দীপু তোমার পাশে আছে ভুলে যেও না। তোমাদের কাছে ওর অনেক কিছু শেখার আছে।'

জাফর কোনো কথা না বলে ঝর্ণার দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকল। দীপু দেখল, জাফরের চোখে ঝর্ণার ছায়া কাঁপছে। মুখটা ধীরে ধীরে কোমল হয়ে আসছে। রাজু আর পূরবী আবার আগের মতো নিচু গলায় কথা বলছে। দীপু জাফরকে আস্তে আস্তে বলল, 'বাবার কথা তোমার মনে পড়ে জাফর?'

ঝর্ণার পানিতে রাংতার কুচির মতো মাছের আনাগোনা দেখতে দেখতে জাফর বলল, 'বাবা ছাড়া আমার আর কেউ ছিল না।' কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার বলল, 'নওগার এক কলেজে পড়াতেন বাবা। বড় শহর তাঁর ভালো লাগতো না বলে সারাজীবন মফস্বল কলেজে চাকরি করেছেন। জীবনটা অবশ্য ফুরিয়ে যাওয়ার অনেক আগেই তাঁকে শেষ করে ফেলা হয়েছে। আমি তখন আত্রাইতে লড়ছি। পাঞ্জাবীরা বাবাকে তাঁর বসার ঘরের চেয়ারে বসে থাকা অবস্থায় গুলি করেছিল।'

জাফর থামলো কিছুক্ষণের জন্য। ক্ষোভ আর বেদনার গভীর কালো ছায়া ওর মুখে। আপন মনে বলল, 'মার কথা আমার কিছুই মনে নেই। মা মারা গেছেন খুব ছোটবেলায়। বাবা কোনোদিন মার অভাব বুঝতে দেননি। বিপ্লবের প্রথম পাঠও আমি বাবার কাছে পেয়েছিলাম। তবে বাবা কখনো মস্কো পিকিঙের দ্বন্দ্ব সহজভাবে মেনে নিতে পারেন নি। আমাকে যদিও সেভাবে বাধা দেননি, তবু মাঝে মাঝে বলতেন, কমিউনিস্ট পার্টি করার স্বভাব তোর নয়। তুই বড় বেশি ভাববাদী, হুট করে একাই একটা কিছু করে ফেলতে চাস। আমি রাজুর কথা বাবাকে বলেছি, পার্টি প্রক্রিয়ায় থাকলে ভাববাদ কেটে যাবে। যুদ্ধের সময় রাজুর সঙ্গে আমার দেখা। আমাদের তখন লড়তে হচ্ছে কখনও পাকিস্তানী সৈন্যের বিরুদ্ধে, কখনও ইন্ডিয়া থেকে আসা মুজিববাহিনীর বিরুদ্ধে। আবার কোন কোন এলাকায় জোতদারদের গলাও কাটা হচ্ছে। ভীষণ বিভ্রান্তির সময় ছিল তখন। তখন যদি রাজুকে না পেতাম আমি শেষ হয়ে যেতাম। রাজুর মতো বন্ধু কখনো পাইনি।'

কথা শেষ করার পর জাফর বহুক্ষণ পুরোনো স্মৃতির ভেতর মুখ গুঁজে পড়ে রইল। পূরবী ফ্লাস্কের কাপে করে ওদের দু'জনকে লাল চা এনে দিল। চা দিয়ে রুটি ভিজিয়ে খেতে খেতে রাজু বলল, 'কোথায় যাওয়া যায় কিছু ভেবেছো জাফর?'

জাফর মাথা নেড়ে ম্লান হাসল— বনে বনে পালিয়ে থাকা ছাড়া তো অন্য কোনো পথ দেখছি না। আমরা এমনই রাজনীতি করি যে লোকালয়ে গেলে সবাই তেড়ে আসবে।'

জাফরের কথা শুনে রাজু একটু বিরক্ত হল— 'এভাবে কথা বলছো কেন জাফর? অল্পেই তুমি হতাশ হয়ে পড়ো। আমরা বিপ্লব করতে এসেছি, ছেলেখেলা তো নয়। লড়াইটা নিজের সঙ্গেও করতে হয়।'

'তুমি আর পূরবী বসে একটা সিদ্ধান্ত নাও না। তোমরা যা বলবে, আমি তাই করবো।'

'না, তোমাকেও থাকতে হবে। আমরা চারজন একসঙ্গে বসে সিদ্ধান্ত নেবো।' জাফরের হতাশাকে রাজু প্রশ্রয় দিতে চাইল না।

জাফর বিড়বিড় করে বলল, 'বেশ তো বসো না।'

আকাশে সূর্য তখন অনেক ওপরে উঠে এসেছে। ঘন শালবনের ভেতরে আলোর টুকরো ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে। পাহাড় থেকে নেমে আসা ঝর্ণার স্বচ্ছ ধারা কখনও ঝলসে উঠছে রোদে। চারপাশের ঠান্ডা ভেজা বাতাস ঝর্ণার পানিতে ছোট ছোট ঢেউ তুলে বয়ে যাচ্ছে।

ওরা চারজন পুরোনো একটা শালগাছের নিচে বসে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক করল। রাজু আর পূরবীর কথা শোনার পর জাফর বলল, 'দক্ষিণে কোথাও যাবার কথা আমিও ভাবছিলাম। কিন্তু টাকা কোথায় পাবে? রহমান ভাই'র সঙ্গে কবে দেখা হবে ঠিক আছে!'

দীপু বলল, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের এ এলাকা ছেড়ে চলে যেতে হবে।'

'কিন্তু টাকা পাচ্ছো কোথায়?' জাফর একটু অধৈর্য হয়ে বলল, 'হেঁটে হেঁটে চট্টগ্রাম কক্সবাজার যেতে চাও নাকি!'

রাজু মৃদু হাসল— 'হাঁটতে ভয় পাচ্ছো কেন? বিনা টিকেটে ট্রেনে যাওয়ার চেয়ে হাঁটা অনেক নিরাপদ।'

পূরবী একটু ইতস্তত করে বলল, 'অনেক আগে গঞ্জের একটা ব্যাংকে আমি কিছু টাকা রেখেছিলাম। কিন্তু ওখানে যাওয়া কি ঠিক হবে?'

জাফর সাগ্রহে বলল, 'আমি যাবো পূরবী। তোমার সঙ্গে চেক বই আছে?'

'আছে।' জাফরের আগ্রহ সত্ত্বেও পূরবীর সংশয় কাটে না— 'কিন্তু তুমি যাবে কিভাবে?'

'আহ পূরবী! আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারো। লুঙ্গি আর পাঞ্জাবি পরে মাথায় কিস্তিটুপি দিলে যে কেউ ব্যাপারি বলে ডাকবে। গত দু'তিন মাসে দাঁড়িটাও বেশ হয়েছে।' বলে হেসে ফেলল জাফর।

রাজুও এবার হাসল— 'গোঁফটা শুধু ট্রিম করতে হবে।'

'হবে, হবে, সব হবে। কলেজে থাকতে কম নাটক করিনি।'

'তাহলে আর ভাবনা কি!' রাজু তরল গলায় বলল, 'আজ যখন ট্রেন পাওয়ার সম্ভাবনা নেই রাতটা এখানে কাটানো যাক। কাল ভোরে উঠে তুমি মানি এ্যাকশনে বেরিয়ো।'

'এটা এ্যাকশন নয়, কালেকশন।' হো হো করে হাসল জাফর।

দীপু ওদের সবাইকে দেখল। অনেকক্ষণ ধরে একটা কথা ওর গলার কাছে ছটফট করছে, বলতে পারছিল না। শেষে রাজুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেই বলল, 'এখান থেকে যাবার আগে আমি একবার হালদার হাট যেতে চাই।'

জাফর আর পূরবী মুহূর্তের জন্য দৃষ্টি বিনিময় করল। তারপর ওরাও রাজুর দিকে তাকাল। কিছুক্ষণ কারো মুখে কোনো কথা নেই। ঝর্ণার পানিতে কয়েকটা মরা শালপাতা খসে পড়ে স্রোতের টানে ভেসে যেতে লাগল। নিরবতা ভেঙে প্রথম কথা বলল পূরবী— 'হালদার হাটে কেন যেতে চাইছো দীপু?'

দীপুর বুকের ভেতর এতক্ষণ যে ঝড় গুমরে মরছিল, গলা ঠেলে সেটা বেরিয়ে

আসতে চাইল। তবু কণ্ঠস্বর যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক রেখে সে বলল, 'তোমরা সবাই এটাকে ভুল খতম বলছো, কিন্তু আমি এখনও জানি সাহেবালী ঘৃণ্য জোতদার। গরিব কৃষকদের এতে খুশি হওয়ার কথা। সফল খতমের পর গ্রামে তদন্ত হওয়া দরকার। আমরাতো গ্রামের কৃষকদের কাছেও শেল্টার পেতে পারি।'

জাফর তিক্ত গলায় বলল, 'চমৎকার বলছো দীপু। একবার গিয়ে দেখো, কৃষকরা জামাই আদর দিয়ে ঘরে নিয়ে তুলবে।'

রাজু ভুঁরু কুঁচকে একবার জাফরের দিকে তাকাল। তারপর শান্ত গলায় দীপুকে বলল, 'বিপদের সম্ভাবনাকে ছোট করে দেখতে যেও না দীপু। গ্রামে এতক্ষণে পুলিশ এসে গেছে। নতুন লোক দেখলেই ধরবে। সফল খতম হলে আমিও তদন্ত করার জন্য তোমার সঙ্গে যেতাম।'

'প্লীজ কমরেড, আমাকে যেতে দাও। আমি একাই যাবো। ওখানে তোমাকে অনেকে চেনে। আমাকে কেউ চিনতে পারবে না। আমি ঠিকই ফিরে আসতে পারবো। খতম যখন করেছি তদন্ত করতেই হবে।'

পূরবী মৃদু গলায় বলল, 'এটাতো বইয়ের কথা দীপু। আমাদের এখনকার বাস্তব অবস্থাটা তুমি দেখবে না?'

দীপু পূরবীর কথার কোন জবাব না দিয়ে রাজুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। রাজু ম্লান হাসল— 'ঠিক আছে কমরেড, তুমি যেতে পারো। তবে কারো সঙ্গে কোন কথা বলবে না।'

দীপু উঠে দাঁড়াল। দু'চোখে রাজুর প্রতি কৃতজ্ঞতা। রাজু পূরবীকে বলল, 'ওকে লুঙ্গি আর গামছাটা বের করে দাও। দেরী করলে সন্ধ্যের আগে ফিরতে পারবে না।'

কিছুক্ষণ পর দীপু খালি গায়ে লুঙ্গি পরে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল। জাফর ওকে দেখে হেসে ফেলল। দীপুর মুখে শুকনো হাসি— 'আমি গ্রামের ছেলে জাফর।'

ঝর্ণার তীর ধরে হালদার হাটের পথ ধরল দীপু। রাজু, জাফর আর পূরবী ওর চলার পথে বহুক্ষণ তাকিয়ে রইল। রাজু বলল, 'পোস্ট মর্টম না হলে এতক্ষণে সাহেবালীর কবর হয়ে যাওয়ার কথা।'

জাফর বলল, 'যাই বলো রাজু, ওর এভাবে যাওয়া উচিৎ হয়নি।'

পূরবী আস্তে আস্তে বলল, 'ঠিকই আছে জাফর। রাজু ভুল করেনি। দীপুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দরকার আছে। তোমাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় এটা ভুল হতে পারে, কিন্তু দীপু এভাবে মানবে কেন?'

রাজু বলল, 'দীপুর প্রথম খতম এটা। কতদিন এর জন্য অপেক্ষা করেছে। এটাকে চট করে ভুল বলে মেনে নেয়া ওর পক্ষে সহজ হবে না।'

জাফর আর কোন কথা বলল না। মাঝে মাঝে শুকনো শালপাতা ঝর্ণার পানিতে পড়ে স্রোতের টানে হারিয়ে যাচ্ছে। বনের ভেতর কোথাও এতটুকু শব্দ নেই। হালকা একটা দীর্ঘশ্বাস ওদের কারো বুক থেকে বেরিয়ে এসে বাতাসে মিলিয়ে গেল।

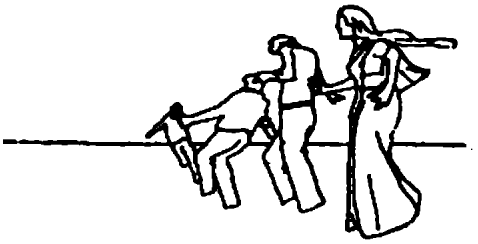

দীপু যখন হালদার হাটে এসে পৌঁছল, সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে। নভেম্বরের ধারালো রোদে বিবর্ণ দীপুকে চেনার উপায় নেই। ঘাম আর ধুলো ওর সারা গায়ে একাকার হয়ে রয়েছে।

দূর থেকে দীপু সাহেবালী মন্ডলের শবযাত্রা দেখতে পেল। গ্রামের বাইরে শীর্ণ এক পাড়ভাঙ্গা নদীর তীরে গোরস্থান। দুজন গোরখোদক কবর খুঁড়ছিল। দীপু এগিয়ে এসে শবানুগমনের যাত্রী হল।

শবযাত্রীদের ভেতর সামনের দিকে কয়েকজন মোল্লা আর অবস্থাপন্ন লোক থাকলেও পেছনে বেশির ভাগই ছিল দরিদ্র মানুষ। গায়ে প্রায় কারোই কাপড় নেই। পরনে লুঙ্গি জাতীয় এক টুকরো ছেঁড়া কাপড়। ওদের মুখে ছিল-- দুঃখ অথবা উল্লাসের বদলে আতঙ্কের ছায়া। কয়েকজন নিচু গলায় কথা বলছিল। 'নকশাল' শব্দটা কানে যেতেই দীপুর সমস্ত ইন্দ্রিয় সতর্ক হয়ে গেল।

দীপু শুনল, গ্রামের কোন মাস্টার নাকি নকশালদের কাছে চিঠি পাঠিয়েছে। সাহেবালীর আগে এই এলাকায় ধলা মিয়া নামে আরেক জোতদার খতম হয়েছে। গ্রামের ওরা জানে নকশালরা ধানের জন্য জোতদারদের মারছে। গ্রামের সবাই ঠিক করেছে এবার থেকে ওরা ধান শুধু জোতদারদের দেবে না। একটা অংশ নকশালদেরও দেবে।

নিচু গলায় জীর্ণশীর্ণ ভাঙাচোরা মানুষগুলো আতঙ্ক ছড়াতে ছড়াতে গোরস্থানের পথে হাঁটছিল। দীপুর বুকের ভেতর তখন অদৃশ্য এক ছুরি সব কিছু এফোঁড় ওফোঁড় করে চলেছে। ওরা কি নকশালদের ডাকাত ভেবেছে? নকশালরা কি ধান লুট করার জন্য জোতদার খুন করে? ভয়ঙ্কর সব প্রশ্ন দীপুকে অজগরের মতো আমুন্ড গিলে খেতে চাইল। একবার ওর ইচ্ছা হল, চিৎকার করে বলে— 'নকশালরা ডাকাত নয়। তোমাদের মুক্তির জন্যেই ওরা জোতদার মেরেছে। জোতদারদের জমি আর ধান তোমাদের মধ্যে বিলিয়ে দিচ্ছে। ওরা তোমাদের জন্যেই লড়ছে, যাতে কোনো জোতদার তোমাদের মুখের গ্রাস কেড়ে খেতে না পারে। তোমাদের জমি ওরা কেড়ে নিয়েছে। তোমরাও রুখে দাঁড়াও . . . .। আরো অনেক কথা ওর গলার ভেতর গুলিবিদ্ধ পশুর মতো ছটফট করতে লাগল। দীপু কিছুই করতে পারল না, শুধু যন্ত্রচালিতের মতো শবযাত্রাকে অনুসরণ করল।

আরেকজন কৃষকের কথা দীপুর কানে এল। মন্ডল ছিল বলে বিপদের সময় দু'এক কাঠা ধান সাহায্য পাওয়া যেত। এখন কে দেখবে! যার কাছে দাঁড়ানো যেতো তাকে

এভাবে মেরে ফেলল!

দীপুর গলা ঠেলে কান্না বেরিয়ে আসতে চাইল। কে এই মূর্খ কৃষকটিকে বোঝাবে, জোতদার যে কখনও ওর আপন হতে পারে না! বিপদের সময় এক কাঠা ধান দিয়ে দু'কাঠা জমি হাতিয়ে নেয় এই সব জোতদার। এরা কি কয়েক ঘন্টার মধ্যেই সাহেবালীর অত্যাচার ভুলে গেল? ও তো হালদার হাটের একজন কৃষকের কাছে মাত্র কদিন আগেও শুনেছে সাহেবালীর অত্যাচারে নাকি ওরা সব অতিষ্ঠ হয়ে আছে। দীপু আর ভাবতে পারল না। ওর অনুভূতিগুলো ধীরে ধীরে যেন ভোঁতা হয়ে আসছিল।

গোরস্থানে দু'জন রুক্ষ নির্বিকার চেহারার মানুষ কবর খুঁড়ছিল। ঘামে ওদের সারা শরীর চকচক করছে। কয়েকটা পুরোনো কবর হা হয়ে রয়েছে। ভেতরে ছিন্ন করোটি আর সাদা হাড়গোড়। সাহেবালীর লাসটা সদ্য খোঁড়া কবরের পাশে নামিয়ে রাখা হলো। দাড়িওয়ালা মোল্লারা গুন গুন করে সুরা পড়ছে। সবাই কবরের চারপাশে এগিয়ে এসেছে। সহসা, দীপুর সারা শরীরে বিদ্যুৎ প্রবাহ বয়ে গেল। কাল রাতে দেখা সাহেবালীর ছোট মেয়েটা কবরের পাশে একজন বুড়োর হাত ধরে দাঁড়িয়ে। নিষ্পাপ চোখের নিচে এখনো কান্নার দাগ শুকোয় নি। মাঝে মাঝে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। মুহূর্তের জন্য দীপুর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই দীপু একজনের আড়ালে সরে এল। মেয়েটা ওকে চিনতে পারে নি।

সাহেবালীর লাস কবরে নামানো হল। দীপু আড়াল থেকে তাকিয়ে দেখল মেয়েটা কাকে যেন তখনও খুঁজছে। কয়েকজন লোক হাতের মুঠোয় করে কবরে মাটি দেয়ার পর গোরখোদকরা কোদালে করে দ্রুত মাটি ফেলতে লাগল।

রোদের তেজ কমে এসেছে, তবু দীপুর মনে হলো ওর দু'কান দিয়ে গরম আগুনের হলকা বেরোচ্ছে। ঝাঁ ঝাঁ করছে মাথার ভেতরটা। মোনাজাত করার সময় সেও সবার সঙ্গে হাত তুলল। এ ভুল শোধরানোর কোনো পথ নেই। মোনাজাত শেষ করে লোকজন ছড়িয়ে পড়তে লাগল। ওদের সঙ্গে দীপুও গোরস্থান থেকে বেরিয়ে এল।

শালবনের পাশ দিয়ে হাটে যাবার রাস্তা। কিছুটা পথ কয়েকজন হাটে যাওয়া লোকের সঙ্গে এসে এক ফাঁকে শালবনে ঢুকে পড়ল দীপু। বনের ভেতর একরকম দৌড়ে চলল সে। মনে হচ্ছিল ছোট মেয়েটার নিষ্পাপ কান্নাভেজা দৃষ্টি একরাশ প্রশ্ন নিয়ে ওকে বুঝি তাড়া করছে।

সন্ধ্যার পর পরই সঙ্গীদের কাছে ফিরে এল দীপু। রাজু, পূরবী, জাফর তিনজন একসঙ্গে চমকে উঠল দীপুর চেহারা দেখে। বাজপড়া গাছের মতো বিধ্বস্ত মনে হচ্ছে ওকে। দৃষ্টি উদভ্রান্ত। রাজু ব্যস্ত গলায় জানতে চাইল, 'কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি তো দীপু?'

দীপু কোনো কথা না বলে মাথা নাড়ল। তারপর ঘাসের বুকে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর পূরবী বলল, 'একটু বিশ্রাম নিয়ে গা ধুয়ে এসো। আমি খাবার তৈরি করছি।'

দীপু মাথা নাড়ল— 'আমার একটুও ক্ষিদে নেই।'

'না খেলে শরীর খারাপ করবে যে দীপু!'

দীপু কথার জবাব না দিয়ে আকাশের গায়ে ছড়ানো ছোট ছোট মেঘের মৃদু আনোগোনা দেখতে লাগল। গতকালও গোধূলির আকাশে এরকম ধূসর বেগুনি আর লালমেঘের আনাগোনা ছিল। সেই মুহূর্তে রফিক ভাই'র কোনো কথা দীপু মনে করতে পারল না।

সন্ধ্যাতারা যখন দীপুর চোখের সামনে ফুটে উঠল, তখন ওর মার কথা মনে হল। মা হয়তো এখনও জানেন না ও যে রাজনীতির সাথে এভাবে জড়িয়ে গেছে। কতদিন বাড়ি যায়নি দীপু। এখনও হয়তো মহসিন হলের ঠিকানায় মা চিঠি লেখেন। মা শুধু এটুকু জানেন মাঝে মাঝে কিছুদিনের জন্য দীপু হল থেকে উধাও হয়ে যায়।

অন্ধকার ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে অতীতের স্মৃতিগুলো ধীরে ধীরে নেমে আসা কুয়াশার মতো অস্পষ্ট হয়ে এল। সব কিছু ফাঁকা মনে হল দীপুর। বুকের ভেতর থেকে কান্না যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। নিজেকে নিজের কাছে মস্তো এক বোঝার মতো মনে হচ্ছে। এ বোঝা এভাবে আজীবন টেনে বেড়াতে হবে— ভাবতে গিয়ে কখনো আতঙ্কিত, কখনো অসহায় মনে হল নিজেকে।

রাতে পূরবী আর জাফর আগুন জ্বেলে চা বানাতে বসল। পূরবীর স্যুটকেসের ভেতর থেকে একটা বড় চাদর বের করে রাজু শুকনো পাতার উপর বিছিয়ে দিয়েছে। খোলা আকাশের নিচে ওদের রাত কাটাতে হবে। এভাবে অবশ্য অনেক রাতই ওদের কাটাতে হয়েছে কিন্তু এবারের পরিস্থিতি অন্যরকম। প্রচন্ড এক অনিশ্চয়তা আর উদ্বেগ ওদের সারাক্ষণ তাড়া করে ফিরছে। তবু ওরা চেষ্টা করছে স্বাভাবিক থাকার। রাজুর মনে হলো এতখানি দায়িত্ব আগে কখনও বইতে হয়নি। কোনো অবস্থাতেই ভেঙে পড়লে চলবে না।

পূরবীদের চা বানানো শেষ হলে রাজু বলল, 'আগুনটা নিভিও না। রাতে এদিকে মাঝে মাঝে বুনো শুয়োর বেরোয়।'

জাফর দীপুকে সঙ্গে নিয়ে ঝর্ণার পানি থেকে গা ধুয়ে এসেছে। অনেকটা স্বাভাবিক মনে হচ্ছে ওকে। আগুনের চারপাশে গোল হয়ে বসে চা দিয়ে বাসি রুটি খেল ওরা। খাবার পর রাজু জিনিষপত্র একদিকে গুছিয়ে চাদরের একপ্রান্তে শুয়ে পড়ল।

আগুন জ্বলিয়ে রাখার দায়িত্ব নিয়েছে জাফর, মাঝে মাঝে শুকনো ডালপাতা গুঁজে দিচ্ছে। আগুনের কাঁপা কাঁপা আলোয় ডায়রি লিখছিল পূরবী। জাফর বলল, 'ডায়রি লেখার অভ্যাস এখনো যায়নি! ধরা পড়লে সবাইকে মারার ব্যবস্থা করে রাখছো।'

পূরবী মাথা না তুলে মৃদু হেসে বলল, 'আমার ডায়রি কেউ কখনও খুঁজে পাবে না। আর আমিও কখনও ধরা পড়বো না।'

পূরবীকে ছেড়ে জাফর এবার দীপুকে ধরল— 'অতদূরে বসে আছো কেন দীপু? কাছে এসে বসো।'

পূরবী তখন ডায়রীতে লিখছিলো—

'আমাদের আপাত গন্তব্য দক্ষিণে সমুদ্রের তীরে এক পাহাড়ে। পাঁচ বছর আগে একবার

সেখানে গিয়েছিলাম। সেই এলাকার জেলেদের ভেতর পার্টির কিছু কাজ ছিল। '৭১-এর পর পার্টির কেউ সেখানে যায় নি। আমার প্রথম কাজের এলাকা ছিল সেটা। পশ্চিমে সমুদ্র, পুব দিকে ঝাউবন আর পাহাড়, সমুদ্রের লোনা বাতাসে কাঁচা মাছের গন্ধ— জানি না কেমন আছে জেলেপাড়ার সুঁচাদ মাঝি, হরিপিসি, তারাদাস! কী উদ্দীপনাময় সময় ছিল তখন। আমার সঙ্গে ছিল জমির, রশিদ, মিনু আর বিজন। জেলেপাড়ার ছেলে বিজন নিজের চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত এসেছিল, একাত্তরে শহীদ হল আত্রাইতে। জমির আর রশিদ মরল তিয়াত্তরে কুষ্টিয়ায় এ্যাকশন করতে গিয়ে। মিনু বেরিয়ে গেছে পার্টি থেকে। পাঁচ বছর পর আবার সেখানে যাচ্ছি, রাজু, জাফর আর দীপুকে নিয়ে....।'

রাত ক্রমশ গভীর হল। ডায়রির সাদা পাতায় কালো অক্ষরের মিছিল দীর্ঘতর হল। জাফর আর দীপু তখনও নিচু গলায় কথা বলছে। রাজু ঘুমিয়ে গেছে। দীপুর মুখে আগুনের লাল ছায়া কাঁপছে, হালদার হাটের পুরো ঘটনা সে জাফরকে খুলে বলেছে। নিষ্পাপ সেই ছোট্ট মেয়েটার কথাও বাদ দেয়নি।

দীপুর কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল জাফর। দীপুকে সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা ওর জানা নেই। ও বলতে পারে প্রথম খতমের সময় ওর কিরকম লেগেছিল। কিন্তু পুরোনো ক্ষত খোঁচাতে ভালো লাগল না জাফরের। দীপু আস্তে আস্তে বলল, 'তোমাদের সঙ্গে দুপুরে অযথা তর্ক করেছি। এখন মনে হচ্ছে, না গেলেই ভালো হত।'

'না দীপু।' প্রায় ফিশ ফিশ করে বলল জাফর, 'না গেলে অনেক কিছু তোমার অজানা থেকে যেতো।' একটু থেমে আবার বলল, 'গত ক'বছর আমরা একটানা শ্রেণীশত্রু খতম করেছি। অনেক জায়গায় কৃষকরা খুশি হয়েছে, অনেক জায়গায় দুঃখ বা ভয় পেয়েছে, কিন্তু কৃষকদের আমরা কতটুকু সচেতন করতে পেরেছি? সিএম তো এ-ও বলেছেন কৃষকদের সঙ্গে একাত্ম হতে। আমরা ক'জন পেরেছি সত্যিকার অর্থে একাত্ম হতে? আসলে নেতৃত্ব যতদিন আমাদের মতো ভদ্রলোকদের হাতে থাকবে, কৃষকদের সচেতন করার কথাটা বলাই শুধু সার হবে, কাজ হবে না। কৃষকরা সচেতন ছিল না বলে জমির, মানিক, হীরু আর রশিদ এ্যাকশনে গিয়ে কৃষকের হাতে জীবন দিয়েছে। এখন রাজু ছাড়া ওদের মতো সাহসী কমরেড কে আছে! মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় সবকিছু ভেঙে একাকার করে ফেলি। রাজু না থাকলে এতদিনে মানুদের মতো কয়েকটাকে আমি নিজেই খতম করতাম।'

জাফরের কথাগুলো স্বগতোক্তির মতো মনে হচ্ছিল দীপুর কাছে। ওকে সামনে রেখে জাফর পার্টি রাজনীতির পোস্ট মর্টম করে চলেছে। পূরবী আপন মনে ডায়রী লিখছে। চারপাশে ঠান্ডা সাদা কুয়াশার ভেতর একটুকরো আগুন সামনে রেখে পূরবী তার গভীর বিশ্বাস দিয়ে, অতীতের ক্যানভাসে ভবিষ্যতের ছবি আঁকছে, দুঃসহ বর্তমানকে ভুলে থাকার জন্য। পূরবীকে দেখে হাসিনার কথা মনে হল দীপুর। শালগাছের পাতা থেকে একফোঁটা দু'ফোঁটা শিশির গড়িয়ে পড়ল। শেষ বিকেলের উত্তেজনা ক্রমশঃ দীপুর বুকের ভেতর থেকে হারিয়ে গিয়ে সেখানে কুয়াশার মতো শান্ত শূন্যতা জমছিল। জাফর গুন গুন করে কথা বলে চলেছে। দীপু বুঝতে পারছিল সব কথা শুধু ওকে শোনাবার জন্য বলছে না জাফর, কিছু কথা ও দীপুকে সামনে রেখে নিজেকে

শোনাবার জন্যও বলছে। জাফরের কথা শেষ হওয়ার পর ওর একটা দু'টো শব্দ নিয়ে দীপু মনের ভেতর নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'তুমি কি সাহসী নও জাফর?'

জাফর একটু অবাক হয়ে দীপুর মুখের দিকে তাকাল। আগুনের লাল ছায়ার সঙ্গে কোমল এক বিষণ্ণতা মেশানো ওর মুখে, নিষ্পলক চোখে আগুনের দিকে তাকিয়ে আছে। জাফর জানতে চাইল—'এ কথা কেন জিজ্ঞেস করছো দীপু?'

দীপু আগুনের ওপর থেকে চোখ না ফিরিয়ে বলল, 'আমি জানি তুমি রাজুর চেয়ে বেশি সাহসী।'

জাফর মৃদু হেসে বলল, 'আমি শুধু ধ্বংস করতে জানি দীপু। এটাকে আমার অকপট স্বীকারোক্তি বলে ধরে নিতে পারো। রাজু অনেক হিসেবি। যে জন্যে সব সময় ওর সাহস মেপে দেখা যায় না। যে কোন পরিস্থিতিতে ও সিদ্ধান্ত নেয়ার সাহস রাখে। আমি পারি না। যে জন্যে রাজুকে আমি ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি।'

'জানি।'— বলে দীপু চুপ করে রইল। পূরবীকে দেখে বার বার ওর হাসিনার কথা মনে হচ্ছিল। জাফর বলল ভালোবাসার কথা। দীপু জাফরের দিকে তাকাল। জাফর ঘাড় কাত করে পূরবীকে দেখছে। দীপু আস্তে ডাকল, 'জাফর!'

জাফর মুখ ফেরাল— 'কিছু বলছো?'

কয়েক মুহূর্ত জাফরের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে দীপু বলল, 'তুমি কি পূরবীকে ভালোবাসো জাফর?'

জাফর চোখ তুলে দীপুর দিকে তাকাল। অন্য কিছু ভেবে নয়, শুধু জানার জন্যই কথাটা বলেছে দীপু। জাফর বুঝে উঠতে পারল না কি জবাব দেবে কিম্বা কোন জবাবটা সত্য হবে। কিছুক্ষণ চুপ থেকে আপন মনে বলল, 'হয়তো বাসি, হয়তো বা না— তুমি যে অর্থে জানতে চাইছো। আমি ঠিক জানি না দীপু, কখনও ওভাবে ভেবে দেখিনি।'

দীপু মনে মনে বলল, 'আমি একজনকে ভালোবাসি বলে বুঝতে পারি, তুমি পূরবীকে ভালোবাসো। তোমার সাহস আছে। তবু তুমি আসলে যে কি চাও নিজেও জানো না।' দীপুর বুকের ভেতর থেকে গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

পূরবী ডায়রী লেখা বন্ধ করে ওদের দিকে তাকাল— 'কি হল, তোমরা কি সারারাত গল্প করবে!'

জাফর বলল, 'তুমি ঘুমিয়ে পড়ো পূরবী।'

'দীপুর ঘুমানো দরকার।' কোমল গলায় বলল পূরবী— 'সারাদিন ওর ওপর কম ধকল যায়নি।'

দীপু ম্লান হেসে বলল, 'আমার ঘুম পাচ্ছে না।'

শাড়ীটা ভালো মতো গায়ে জড়িয়ে নিল পূরবী। যদিও সময়টা হেমন্তের মাঝামাঝি, তবু খোলা জায়গায় ঘন কুয়াশার ভেতর বেশ শীত লাগছিল। জাফর আগুনের ভেতর কয়েকটা শুকনো ডাল গুঁজে দিল। দীপু বিড় বিড় করে বলল, 'কাল এতক্ষণে আমরা সাহেবালীর বাড়িতে।'

জাফর কয়েক মুহূর্ত দীপুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ হেসে

উঠল—'তোমার হাতে তো ঘড়ি ছিল না দীপু!'

তখন কালপুরুষটা ঠিক মাথার উপর ছিল। আমি দেখেছিলাম।'

জাফর হালকা গলায় বলল, 'আমি তারা-টারা চিনি না।'

দীপুর মুখের দিকে তাকিয়ে অস্বস্তি বোধ করল জাফর। এখনও অতীতের যন্ত্রণা বয়ে বেড়াচ্ছে দীপু। সামনে তো আরও দুঃসময়। দীপু কিভাবে লড়বে সেই দুঃসময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে? জাফর সবকিছু ভুলে নিজেকে প্রস্তুত করছে আরো কঠিন সময়ের জন্য। বলল, 'ভুলে যাও দীপু। যতো তাড়াতাড়ি পারো ভুলে যাও।'

দীপু চুপ করে রইল। মনে মনে বলল— 'আমি তো ভুলে থাকতেই চাই।'

জাফর আগুনের ভেতর কয়েকটা শুকনো কাঠ গুঁজে দিয়ে বলল, 'তুমি জানো না দীপু আমার স্মৃতি কত বেশি ভয়াবহ আর যন্ত্রণায় ভরা। যখন বিষয়টাকে অন্যভাবে দেখি, তখন মনে হয় তিনশ' সাতাশি জন মানুষকে আমি অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছি। তুমি যে মেয়েটার কথা বলছো, ওদেরও সেরকম ছেলে-মেয়ে ছিল। ওরাও ছিলো কারো সন্তান— স্নেহ, ভালোবাসার অবলম্বন। এমনও সময় গেছে আমাদের কেউ কেউ রাজনৈতিক ঘৃণার সুযোগ নিয়ে ব্যক্তিগত ঘৃণা মিটিয়েছে। পার্টির প্রশংসা পাওয়ার জন্য, নেতাদের কাছে ভালো কমিউনিস্ট হওয়ার জন্য জেনেশুনেও ভুল খতম করেছি। এসব স্মৃতি অনেক বেশি যন্ত্রণার। সেজন্যেই বলছি দীপু, তুমি ইচ্ছে করলে ভুলতে পারবে, অন্তত আমার চেয়ে তোমার বোঝা অনেক কম।'

জাফরের শেষের দিকে কথাগুলো হাহাকারের মতো শোনাল। দীপু ওর জন্য কষ্ট পেল। নিজেকে ওর পাশে নিষ্প্রভ মনে হল। ও ভেবেছিল, কি দুঃসহ যন্ত্রণার স্মৃতি ওকে বয়ে বেড়াতে হবে আজীবন। জাফর আর রাজুর ভেতর সাহেবালীর জন্য কোন উদ্বেগ না দেখে নিজেকে বড় একা মনে হচ্ছিল। নিজের স্বার্থপরতার কথা ভেবে লজ্জা পেল দীপু। ওর কমরেডদের অনেক বেশি যন্ত্রণাময় সময় পেরিয়ে আসতে হয়েছে। জাফরের দিকে তাকিয়ে দেখল, ওর ভেজা চোখে আগুনের ছায়া কাঁপছে। জাফরের জন্য গভীর ভালোবাসা অনুভব করল দীপু। ওর একটা হাত নিজের হাতের মুঠোয় তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'আমাকে ক্ষমা কর জাফর। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাইনি।'

জাফর কোনো কথা না বলে দীপুর হাতে মৃদু চাপ দিল। দীপু আবার বলল, 'সব কথা ভুলে থাকা যায় না জাফর। তবু কিছুটা শান্তি পাওয়া যায়, কেউ যদি যন্ত্রণায় অংশীদার হয়। তোমার এখন প্রয়োজন কাউকে ভালোবাসার। আমার মনে হয় পূরবী তোমাকে ভালোবাসে। অন্তত তোমার জন্য ও বিশেষভাবে ফীল করে, এটা আমি বুঝতে পারি। নইলে রফিক ভাইকে বিয়ে করার প্রস্তাব পূরবী প্রত্যাখ্যান করতে পারতো না।'

জাফর মৃদু হাসল— 'পূরবী আমার চেয়ে অনেক জিনিস অনেক বেশি বোঝে। রাজনীতি সম্পর্কে ওর পড়াশোনাও আমার চেয়ে বেশি। ওর সমকক্ষ হতে আমার আরও সময়ের দরকার। পূরবীকে ততদিন অপেক্ষা করতে বলার শক্তি আমার নেই। সাহস আর শক্তি দুটো আলাদা জিনিস দীপু।' একটু থেমে জাফর বলল, 'পূরবী যদি রাজুকে বিয়ে করে আমি অখুশি হবো না। রাজুর জন্য আমি অনেক কিছু ত্যাগ করতে পারি।'

দীপু জাফরের কথার কোন জবাব দিল না। মনে মনে বলল, 'তুমি ইচ্ছে করলে অনেক কিছু করতে পারো জাফর। সে ক্ষমতা তোমার আছে। আমিও চাই সত্যিকার অর্থে কিছু করতে। রফিক ভাইদের কথা আমি ভাবি না। ওরা আমার জন্য কোনো বাধা নয়। ওদের চেয়ে ভয়ঙ্কর শত্রুর বিরুদ্ধে আমি লড়তে চাই। দেশের আজকের এই অবস্থার জন্য যারা দায়ী, যাদের জন্য প্রতিদিন শত শত মানুষ না খেয়ে মারা যাচ্ছে, ভিটেছাড়া হচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে লড়তে চাই আমি। সেজন্যই তোমাদের সঙ্গে এসেছি।'

রাত যত বাড়ে কুয়াশা তত ঘন হয়। জাফর আগুনের ভেতর আরও কিছু কাঠ গুঁজে দেয়। দূর থেকে বুনো কুকুরের ডাক ভেসে আসে। জাফর একবার দীপুকে বলে, 'কিছু বলছো না যে দীপু?'

দীপু মৃদু হেসে মাথা নাড়ে। বলার মতো কোন কথা জাফরও খুঁজে পায় না। অনেকক্ষণ আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকার পর জাফরের চোখে তন্দ্রা নামে। দেখে, একটার পর একটা বুনো হাঁস আগুনের ভেতর থেকে উঠে এসে কুয়াশায় ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে। একসময় ঘুমিয়ে পড়ে জাফর। শুধু দীপু জেগে থাকে রাতভর।

পরদিন পূরবীর ডাকে জাফরের ঘুম ভাঙল। তাকিয়ে দেখে চারদিকে আলো ফুটে উঠেছে। পূরবী ভোরে উঠে গোসল করেছে। তখনও চুলের ডগা বেয়ে পানির ফোঁটা ঝরছে। চোখের পাতাও ভেজা। জাফরের ঘুম জড়ানো চোখে পূরবীকে সেই মুহূর্তে অত্যন্ত পবিত্র মনে হল।

জাফর মৃদু হেসে হাই তুলে বলল, 'খাবার কিছু আছে নাকে তোমার ভাঁড়ারে? পেটের ভেতর প্রজাপতি উড়ছে।'

পূরবী হেসে বলল— 'প্রজাপতি উড়ুক কি বুনো হাঁস উড়ুক, ভাঁড়ার একেবারে শূন্য। চা ছাড়া কিছু জুটবে না।'

রাজু শুকনো কাঠ জড়ো করছিল। হালকা গলায় বলল, 'আমরা রান্নার আয়োজন করছি। টাকা তুলে বাজারটা করে নিয়ে এসো।'

চেক বই বের করে পূরবী জাফরকে বলল, 'তোমার নামেই দিচ্ছি। কি নাম লিখবো বলো!'

জাফর বলল, 'ফকিরউদ্দিন বা ওই জাতীয় কিছু লিখতে পারো। তোমার নিজের নাম মনে আছে তো!'

পূরবী ফকিরউদ্দিন লিখতে গিয়ে হেসে ফেলল— 'আমার নাম চেক বইর ওপরই লেখা আছে।'

'আমি বলছি তোমার সইয়ের কথা। শেষে দেখো জাল বলে না আবার বেঁধে রেখে দেয়।'

মুখ টিপে হেসে পূরবী নিজের নাম সই করল—নাসরীন সুলতানা। জাফর সই দেখে বলল, 'কি রাজকীয় নাম। আমার নামটা তাহলে সুলতান লেখা উচিৎ ছিল।

পূরবী চেকটা জাফরকে দিয়ে হেসে বলল, 'স্টেশন থেকে একটা টুপি কিনে নিও। তোমর যা হিরোমার্কা চেহারা, ধরা না পড়লেই বাঁচি।'

জাফর দীপুকে বলল, 'তোমার লুঙ্গিটা খুলে দাও দীপু। তারপর দেখ ছদ্মবেশ

কাকে বলে।'

ঝর্ণায় মুখ ধুতে গিয়ে জাফর পানিতে ওর ছায়া দেখল। দাড়িগুলো বেশ বড় হয়ে গেছে। কলেজে ও সখ করে একবার দাড়ি রেখেছিল। তখন সবাই ওকে চে গুয়েভারা ডাকতো। পূরবী এতটুকু বাড়িয়ে বলেনি। জাফরের মতো সুদর্শন সুঠামদেহী যুবক ভিড়ের মধ্যেও চোখে পড়বে। চুলগুলো পানিতে ভিজিয়ে মাথার মাঝখান দিয়ে সিথি কাটল। লুঙ্গির উপরে রাজুর খদ্দরের পাঞ্জাবিটা পরলো। তারপর যখন গোবেচারা মুখ করে ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, তখন সবাই উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল। পূরবী হাসতে হাসতে বলল, 'এবার একখানা কিস্তিটুপি মাথায় দিলে মসজিদে আজান দিতে পারবে।'

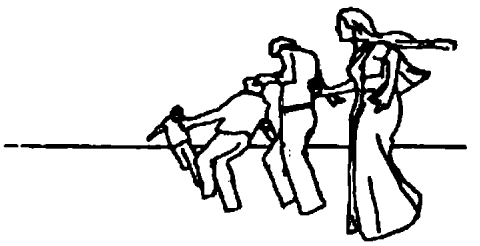

গঞ্জে যাওয়ার লোকাল ট্রেন জামতলি থেকে সাড়ে দশটায় ছাড়বে। চা খেয়ে জাফর দেরি করল না। শহরে পৌঁছতে পৌঁছতে বারোটার মতো বাজবে। শালবনের ভেতর দিয়ে জাফর দ্রুত স্টেশনের পথে পা চালাল।

একটা বুড়ো টিকটিকি প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চে বসে ঝিমোচ্ছিল। জাফর অত্যন্ত নির্লিপ্ত-ভঙ্গিতে ওর নাকের ডগা দিয়ে হেঁটে গিয়ে ট্রেনে উঠল। পূরবী ওকে কয়েকটা খুচরো টাকা দিয়েছিল, তাই টিকেট কিনতে কার্পণ্য করেনি। পূরবীর কথা মতো টুপিও কিনেছে। দু'পাশে ন্যাড়া ধানক্ষেত আর রুক্ষ প্রান্তরের মাঝখানে দিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে লোকাল ট্রেনটা আধঘন্টা দেরি করে গঞ্জে পৌঁছল।

ট্রেন থেকে নেমে জাফর ঘড়ি দেখল—পৌনে একটা বাজে। একজন সাধারণ যাত্রীর মতো স্টেশনের বাইরে এসে রিক্সায় উঠল। জায়গাটা ওর মোটামুটি চেনা আছে। বছর দু'য়েক আগে চিনির কলে শ্রমিকদের ভেতর কাজ করতে এসেছিল। বেশিদিন অবশ্য থাকতে পারেনি। কাছাকাছি একটা গ্রামে খতমের পর সব জানাজানি হয়ে যাওয়ায় এখান থেকে চলে গিয়েছিল।

বহুদিন জাফর প্রকাশ্য লোকালয়ে এভাবে বেরোয়নি। ভেতরে ভেতরে কিছুটা আড়ষ্ট বোধ করছিল। গঞ্জের বাজারে মানুষের ভিড়, সাইকেল, রিক্সা আর মালটানা ঘোড়ার গাড়ির আনাগোনা, মাঝে মাঝে ভেঁপু বাজিয়ে একটা দু'টো ট্রাকের ছুটে যাওয়া, সব কিছু কেমন যেন নতুন, অপরিচিত মনে হচ্ছে। রিক্সাটা ব্যাঙ্কের সামনে এসে দাঁড়ানোর পর জাফরের ঘোর কাটল।

ব্যাঙ্কে বেশি ভিড় নেই। চেকটা কাউন্টারে জমা নিয়ে টোকেন নিয়ে একটা চেয়ারে বসল। আরো তিনজন লোক চেক জমা দিয়ে অপেক্ষা করছে। কাউন্টারে একজনকে চিনতে পেরে জাফর চমকে উঠল। শহরের ডাকসাঁইটে ঠিকেদার রমিজ হাজী। কাউন্টার

থেকে কতগুলো দশ আর একশ টাকার নোট নিয়ে আঙ্গুলে বারবার থুথু লাগিয়ে গুনে পোর্ট ফোলিও ব্যাগে রাখছে। তারপর একসঙ্গে দু'টো পানের খিলি মুখে গুঁজে ম্যানেজারের ঘরে গিয়ে বসল। জাফরকে চিনতে পারেনি। ম্যানেজারের ঘরে বসে লোকটা— 'গোয়ারম্যান এইবার যা রিলিফ দিছে;' 'গোয়ারমেন ম্যালা রাস্তাঘাট বানাইতাছে;' এইসব বলছিল।

রমিজ হাজী এত জোরে বলছিল যে, টুকরো টুকরো কথাগুলো জাফর স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল। কথা শুনে জাফর বুঝল, ঠিকেদারীর পাশাপাশি রমিজ হাজী এখন ইন্ডেন্টিং আর লাইসেন্স পারমিটের ব্যবসাও করছে। মিডল ইস্টে মরিচ এক্সপোর্ট করে— আবার ইন্ডিয়া থেকে ইম্পোর্ট করে, রমিজ হাজীর এখন রমরমা অবস্থা। আওয়ামী লীগের ফান্ডে এক লাখ টাকা দিয়েছে। 'এম পি সাবে কইলো.....।'

একাত্তরের পর থেকে নতুন এক ধরনের ফড়িয়া চরিত্রের ব্যবসায়ীর জন্ম হয়েছে। ক'দিন আগে জাফর সংস্কৃতিতে ডাঃ দাহারের একটা আর্টিকেল পড়েছিলো— উৎপাদনের সঙ্গে বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই, যে কোন পণ্য এদের হাতে পড়লেই দশ বারো গুণ দাম বেড়ে যাচ্ছে। এক একটা লাইসেন্স, পারমিট আট দশবার বিক্রি হচ্ছে। মার খাচ্ছে ছোট ব্যবসায়ীরা, যাদের পুঁজি কম কিম্বা সরকারী দলের সঙ্গে লাইন করতে পারেনি। চোখে অন্ধকার দেখছে নির্দিষ্ট আয়ের মানুষেরা, রাতারাতি জিনিষের দর বাড়লেও যাদের বেতন বা মজুরি বাড়েনি। আওয়ামী লীগের খাতায় নাম লিখিয়ে রমিজ হাজীর মতো পরগাছারা রাতারাতি কোটিপতি হয়ে গেছে।

জাফরের মনে আছে ও যখন চিনির কলে— রমিজ হাজী তখন কুলিদেরও সর্দারী করতো। ঘাটের কুলিদের বখরায় সন্তুষ্ট না হয়ে মিলের ঠিকা মজুরদের মজুরীতে ভাগ বসিয়েছিল। থানা, পুলিশ, ম্যানেজার সব ওর হাতে। প্রথম প্রথম কেউ কিছু বলার সাহস পায়নি। শেষে রমিজ হাজীর খাঁই এমনই বেড়ে গেল যে, কলের মজুররা ওকে ধরে বেশ কয়েক ঘা লাগিয়ে দিয়েছিল। ঠিক তখনই পাশের গ্রামে রমিজ হাজীর আরেক দোসর জাফরদের হাতে খতম হয়।

একটা খড়কে কাঠি দিয়ে নির্বিকার ভঙ্গিতে দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে জাফর রমিজ হাজীর কথা শুনছিল। আগের লোকগুলো বিদায় হওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পরও ওর ডাক না আসাতে জাফর অস্বস্তি বোধ করল। শেষে কাউন্টারে এসে স্বাভাবিক আঞ্চলিক টানে বলল, 'আমার চেকটা যদি মেহেরবানী করে দেখতেন....'

কাউন্টার বসা লোকটা চোখ তুলে ওকে দেখল। বলল, 'চেক ম্যানেজারের রুমে। আপনি বসেন।'

জাফরের অস্বস্তি আরো বেড়ে গেল। একটু পরে ঘন্টা টিপে ম্যানেজার পিয়ন ডাকল। পিয়ন ম্যানেজারের রুম থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'সাতাশ নম্বর টোকেন আপনার না? ম্যানেজার সাহেব ডাকছেন।'

একরাশ অস্বস্তি নিয়ে ম্যানেজারের কামরায় ঢুকল জাফর। রমিজ হাজী তখন উঠে দাঁড়িয়েছে— 'যাই ম্যানেজার সাব। জোহরের ওক্ত হইছে।'

জাফরের কাছাকাছি বয়সের ছোকরা মতো ম্যানেজার ওকে ইশারায় বসতে বলল।

ম্যানেজারের হাতেই ধরা ছিলো চেকটা। পাশে হিসেব রাখার মোটা খাতা। জাফরকে ম্যানেজার সরাসরি প্রশ্ন করলো, 'এই চেক কে দিয়েছে?'

জাফরের বেশভুষা দেখে ম্যানেজার তাকে 'আপনি' না 'তুমি' বলবে ঠিক করতে পারল না।

জাফর আগের মতো আঞ্চলিক টানে বলল, 'নাম তো লেখাই আছে। একজন মেয়েছেলে কাল সন্ধ্যায় আমার দোকানে কাপড় কিনতে এসেছিলেন। তিনিই দিয়েছেন।'

'কি কাপড় কিনেছেন তিনি?' ম্যানেজার জেরা শুরু করল।

অস্বস্তি আর উত্তেজনা দমন করে জাফর বলল, 'তিনটা শাড়ি, একটা চাদর আর বাচ্চাদের কাপড়।'

'নগদ টাকার বদলে চেক নিলে কেন?'

'তিনি কেনার আগেই বলেছিলেন চেক দেবেন।'

'তুমি কি করে জানো ব্যাঙ্কে তার টাকা আছে?'

জাফর একটু বিরক্ত হওয়ার ভান করে বলল— 'আমরা বেশি লেখাপড়া জানি না। আগে আরও অনেকের এরকম চেক ভাঙ্গিয়েছি। ব্যাঙ্কে টাকা থাকলেই চেক থাকে।'

চাবির রিঙটা আঙ্গুলে ঘোরাতে ঘোরাতে ম্যানেজার বলল, 'টাকা না থাকলেও চেক থাকতে পারে।'

জাফর জানে টাকা না থাকলে পূরবী কখনও চেক দিত না। ও বুঝতে পারল, ম্যানেজারের কাছে পূরবীর পরিচয় অজানা নয়। তবু যথাসাধ্য স্বাভাবিক গলায় বলল, 'তাহলে টাকাটা দিয়ে দেন, নামাজের সময় হয়ে গেছে।'

ম্যানেজার শান্তভাবে বলল, 'বসেন, টাকা এখন দেয়া যাবে না। ইনি একজন ফেরারী আসামী। এর একাউন্ট গভমেন্ট সিল করে দিয়েছে।'

জাফর ঢোক গিলে বলল, 'কি সর্বনাশ; আমার টাকাটা তাহলে মার যাবে?'

ম্যানেজার গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমি ঠিক বলতে পারছি না। থানায় খবর দিয়েছি। ওসি সাহেব এলে বলতে পারবো। বসেন, উনি এসে যাবেন।'

জাফর এবার রীতিমতো প্রমাদ গুনল। বিড়বিড় করে বলল, 'আমার পাওনা টাকা ক্যাশমেমোতেও চেকের নম্বর লিখে রেখেছি।'

'টাকা দিতে আমার আপত্তি নেই। শুধু দারোগার মত নেয়া দরকার। তার এ্যাকাউন্টে টাকাও আছে। দোকান কোথায় আপনার?'

নির্লিপ্তভাবে জাফর বলল, 'গঞ্জের হাটে।'

বাইরে আজানের শব্দ শোনা গেল। জাফর একটু উশখুশ করে বলল, 'দারোগা সাহেব কখন আসেন কে জানে। ওনার জন্য নামাজ কাজা করবো নাকি?'

ম্যানেজার এবার সামান্য বিব্রতবোধ করল। 'উনি থানায় নেই। ডিউটি অফিসার বলেছেন, আধঘন্টার মধ্যে ফিরবেন, আর ফিরলেই পাঠিয়ে দেবেন।' একটু থেমে কি যেন ভাবল ম্যানেজার। তারপর বলল, 'আপনি বরং নামাজ পড়েই আসুন, টাকা যাতে মার না যায় আমি দেখবো। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে মহিলা শহরের কোথাও

আছে।'

গম্ভীর মুখে জাফর ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে এল। দারোগা আসার আগেই ওকে এ শহর ছেড়ে পালাতে হবে। দু'বছর আগের দারোগাটি যদি এখনও থাকে তাহলে বাঁচার কোনো পথই নেই। কালো হাতি দারোগা শুধু নিজের হাতে পিটিয়ে ওদের কয়েকজন কৃষক কর্মীকে মেরে ফেলেছে। ওর পাল্লায় পড়লে পকেটের পিস্তলও কোনো কাজে আসবে না।

আড় চোখে জাফর একবার পেছনে তাকাল। যা ভেবেছিল— ব্যাঙ্কের বুড়ো পিয়নটা হন্তদন্ত হয়ে ওর পেছনে আসছে। সদর রাস্তা ছেড়ে একটা আঁকাবাঁকা গলিতে ঢুকে সোজা দৌড় দিল।

গলিতে লোক চলাচল খুব কম। দু'টো গলি পেরিয়ে জাফর দেখল— বুড়ো খসে পড়েছে, তখন চলার গতি কিছুটা কমাল। আর ঠিক তখনই রমিজ হাজীকে দেখতে পেলো। উল্টো দিকে থেকে হেলে দুলে ওর দিকেই আসছে। আশেপাশে কোন লোকজন না দেখে জাফর মুহূর্তের ভেতর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। ব্যাগটা রমিজ হাজী বুকের কাছে আকঁড়ে ধরেছে। নির্বিকার মুখে কাছে গিয়ে ওর বুকের উপর পিস্তল ধরল। চাপা গলায় বলল, 'একটা কথা বললে বুকটা ফুটো করে দেবো। টাকাগুলো দাও।'

মুখটা হা হয়ে গেল রমিজ হাজীর। হাত দু'টো এত কাঁপছিল যে ব্যাগের চেন টেনে খুলতে পারছিল না। ব্যাগটা ছিনিয়ে নিয়ে টাকগুলো বের করল জাফর। তারপর সেটা আবার হাজীর বগলে গুঁজে দিল। ঠিক সেই মুহূর্তে চিৎকার করতে যাচ্ছিল রমিজ হাজী। ঘাড়ের উপর শক্ত হাতে এক ঘা বসাতেই লোকটা নিঃশব্দে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ল।

পেছনে নীল ইউনিফর্ম পরা পিয়নটাকে দেখে জাফর আবার দৌড় দিল। যেভাবেই হোক এলাকা ছেড়ে পালাতে হবে। বড় রাস্তায় বেরোতেই পুলিশের জিপটা ওর নাকের ডগা দিয়ে ছুটে গেল। ভেতরে বসা ইউনিফর্ম পরা লোকটাকে চিনতে ওর এতটুকু ভুর হয়নি। ঘোর কালো বিশাল বপু এই লোকটাকেই মিলের মজুররা কালো হাতি দারোগা বলে।

স্টেশনে জামতলির দিকে মুখ করে একটা ট্রেন দাঁড়িয়েছিল। একজন কুলি জানাল—এটা মেল ট্রেন, জামতলি থামবে না। জাফর পরের স্টেশনের একটা টিকেট কিনে নোট ভাঙাল। ট্রেন ছাড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে একটা থার্ড ক্লাসের কামরায় উঠল।

একশ টাকার নোটগুলো কোমরে গুঁজে নিয়েছে জাফর। খুচরোগুলো পাঞ্জাবির পকেটে। ট্রেনে বসে ফেরীঅলাদের কাছ থেকে কয়েকটা পাউরুটি, কলা আর মোমবাতি কিনল। রাজুর রান্নার কথা ভেবে মনে মনে হাসল। আপাতত কলা পাউরুটি খেয়েই দিন কাটাতে হবে।

জাফর ভেবেছিল জামতলী পেরোলে চেন টেনে নেমে পড়বে। এদিকে অনেকে বাড়ির কাছে এসে চেন টেনে নির্বিবাদে নেমে পড়ে। জামতলি আসার একটু আগেই কয়েকবার হুইসেল বাজিয়ে ট্রেনটা থেমে গেল। কয়েকজন যাত্রী ঝটপট করে দু'পাশে

নেমে পড়ল। একজন বিরক্ত হয়ে জাফরকে বলল, 'রোজ যেন এরা খেলা পেয়েছে।' আরেকজন বলল, 'জানেন না তো , ড্রাইভারের সঙ্গে এদের চুক্তি আছে।' ওদের দু'জনকে অবাক করে দিয়ে জাফরও ধীরে সুস্থে ট্রেন থেকে নেমে পড়ল। ততক্ষণে ট্রেন আবার চলা শুরু করেছে।

থানা থেকে জামতলির টিকটিকিদের সতর্ক করে দেয়া হতে পারে-এই ভেবে জাফর শালবনের দিকে দৌড়াতে শুরু করল।

শেষ বিকেলে জাফর ক্লান্ত শরীরটা নিয়ে যখন ঝর্ণার তীরে শাল গাছের নিচে এল, তখন ওর দাঁড়াবার শক্তিটুকুও ছিল না। পুরবী ছুটে এসে বলল, 'চোখ-মুখ এতো শুকনো কেন জাফর? দুপুরে কিছু খাওনি?'

'খেয়েছি। এখন একটু পানি খাওয়াও।' জাফর ক্লান্ত গলায় বলল, 'তোমাদের খাবার গামছার ভেতরে। কালো হাতি দারোগার জন্য রাজুর ফিস্ট খাওয়া হল না।'

রাজু চমকে উঠল—'সে কি! পুলিশ টের পেলো কিভাবে?'

ঝর্ণা থেকে বাটিতে করে পানি আনল পূরবী। ঢক ঢক করে পুরো এক বাটি পানি খেয়ে জাফর হাঁপ ছাড়ল। দুপুরে দুটো কলা ছাড়া আর কিছুই খায়নি। ওরা তিনজন চোখে একরাশ প্রশ্ন আর উদ্বেগ নিয়ে জাফরের মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

ব্যাঙ্কে যাওয়ার পর থেকে যা যা ঘটেছিল সব ওদের এক এক করে বলল জাফর। তারপর টাকাগুলো বের করে পূরবীর হাতে দিল। দীপু হেসে জাফরের পিঠ চাপড়ে দিল— 'দারুন এ্যাকশন করে এসেছো। সোসো একবার এরকম এ্যাকশন করেছিল।'

পূরবী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে দীপুর দিকে তাকাল। দীপু নিরীহভাবে বলল, 'সোসো মানে কমরেড স্টালিন।'

ওর কথার ভঙ্গিতে সবাই একসঙ্গে হেসে উঠল। দীপু বলল, 'হাজীটা মরে গেছে নাকি জাফর?'

জাফর মাথা নাড়ল— 'বল কি, এত সহজে ও মরবে! আমরা ওকে বেড়ালের জান বলতাম।'

পূরবী বলল, 'আমি কী বোকা! ওখানে সবাই আমাকে চেনে। এ্যাকাউন্ট সিল করতে পারে— আমার মাথায়ই আসেনি।'

দীপু হাসতে হাসতে বলল, 'তোমার বোকামি প্লাস জাফরের বুদ্ধি, ইজ ইকোয়্যাল টু পাঁচশ' টাকার বদলে আঠারো শ' পঞ্চাশ টাকা। মন্দ কি!'

পূরবী একটু গম্ভীর হয়ে বলল, 'জাফরের বিপদ হতে পারত।'

জাফর হাসল— 'বিপদ আমাদের নিত্যসঙ্গী। বরং রমিজ হাজীকে মেরে বিপ্লবেরও খানিকটা সহায়তা করেছি। বেশ একটা এ্যাডভেঞ্চারের মতো মনে হচ্ছে।'

পূরবী গম্ভীর হয়ে বলল, 'বিপ্লব আর এ্যাডভেঞ্চার এক জিনিস নয়। অরুণ ব্যাংক লুট করতে গিয়ে মারা গিয়েছিল।'

পূরবীর কথায় জাফর একটু অপ্রস্তুত বোধ করল। দীপুর মুখ থেকে হাসি মুছে গেল। অরুণের কথা মনে পড়ল। অরুণের কাছে সব কিছু ছিল এ্যাডভেঞ্চারের মতো। রাজু গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসেছিল। পূরবীকে বলল, 'তুমি ওদের কথা বলে মন

খারাপ করে দিলে পূরবী। যাও এবার চা বানিয়ে খাওয়াও। জাফরের মুখ দেখলেই বোঝা যায় ও কিছু খায় নি।'

জাফর অপ্রতিভ হয়ে হাসার চেষ্টা করল-- 'তোমরাও তো খাও নি।'

কলা আর রুটি খেতে খেতে রাজু বলল, 'অরুণের কথা মনে হলে ভীষণ খারাপ লাগে। ওর মায়ের অবস্থা তো তোমরা জানো। আমি ভাবছি এখান থেকে কিছু টাকা ওর মাকে পাঠিয়ে দেবো।'

জাফর সায় জানাল, 'আমিও ভাবছিলাম, অরুণ আর জমিরের মাকে কিছু টাকা পাঠানো দরকার।'

দীপু বলল, 'মারা যাওয়ার সময় অরুণ বলেছিল— 'কমরেড আমার মাকে তোমরা চিঠি লিখে খবর নিও, মাকে আমি বলেছিলাম তোমার এক ছেলে মরলে হাজার ছেলে পাবে।'

রাজু, দীপু আর জাফরের কথা শুনে পূরবীর বুকটা ভরে গেল। শহীদ কমরেডদের সে শুধু একাই মনে রাখেনি। চোখ দুটো ছলছল করে উঠল নিহত সহযোদ্ধাদের কথা মনে করে। আশ্চর্য রকম উজ্জ্বল আর প্রাণবন্ত ছেলে ছিল অরুণ। জমিরের মৃত্যুর পর অরুণ খুব বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। জমিরের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব ছিলো পার্টিতে আসার আগে থেকেই। সবাই ওদের মানিকজোড় ডাকতো।

রাজু বলল, 'কি ভাবছো পূরবী? তুমি কি ভেবেছিলে শহীদ কমরেডদের আমরা ভুলে যাবো? ওদের কথা এখন আরও বেশি করে মনে পড়ছে। আমি জানি জাফর আর দীপুও তাই ভাবে।'

জাফর প্রসঙ্গ পাল্টাতে চাইল— 'কখন যাবে কিছু ভেবেছো রাজু?'

রাজু মাথা নেড়ে সায় জানাল— 'আজ রাতে কিছুটা পথ এগিয়ে থাকবো। ফরেস্টের রিজার্ভ এলাকাটা রাতেই পেরোতে হবে। আজকাল এদিকে পুলিশও চৌকি দিতে শুরু করেছে। আমরা জামতলির তিন চারটা স্টেশন পরে গিয়ে ট্রেন ধরবো।'

আগুন ধরাতে গিয়ে চোখ-মুখ লাল করে পূরবী বলল, 'ট্রেনে যাওয়াটা আমি নিরাপদ মনে করি না।'

জাফর কৃত্রিম বিস্ময়ে বলল, 'হিমছড়ি পর্যন্ত তুমি হেঁটে যেতে চাও নাকি কমরেড পূরবী? তাহলে আমাকে খরচের খাতায় লিখে রাখো।'

দীপু হাসল—'ধরে নাও এটা মিনি লং মার্চ। আসল লং মার্চে তো ছ'হাজার মাইল হাঁটতে হয়েছিল।'

পূরবী মৃদু হেসে বলল, 'জাফরকে আমি ভয় দেখাতে চাই না। তবে বেশ কিছুটা পথ হাঁটার জন্য আমাদের তৈরি থাকতে হবে।'

জাফর বলল, 'অতটা ফালতু ভেবো না আমাকে। আজ যে ম্যারাথন দৌড় দিয়েছিলাম দেখলে বুঝতে।'

দীপু মীমাংসার ভঙ্গিতে বলল, 'ঠিক আছে কমরেড। হাঁটতে যখন অসুবিধে হবে, তখন শুধু একটা কালো হাতির কথা মনে কোরো।'

তিনজন একসঙ্গে হেসে উঠল। রাজুও মৃদু হাসছিল। ওদের হাসির শব্দে এক ঝাঁক

সবুজ টিয়া বনের ভেতর থেকে শিষ দিতে দিতে আকাশের দিকে উড়ে গেল। পূরবী মনে মনে ভাবল, এভাবেই হাসতে হবে আমাদের। নইলে হারিয়ে যাবো। দীপুকে স্বাভাবিক দেখে রাজুও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

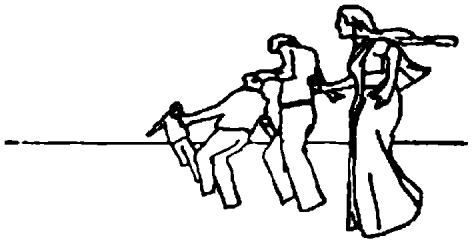

খাওয়ার পর বাক্স পোটলা গুছিয়ে ওরা আবার শালবনের ভেতর দিয়ে হাঁটতে লাগল। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে তখন কুয়াশা ভেজা জ্যোৎস্না এক অলৌকিক ঝর্ণার মতো বনের ভেতর ছড়িয়ে পড়েছে। ঝিঁ ঝিঁ পোকার একটানা শব্দ আর মাঝে মাঝে একটা দুটো রাত জাগা পাখির ডাক ছাড়া কোথাও কোন শব্দ নেই। লোকালয় এখান থেকে অনেক দূরে। রাজু আর পূরবী নিচু গলায় কথা বলছে। জাফর আবার স্বপ্নের জগতে সমর্পিত হয়েছে। দীপু দেখছে ভবিষ্যতের স্বপ্ন— চারজন চার লক্ষ হয়ে সমুদ্রের মতো বিশাল এক লং মার্চে অংশ নিয়েছে, হাজার হাজার গ্রাম থেকে মিছিল চলেছে শহরের দিকে, কারো কোন আলাদা অস্তিত্ব নেই। অস্তিত্বহীন এক দীপু সেই মিছিলের সঙ্গে এগিয়ে চলে।

ঝর্ণা আর বিল পেরিয়ে ওরা চাঁদের আলোয় একটানা হেঁটে চলল। দূরে মাঝে মাঝে বন বিভাগের টহলদারদের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। এক সময় টহলদারদের আওয়াজ আর কানে এল না। রাজু বলল, 'আমরা রিজার্ভ এরিয়া পেরিয়ে এসেছি।'

চাঁদ তখন পশ্চিমের আকাশে হেলে পড়েছে। আরও ভারি হয়ে পড়ছে কুয়াশা। জাফর বলল, 'একটু বসি রাজু। আর পারছি না।'

রাজু বলল, 'এবার বসা যেতে পারে। আমি রিজার্ভ এরিয়া পার হওয়ার জন্য এতক্ষণ থামতে বলিনি।'

জাফর একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসে বলল, 'ক মাইল হেঁটেছি বল তো রাজু?'

রাজু বলল, 'বার তের মাইলের বেশি হবে না।'

দীপু জাফরের দিকে তাকিয়ে হাসল— 'এতোই কাত হয়ে গেলে কমরেড! লং মার্চে তোমার যে কি গতি হবে!'

পূরবীও হাসল— 'তুমি তখন থেকে ওকে খোঁচাচ্ছ দীপু। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জাফরের ওপর কম ধকল যায়নি।'

জাফর চোখ বুঁজে শুয়েছিল। শুয়ে শুয়েই বলল, 'চালিয়ে যাও পূরবী। তুমি না থাকলে আমার যে কি হবে ভেবে পাই না।'

দীপু মুখ টিপে হাসল। রাজু ততোক্ষণে শুকনো ডাল পাতা জড়ো করে আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা করেছে। রাজুর কাছে যাওয়ার সময় পূরবীর পায়ে একটা ভাঙা কাঁচ বিঁধে গেল। পা চেপে সঙ্গে সঙ্গে পূরবী বসে পড়ল। রাজু আগুন ধরাল। আগুনের আলোয় দেখল, কাঁচের টুকরোটা খুব ছোট নয়। জাফর বলল, 'দাঁড়াও পূরবী, আমার দু'বছর ডাক্তারি পড়ার বিদ্যেটা কাজে লাগাতে দাও।'

আগুনের কাঁপা কাঁপা আলোয় কাচের টুকরোটা সাবধানে বের করে আনল জাফর। দরদর করে রক্ত বেরোল। পূরবীর শাড়ির আঁচলের খানিকটা ছিড়ে নিপুণ হাতে ড্রেসিং করে দিল। বলল, 'ডাক্তারী বিদ্যা সব সময় কাজে লাগে।'

দীপু হেসে বলল, 'পূরবীর পদসেবার কাজে যে ভালোভাবেই লাগছে সে তো দেখতেই পাচ্ছি। আচ্ছা পূরবী, কাঁচ ভাঙাটা আগে থেকেই ওখানে ছিল নাকি!'

জাফর হেসে ধমক দিল— 'কী বলতে চাইছো দীপু? ওটা কি আমি রেখেছি?'

'আহ, আমি কি তাই বলেছি!' দীপু হাসি চাপল।

পূরবী বলল, 'পিকনিক করতে আসা কেউ বোধহয় এই অপকর্মটি করেছে।'

দীপু আবার বলল, 'ভাগ্যিস করেছিল!'

'মানে?' পূরবী ভুঁরু কুঁচকে দীপুর দিকে তাকাল।

দীপু নিরীহ গলায় বলল, 'নইলে জাফর ডাক্তারি বিদ্যে বলো কিম্বা তোমার পদসেবা বলো— করার সুযোগ পেতো কোত্থেকে?'

পূরবী শব্দ করে হাসল— 'যথেষ্ট হয়েছে দীপু। জাফরের মার খাওয়ার ব্যবস্থা করছো তুমি।' তারপর জাফরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'পদসেবা যখন করেছো এবার বাকিটুকুও করে ফেলো জাফর।'

'জো হুকুম ম্যাডাম!' জাফর তটস্থ হওয়ার ভান করল।

পূরবী হাসতে হাসতে বলল, 'তুমি তাহলে চা-টুকু বানিয়ে ফেলো। উঠতে গেলে আবার রক্ত বেরোবে।'

জাফর হাই তুলে উঠতে উঠতে দীপুকে বলল, 'এবার বুঝলে তো দীপু, কাচের টুকরোটা পূরবীই রেখেছিল, কিম্বা দেখে শুনে ওর ওপর পা তুলে দিয়েছে।'

পূরবী হেসে বলল, 'দেবো এক থাপ্পড়!'

চা খেতে খেতে রাজু দীপুকে বলল, 'তুমি সাহেবালী খতম আর হালদার হাটের অভিজ্ঞতাটা লিখে ফেলো।'

জাফর বলল, 'তুমি এখন ক্লাশ নেয়া শুরু করবে নাকি রাজু?'

রাজু হেসে বলল, 'ক্লাশ নেবো না, তবে খতম লাইনের রাজনৈতিক, সামরিক এবং সামাজিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তোমার সঙ্গে আলোচনা করে একটা আর্টিকেল লিখবো। তোমার আনা মোমবাতিটার সদগতি হওয়া দরকার। তাছাড়া পরে সময় নাও পেতে পারি।'

রাজুর জ্বালানো মোমের আলোয় পূরবী লিখল—

'তবু আমরা হতাশ হইনি। এত বিপর্যয়ের পরও আমরা হাসছি। বিপ্লবের স্বপ্ন দেখছি। একটি বিপ্লবী পার্টি গড়ার জন্যে আমাদের অবিরাম কাজ করে যেতে হবে। আমাদের

মতো হাজার হাজার বিপ্লবী রয়েছে সারা দেশে ছড়িয়ে। একদিকে ভুল নেতৃত্ব, অপরদিকে সরকারী হামলায় শত শত বিপ্লবী জীবন দিচ্ছে, কারাগারের অন্ধকারে ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর দিন গুনছে, এ অবস্থা বেশীদিন চলতে পারে না। চুয়াত্তরের বাংলাদেশ মন্বন্তরের আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলছে। গ্রামের পর গ্রাম জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। কোনোদিন হয়তো ঐতিহাসিকরা গবেষণা করবে কিভাবে এত মানুষ মারা গেল, কিন্তু আমরা যারা এই দুঃসময়ের জাতক, আমরা কি এভাবে শেষ হয়ে যাবো আত্মঘাতী হানাহানির ভেতর? এ হতে পারে না.....'

পূরবী তার সকল আনন্দ, বেদনা, ক্ষোভ আর আশার কথা ডায়রির পাতায় কালো অক্ষরের মিছিলে সাজিয়ে রাখতে লাগল। একটা বাঁধানো খাতাকে পূরবী ডায়রি বানিয়েছে। দিনে দিনে অনেক কথা জমেছে সেখানে। ফেলে আসা অতীত আছে, বর্তমান আছে, ভবিষ্যতের স্বপ্নও আছে। জাফরের মতো সেও অতীতকে ভুলতে পারে নি। ব্যতিক্রম শুধু রাজু। অতীতের সকল আকর্ষণ সে নির্মমভাবে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

গাছের তলায় কুয়াশা ঘন হয়ে জমতে থাকে। আগুনের তেজ ধীরে ধীরে কমে আসছে। পূরবী তাকিয়ে দেখল রাজু, জাফর, দীপু তিনজনই ঘুমিয়ে পড়েছে। তিনটি খদ্দরের চাদর ছাড়া ওদের গায়ে দেয়ার কিছু নেই। নভেম্বরের খোলা বাতাস হাড়ের ভেতর কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছিল।

হু হু করে শালবন কাঁপিয়ে বয়ে যাওয়া এক ঝলক ঠান্ডা উত্তুরে বাতাসে মোমের শিখাটুকু নিভে গেল। শালগাছের পাতা গলিয়ে কয়েক ফোঁটা শিশির পূরবীর গায়ে এসে পড়ল। জাফর ঘুমের ভেতর মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে কি যেন বলছিল । পূরবীর চোখের পাতা ঘুমে ভারি হয়ে এলেও ঘুমোতে পারছিল না। জীবনের প্রবহমান স্রোত যখন কোনো কারণে থমকে দাঁড়ায়, তখন স্মৃতির খড়কুটো এসে সেখানটায় জমতে থাকে। নক্ষত্রখচিত কালো আকাশের দিকে তাকিয়ে সেই নিঃসঙ্গ অসহায় মুহূর্তে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল কোনো স্বপ্ন আঁকতে ব্যর্থ হল পূরবী। এমন এক সময় কেটেছিল তার পার্টি জীবন শুরু হওয়ার আগে।

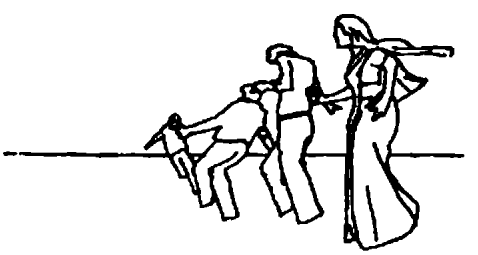

রাজুর সঙ্গে পূরবীর পরিচয় হয়েছে ছাত্র ইউনিয়ন করার সময়। দু'জনেই মেনন গ্রুপ করত। মেনন গ্রুপে তখন দীপাদি আর নায়লার মতো হাতে গোনা ক'জন মেয়ে। পূরবীকে যে জন্যে সংগঠনের কাজে অনেক বেশি সময় দিতে হত। পূরবীর বাবা এ্যাডভোকেট রইসউদ্দিন খান মেয়ের এসব কাজ মোটেই পছন্দ করতেন না। চিরকাল মুসলিম লীগ করেছেন। সত্তুরের নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগে যোগ দিয়ে এম এন এ হয়েছিলেন। পূরবীর সঙ্গে এ্যাডভোকেট রইসউদ্দিনের বিরোধ অবশ্য অনেক আগে

থেকেই ছিল। যখন থেকে সব কিছু বিচার করার ক্ষমতা হয়েছে, তখন থেকে পূরবী ওর বাবার চরিত্রে লক্ষ্য করছে, একজন মধ্যশ্রেণীর মানুষের ওপরে ওঠার দুর্নিবার চেষ্টা। পূরবীর মা তার দ্বিতীয় স্ত্রী। প্রথম স্ত্রী মারা যাওয়ার পর একমাত্র পুত্রকে মানুষ করার জন্য তিনি বিত্তহীন পরিবার থেকে পূরবীর মাকে বিয়ে করে এনেছিলেন, যাকে তিনি কখনও স্ত্রীর মর্যাদা দেননি। অথচ প্রায় প্রতি বছর পূরবীর ভাইবোনের সংখ্যা বেড়েছে। শেষবার মা যখন মৃত সন্তান প্রসব করে মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরে এলেন, পূরবী তার বাবাকে মুখের উপর বলেছিল, 'আপনার এবার লজ্জা হওয়া উচিৎ।' সে তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ মাড়িয়েছে মাত্র।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে পূরবী অত্যন্ত সংবেদনশীল একজন বন্ধু হিসেবে রাজুকে পেয়েছিল। রাজু পূরবীর সব কথা জানত। একদিন পাবলিক লাইব্রেরির রাধাচূড়া গাছের নিচে বসে পূরবী ওকে বলেছিল, 'লোকটাকে আমি খুন করবো।'

লোকটা মানে এ্যাডভোকেট রইসউদ্দিন। রাজু মৃদু হেসে কি বলতে পূরবী রেগে গিয়েছিল, 'তুমি যতো ঠাট্টাই করো না কেন, একদিন ঠিক টের পাবে আমি যা বলি সেটা করার ক্ষমতাও রাখি। এখনো যদি বাড়ি গিয়ে শুনতে হয় ছোট ছোট ভাইবোনদের সামনে লোকটা মাকে চুলের ঝুঁটি ধরে খড়ম দিয়ে মেরেছে, তখন কি করে মাথা ঠান্ডা রাখা যায় বলো? মা'র একমাত্র অপরাধ তিনি কেন আমাকে শাসন করেন না। কেন আমি ওদের দল না করে ছোটলোকদের দল করি।'

রাজু পূরবীকে সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের কথা বলেছে, শ্রেণী সম্পর্কের ভিত্তি নির্ণয় করতে গিয়েছে, কিন্তু পিতার বিরুদ্ধে পূরবীর ক্ষোভ তাতে প্রশমিত হয়নি। মন খারাপ হলে প্রায়ই রাজুদের বাড়ি চলে যেত সে। রাজুদের বাড়ির অবস্থা ভালো না হলেও এ ধরনের উৎপাত সেখানে ছিল না। রাজুর বাবা পুরোনো ঢাকার কোনো এক ছাপাখানার হিসাব দেখতেন। ওর ছোট ভাইবোন ছিল দু'টো। ওরা তখন স্কুলে নিচের ক্লাশে পড়ে। পূরবী মনে মনে হিসাব করল রাজুর ছোট ভাই খোকনের এবার ইন্টারমিডিয়েট দেয়ার কথা, আর রোকেয়ার উচিৎ ক্লাশ টেনে পড়া, যদি ওদের পড়াশোনার কোনো ব্যাঘাত না ঘটে। রাজুর মা পূরবীকে খুবই পছন্দ করতেন।

পুরোনো ঢাকার নবরায় লেনের অনেক দিনের পুরোনো শ্যাওলা ধরা একতলা বাড়িতে ভাড়া থাকত রাজুরা। ছোট ছোট তিনটা ঘর আর এক চিলতে উঠোন গভীর প্রশান্তিতে ভরা থাকত। কোনোদিন পড়ন্ত বিকেলে গায়ে অসম্ভব ক্লান্তি জড়িয়ে পূরবী যদি সেই বাড়িতে যেতো, রাজুর মা দু'টো নারকেলের নাড়ু আর একবাটি মুড়ি ওর সামনে ধরতেন। বলতেন, 'হাত মুখ ধুয়ে মুড়িটা মুখে দাও মেয়ে, আমি চা করে আনি।' নিজের বাড়িতে এভাবে কেউ পূরবীকে খেতে বলে না। ওর মা সব সময় বাবার ভয়ে সিঁটিয়ে থাকেন। খাবার কখনও টেবিলে ঢাকা থাকত, নয় ফ্রিজ খুলে খেতে হত।

রাজুর মা দরিদ্র হলেও যথেষ্ট আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। পূরবীকে নিয়ে গোপনে একটি স্বপ্ন লালন করলেও কোনোদিন নিজের ইচ্ছার কথা প্রকাশ করেননি। বরং পূরবী কখনও বলেছে, 'ইচ্ছে হয় ও বাড়ির সব পাট চুকিয়ে দিয়ে আপনার কাছে এসে থাকি। এলে থাকতে দেবেন তো খালাম্মা?'

রাজুর মা কোন কথা না বলে শুধু মৃদু হেসে পূরবীর মাথাটা বুকে চেপে ধরতেন। পূরবী রাজুকেও বলত, 'তুমি দেখে নিও রাজু, একদিন ঠিকই তোমার কাছে চলে আসবো। লোকটাকে খুন করে কোথাও গিয়ে তো উঠতে হবে।'

রাজু ওর মায়ের স্বভাব পেয়েছে। পূরবীর এ ধরনের কথার কোন জবাব না দিয়ে সে-ও মৃদু হেসে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছে।

নিজেদের বাড়িতে পূরবী যে ক'দিন ছিল, অচেনা উদ্বাস্তুর জীবন যাপন করেছে। রাতে ঘুমোবার সময় ছাড়া সচরাচর বাড়ি থাকেনি। সকালে কিছু খাবার মুখে গুঁজে বেরিয়ে পড়েছে। ক্লাশের ফাঁকে পত্রিকা অফিসে ঘুরেছে ফিচার জাতীয় কিছু লিখে হাত খরচের টাকা জোগাড়ের জন্য, বাকি সময় ছাত্র ইউনিয়েনের কাজ। কখনও মিটিংয়ের আয়োজন করা, কখনও সংস্কৃতি সংসদের কোনো অনুষ্ঠানের রিহার্সেল করা, কখনও সংকলনের জন্য বিজ্ঞাপন যোগাড় করা— কাজের অন্ত ছিল না আটষট্টি উনসত্তুরের সেই দিনগুলোতে। সুন্দর গানের গলা ছিল পূরবীর। রোকেয়া হলের বার্ষিক নাটকেও অভিনয় করেছে। এ সব কাজে বেশির ভাগ সময় সঙ্গী হিসেবে রাজুকে পেয়েছে।

যেদিন বাড়ির সঙ্গে চরম বোঝাপড়া হয়ে গেল, সেদিন পূরবী সবার আগে রাজুর কাছেই এসেছিল। সকালে ক্লাশে যাওয়ার সময় পূরবী শুনল বাবা মাকে চিৎকার করে বলছেন, 'সব আমার কানে আসে। তোর মেয়েকে তুই যদি সামলাতে না পারিস, আমার ছেলেদের বলবো ওকে শায়েস্তা করতে। আমার মেয়ে বলে এতদিন কেউ কিছু বলেনি।' মা যেন অস্ফুট গলায় কি বলেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে চড় মারার শব্দ শুনল— 'চোপ! ফের মুখে মুখে কথা!'

নিচের ঠোঁটটা পূরবী এত জোরে কামড়ে ধরেছিল যে, একটু পরে জিভে নোনতা স্বাদ পেল। হাতের বইগুলো টেবিলে ছুঁড়ে শক্ত পায়ে এসে বাবার সামনে দাঁড়াল। এ্যাডভোকেট রইসউদ্দিনের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'যা বলার আমাকে বলুন। আপনার ছেলেদের চিনতে কারো বাকি আছে! এন এস এফ-কে কিছু করার মুরোদ নেই বলে আমাদের পেছনে লাগতে হবে— এইতো আপনার ছেলেদের কাজ। বাইরে কিছু করার ক্ষমতা নেই— বাড়িতে স্ত্রীর গায়ে হাত তুলে বীরত্ব দেখানো— এটাই আপনার রাজনীতি। সাহস থাকলে মাঠে আসুন।'

পূরবীর মা কান্না ভুলে চিৎকার করে উঠলেন— 'এসব তুই কি বলছিস রিনি? তোর কি মাথা ঠিক নেই? বাপের সঙ্গে কেউ এভাবে কথা বলে?'

মার দিকে না তাকিয়ে পূরবী আগের মতো কঠিন গলায় বলল, 'কেউ কিছু বলে না বলে তোমার আজ এই দশা মা। তুমি খুব ভালো করেই জানো আমার বাপ হওয়ার যোগ্যতা তার নেই।'

রইসউদ্দিন আসলে নিজের মেয়েকে ভয়ই করতেন ওর সঙ্গে কমিউনিস্ট ছোঁড়াদের ওঠাবসার জন্য। এদের কোনো গুরু-লঘু জ্ঞান নেই, যাকে তাকে যা খুশি বলে দেয়। কিন্তু সেদিন তিনি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, 'তোর মতো নচ্ছার মেয়ের বাপ কেন আমি হতে যাবো! বেরিয়ে যা কোন বাপের কাছে যাবি। আমার বাড়িতে কোনদিন যেন তোর চেহারা না দেখি।'

পূরবী সেদিন একবস্ত্রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা রাজুদের বাসায় এসে বলেছিল, 'সব সম্পর্ক মিটিয়ে দিয়ে চিরদিনের মতো চলে এলাম। এখন আমার সব ভার তোমার ওপর।'

রাজু শুধু বলেছে, 'ভয় পাচ্ছো কেন, পার্টিতো আছে। আমি জানতাম একদিন তুমি এভাবেই আসবে।'

বাড়ি ছেড়ে আসার পর পূরবী ভেবেছিল একটা চাকরি যোগাড় করে নেবে। শোনার সঙ্গে সঙ্গে রাজু বাতিল করে দিয়েছে। বলেছে, 'তোমাকে আরো দরকারী কাজ করতে হবে। এমন কিছু কাজ আছে আমাদের, যা কেবল তুমিই করতে পারো।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে, বটতলার মিটিঙে, মধুর ক্যান্টিনের কর্মীসভায় রাজুর তখনকার ধারাল, ব্যক্তিত্বপূর্ণ অবয়ব, সদাচঞ্চল গতি এখনো পূরবীর চোখের সামনে ভাসে। রাজুর সেদিনকার কথা শুনে নিজেকে ঈশ্বরের মতো শক্তিমান মনে হয়েছিল।

রাজুর কাছে কোনদিন নিজের মর্যাদা এতটুকু ছোট করেনি পূরবী। একবার এক দুর্বল মুহূর্তে শুধু বলেছিল, 'রাজু কাজের ভেতর দিয়ে আমরা দূরে সরে যাচ্ছি নাতো?' রাজু উত্তর দিয়েছে, 'কাজের ভেতর দিয়ে আমাদের পরিচয়। কাজই আমাদের বন্ধন। কাজের ভেতর দিয়েই আমরা একে অপরকে আরো বেশি জানতে পারবো।'

নিজেকে কাজের ভেতর আকণ্ঠ ডুবিয়ে দিয়ে অনেক কিছুই জেনেছে পূরবী। একজন রাজুকে অবলম্বন করে বেঁচে থাকার ক্ষুদ্র গন্ডি অতিক্রম করতে রাজুই তাকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে। তবু পূরবীর এমন কিছু কথা থাকত, যা রাজুকে ছাড়া আর কাউকে বলতে পারত না। পূরবীর বাবার সামাজিক অবস্থান নিয়ে কেউ কেউ ওকে উপহাস করত শৌখিন বিপ্লবী বলে। বলত, এ রকম অনেক দেখছি। কদিন পরে জাঁদরেল এক সিভিল সার্ভেন্ট বিয়ে করে নাসরীন সুলতানা বিপ্লবী ঠ্যাঙানোর নীল নকশা আঁকতে সাহায্য করবে। বাবার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা পূরবী তখন রাজুকে ছাড়া আর কাউকে বলতে পারেনি। অবশ্য গত চার বছর আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকার সময় পার্টির অনেকে সেটা জেনেছে।

আন্ডারগ্রাউন্ডে আসার প্রথম দিকে পূরবীকে যথেষ্ট কষ্ট পেতে হয়েছে। থাকা বা খাওয়ার সামান্যতায় সে কখনও বিচলিত হয়নি কিন্তু সহযোদ্ধাদের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গিয়ে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। অনেক বিষয়ে পার্টি কর্মীদের নাক গলানো পূরবী সহজে মেনে নিতে পারেনি। নিজেকে কিছুটা গুটিয়ে রাখতে গিয়ে কারণে অকারণে সমালোচনা শুনতে হয়েছে। দুঃখে হতাশায় কখনও ভেঙে পড়েছে। তখনও রাজুই ছিলো সবচেয়ে বড় অবলম্বন। রাজু বলতো, 'পার্টিতে আসার সঙ্গে সঙ্গে সবাই ফেরেশতা হয়ে যায় না। আমরা যে সমাজে বাস করি, যে পরিবেশ থেকে পার্টিতে আসি সেই সমাজ আর পরিবেশের বহু আবর্জনা সঙ্গে নিয়েই পার্টিতে আসি। পার্টিতে তার প্রতিফলন থাকাটাই স্বাভাবিক। তুমি নিজেকে গুটিয়ে রেখে বরং দূরত্ব বাড়াচ্ছো। কর্মীদের সঙ্গে সহজভাবে মেশো। চেতনার স্তর যত নিচেই থাক না কেন কাউকে ছোট ভাবতে যেও না। কারণ বিপ্লবের কষ্টিপাথরে শেষ পর্যন্ত হয়তো সেই টিকে যাবে, তুমি, আমি বাতিলও হয়ে যেতে পারি। নিজের দুঃখ বেদনাকে সবার সাথে মিশিয়ে দিতে না

পারলে যন্ত্রণা বরং বাড়বে।'

রাজুর সেই কথাগুলো জীবনের প্রতি বিশ্বাসের প্রতীক হয়ে পূরবীর অনুভূতির গভীরতম তন্ত্রীতে গাঁথা হয়ে গেছে। এখন রাজু পূরবীর একজন বিশ্বাসী বন্ধুর চেয়ে বেশি কিছু নয়। ধীরে ধীরে অন্যদের সুখ দুঃখের অংশীদার হতে গিয়ে নিজস্ব দুঃখ-বেদনার একান্ত অনুভূতি কখন যে সবার ভেতর বিলীন হয়ে গেছে পূরবী টেরও পায়নি। অন্য কর্মীদের সঙ্গে এক বিছানায় ঘুমোতে হলে, এক থালায় খেতে হলে কিম্বা একজনের কাপড় আরেকজন পরলে পূরবীর মনে কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না। এমনকি জাফর যখন অন্যদের সামনে খোলাখুলি বলে ও পূরবীকে বিয়ে করবে তখনও পূরবী হাসে। মাঝে মাঝে সে-ও ঠাট্টা করে বলে, 'কেন্দ্রীয় কমিটিতে যাওয়ার আগে তোমার প্রস্তাব বিবেচনা করতে পারছি না।'

পূরবী জানে জাফর ওর প্রতি যথেষ্ট অনুরক্ত। দীপু আন্ডারগ্রাউন্ডে আসার পর ওর সঙ্গেও চমৎকার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। যাদের সঙ্গে ওকে কাজ করতে হয়েছে তাদের সবাইকে আপন করে নেয়ার চেষ্টা করেছে। সবাইকে সমানভাবে না পারলেও পরিচিত কমরেডদের মৃত্যু অথবা গ্রেফতারের সংবাদে পূরবী সবচেয়ে বেশি বিচলিত হয়েছে। তবু রাজুর জন্য এখনও পূরবীর মনে একটি নরম কোন রয়ে গেছে, যা সে কাউকে বুঝতে দেয় না; এমনকি রাজুকেও নয়।

যেদিন রফিক ভাইকে বিয়ে করার প্রস্তাব পূরবী আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাখ্যান করল, সেদিন রাজু হাসতে হাসতে বলেছিল, 'নেতার প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলেই তো পারতে পূরবী। তুমি যখন বলছো, তোমার নিজস্ব কোন পছন্দ নেই, তখন এমন লোভনীয় প্রস্তাব ছাড়াটা তোমার উচিৎ হয়নি।' রাজুর পাশে জাফর বসেছিলো। পূরবী মৃদু হেসে জবাব দিয়েছে, 'আমাকে নিয়ে এভাবে ভাবাটা তোমার উচিৎ হচ্ছে না কমরেড। এ ধরনের ভাবনা বরং জাফরের জন্যে রেখে দাও।' জাফর ছুটে এসে পূরবীর গালে চুমু দিয়ে বলেছে, 'আমি জানতাম পূরবী, তুমি কখনও রফিকের মতো যান্ত্রিক মানুষকে বিয়ে করতে পারো না।' পূরবী তখন আবার ভুঁরু কুঁচকে বলেছে, 'আহ্ জাফর, রফিক ভাই সম্পর্কে এ ধরনের কথা বলা মোটেই ঠিক হচ্ছে না।'

জাফরের প্রগল্‌ভতা সত্ত্বেও ওর প্রতি কখনও বিরূপ মনোভাব পূরবী পোষণ করতে পারেনি। বরং এই স্বপ্নবিলাসী সম্ভাবনাময় বিপ্লবী কর্মীটিকে সে সব সময় স্নেহ মমতা দিয়ে বহু ঝড় ঝাপটা থেকে রক্ষা করেছে। একাত্তরের যুদ্ধের সময় কেন্দ্রের সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করে জাফর যখন পাকিস্তানী সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই করার কথা বলেছিল তখন জেলা কমিটি ওকে পার্টি থেকে সাসপেন্ড করেছিল ভারতের দালাল বলে। জাফর ওর ছোট গ্রুপ নিয়ে সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল পার্টি থেকে। কেন্দ্রের নেতারা তখন পাকিস্তানী অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে ভারত থেকে আসা মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়ার কথা বলছিলেন। ডিসেম্বরে পাকবাহিনীর আত্মসমর্পনের পর জাফরই জেলার গোটা পার্টিকে নিয়ে রাজুদের কাছে রাজশাহী চলে গিয়েছিল। নইলে ভারতীয় বাহিনী বা মুক্তিবাহিনী কারো হাতেই রক্ষা ছিল না। সেই সময় পূরবী একা জাফরের পক্ষ হয়ে জেলার নেতাদের সঙ্গে তর্ক করেছে, বোঝাবার চেষ্টা করেছে। তখন থেকেই

জাফরের জন্য ওর মনে আলাদা অনুভূতি রয়েছে।

অন্ধকার শালবনে খোলা আকাশের নিচে কুয়াশার সমুদ্রে ডুবে গিয়ে পূরবী তন্দ্রার ঘোরে ফেলে আসা দিনের ছবি দেখছিল। কিছু ছবি জ্বলজ্বল করছে, কিছু ঝাপসা হয়ে গেছে। দূরে ফেউয়ের ডাক শুনে পূরবী চমকে উঠে চোখ মেলে তাকাল। শালগাছের ফাঁক দিয়ে নক্ষত্রখচিত কালো আকাশ ছাড়া অন্ধকারে কিছুই নজরে এল না। আগুনটা অনেকক্ষণ আগেই নিভে গেছে। পূরবী উঠে গিয়ে আবার আগুন ধরাল। আগুনের আঁচে হাত পা গরম করে জাফরের চাদরটা একটু টেনে গায়ে জড়িয়ে শুয়ে পড়ল। তারপর এক সময় শুকনো শালপাতায় একটা দু'টো শিশিরের ফোঁটা ঝরার শব্দ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে গেল।

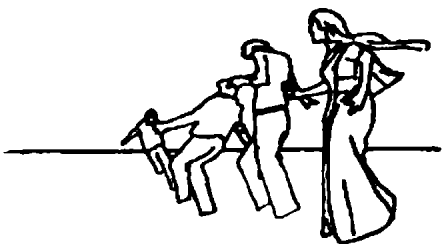

ভোর না হওয়া পর্যন্ত ওরা চারজন কুয়াশার চাদরের নিচে কুন্ডলি পাকিয়ে ঘুমিয়েছিল। সবার আগে দীপুর ঘুম ভাঙলো। ওর মনে হলো ঠাণ্ডা ভেজা একটা চাদর গায়ে দিয়ে সারারাত ঘুমিয়েছে। উঠে গিয়ে আগুন ধরাল। পূরবী আর জাফর দু'জনে একটা চাদর ভাগাভাগি করে গায়ে দিয়েছে। দু'জনের কারো শরীরই সেই চাদরে ঢাকা পড়েনি। পূরবী গায়ে আঁচল জড়িয়ে শীতে কুঁকড়ে রয়েছে। নিজের গায়ের চাদরটা দিয়ে পূরবীকে ঢেকে দিল দীপু। একটু পরে রাজু উঠে ঝরণা থেকে মুখ ধুয়ে এসে চায়ের পানি গরম করতে বসল।

সূর্য ওঠার পর আবার ওদের যাত্রা শুরু হল, শালবনের ভেতর দিয়ে। সারাদিন ওরা শালবনের ভেতর হাঁটল। রাতে বিশ্রাম নিয়ে পরদিন আবার সেই ক্লান্তিকর যাত্রা। পুরো দু'দিন হেঁটে শালবনের ধারে ছোট্ট রেল স্টেশন কেওড়াতলিতে এল। এখনও সেখানে বৈদ্যুতিক আলো পৌঁছোয়নি। চব্বিশ ঘন্টায় তিনটা লোকাল ট্রেন থামে।

ট্রেন আসার বেশ কিছুক্ষণ আগে থেকে পোশাক পাল্টে জাফর আর পূরবী একজোড়া সম্পন্ন কৃষক দম্পতির মতো প্ল্যাটফর্মে গিয়ে বসেছিল। ট্রেন ছাড়ার অল্প আগে এল রাজু আর দীপু। কেউ কাউকে চেনে না— এমনভাবে পাশাপাশি দু'টো তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় গিয়ে উঠল ওরা।

কিছুক্ষণ পর ট্রেন ছাড়ল। রাজু আর দীপু দু'জন ঘুমন্ত যাত্রীর পাশে বসার জায়গা করে নিল। গত দু'দিন একটানা পথ চলার ক্লান্তিতে ওদের সারা শরীর ভেঙে পড়তে চাইছে। বসার পর চলতি ট্রেনের দুলুনিতে দু'চোখে রাজ্যের ঘুম এসে জড়ো হল। দীপু জানালায় মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। রাজু বসে বসে ঝিমোতে লাগল।

ঝিমোনোর ভেতর হঠাৎ রাজু লক্ষ্য করল দু'টো লোক অতিরিক্ত কৌতূহল নিয়ে

ওদের দেখছে। একবার চোখ তুলে সরাসরি ওদের দিকে তাকাল রাজু। পাশাপাশি বসা লোক দু'টো একটু অপ্রস্তুত হয়ে হাতে ধরা খবরের কাগজ মেলে ধরে দেখতে লাগল। রাজুর শিরদাঁড়া বেয়ে ঠান্ডা রক্তের স্রোত বয়ে গেল। লোক দু'টো যে সরকারী গোয়েন্দা এতে কোন সন্দেহ নেই। ওরা রাজুদের ভেতর সন্দেহজনক কিছু আবিষ্কার করেছে অথবা করার চেষ্টা করছে। গোয়েন্দা বিভাগে রাজুদের ছবি থাকাও বিচিত্র কিছু নয়। পুলিশ আর রক্ষীবাহিনী হন্যে হয়ে ওদের খুঁজছে। মুজিব তো '৭২ সালেই বলে দিয়েছেন, নকশালদের দেখা মাত্র গুলি করে মারতে। ভাসানী অবশ্য এক সভায় বলেছিলেন— নকশাল কারো গায়ে লেখা থাকে না। তাতে লাভ কিছু হয়নি। জাফরদের কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হলো রাজু। পরের স্টেশনে নেমে ওদের পেছনে ফেউ লাগার খবর দিতে হবে।

দীপু একবার চোখ মেলে রাজুকে দেখে ঘুম জড়ানো চোখে বলল, 'এত কি ভাবছো? একটু ঘুমিয়ে নিলেতো পারো!'

রাজু দীপুর দিকে তাকাল। ওর ক্লান্ত নিষ্পাপ চোখ দু'টো দেখে মায়া হল। টিকটিকি দুটো তখন নিবিষ্ট মনে খবরের কাগজ পড়ছে। দীপুর কানের কাছে মুখ নিয়ে রাজু ফিশফিশ করে বলল, 'যেমন আছো তেমনি শুয়ে থাকো, ঘুমিয়ো না।'

দীপু প্রশ্নভরা চোখে ওর দিকে তাকালে রাজু মৃদু হেসে ঘাড় নাড়ল। লোক দু'টো শব্দ করেই কাগজ পড়ছে। হঠাৎ খুন এবং ছিনতাইর দু'টো সংবাদ শুনে ওরা দু'জন একসঙ্গে চমকে উঠল। খবরের কাগজের নিজস্ব সংবাদদাতা দিনে দুপুরে গঞ্জের হাটের দুঃসাহসিক ছিনতাই'র খবর বেশ ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে লিখেছে। রমিজ হাজী হাসপাতালে। ব্যাংক ম্যানেজার পুরো ঘটনার এক লোমহর্ষক বিবরণ দিয়েছে। এর সঙ্গেই রয়েছে দু'দিন আগে সাহেবালী হত্যা এবং এলাকায় আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ঘোরতর অবনতির কথা। দীপু খবর শুনতে গিয়ে উত্তেজনায় উঠে বসল।

দীপুকে ইশারা করল রাজু। ও কিছুই বুঝতে পারল না। রাজু আগের মতো চাপা গলায় শুধু বলল, 'টিকটিকি।'

দীপুর চেহারাটা চোখের পলকে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। লোকটা তখনও সাহেবালী খতমের বিবরণ পড়ে চলেছে। রাজু একটা সস্তা চটি বই দীপুর হাতে দিয়ে ইশারায় পড়তে বলল।

'কি সাংঘাতিক ব্যাপার বলেন তো।' লোকটা খবরের কাগজ এক পাশে ভাঁজ করে রেখে সরাসরি রাজুর দিকে তাকাল। দীপু আড়চোখে একবার রাজুকে দেখে বই পড়ায় মন দিলো। অল্প দূরে বসা একজন প্রৌঢ় যাত্রী মন্তব্য করলেন, 'দেশ একেবারে রসাতলে গেছে। রোজ খবরের কাগজে ছিনতাই, খুন, দুর্ঘটনা লেগেই আছে। আর করছে সব বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা।'

রাজুদের পাশে দুজন বুড়ো বসেছিলেন। এতক্ষণ তাঁরা নিজেদের সুখের অতীত নিয়ে আলোচনা করছিলেন। কথা থেকে বোঝা যায় একজন কলেজের অধ্যাপক, অপরজন হোমিওপ্যাথ ডাক্তার। প্রৌঢ় ভদ্রলোকের কথা শুনে বুড়ো অধ্যাপক বললেন, 'বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা কেন এসব করছে, কারা ওদের এপথে ঠেলে দিয়েছে— খবরের

কাগজে কিন্তু সেসব পাওয়া যাবে না। কই যুদ্ধের আগে তো এসব ছিল না!'

ডাক্তার বললেন, 'দেশ স্বাধীন হলে কেউ আর গেরিলাদের চায় না। তখন ওদের বাড়তি উৎপাত মনে হয়। দেশ যারা চালায় তারাই এদের ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়। এ আর নতুন কথা কি!'

অধ্যাপক মাথা নাড়লেন, 'না, সব দেশের কথা এভাবে বলতে পারো না। রাশিয়া দেখো, চীন দেখো, ভিয়েতনাম, কিউবা দেখো— সেসব দেশে মুক্তিযোদ্ধাদের কিভাবে দেশ গড়ার কাজে লাগিয়ে ছিল। তার জন্য বেশি ইতিহাস ঘাঁটতে হবে না। মুজিবকে আমি কমিউনিস্ট হতে বলি না। মুজিব যদি সিহানুক বা ফিদেল কাস্ট্রোর মতোও হতেন তাহলেও দেশ এতটা রসাতলে যেতো না। আমাদের গোটা একটা জেনারেশনও এভাবে শেষ হয়ে যেতো না।'

দুজন বয়স্ক লোক সমানে কথা বলে যেতে লাগলেন। টিকটিকি দুটো একটু হতাশ হল। রোগা, শুকনো চেহারা, চোখে পুরু লেন্সের চশমা পরা অধ্যাপক তখন বলছিলেন— 'আজকাল তো মুজিব জোর গলায় বলতে শুরু করেছেন বিপ্লবের পর সব দেশেই লোক না খেয়ে মরেছে। সব দেশ মানে তো রাশিয়া। রাশিয়ায় দুর্ভিক্ষ হয়েছিল ঠিকই। ওদের তো আমাদের মতো ন মাসে বিপ্লব হয়নি। বছরকে বছর সেখানকার মানুষ লড়াই করেছে। রাশিয়ার দুর্ভিক্ষের সময়ের একটা ঘটনা বলি। খাদ্যের দাবিতে একদিন একদল লোক খোদ লেনিনকেই ঘেরাও করেছিল। লেনিন তখন মাত্র খেতে বসেছেন। খাবার হাতেই উঠে এলেন। বিক্ষুব্ধ জনতাকে বললেন, সারাদিনে আমার রেশন এক টুকরো কালো রুটি আর চা। তোমাদেরও আমি এতটুকু দিচ্ছি। এর বেশি যদি চাও, যারা গুদামে খাবার জমিয়ে পচাচ্ছে সেই কুলাকদের গুদাম থেকে কেড়ে নাও। ওগুলো তোমাদের খাবার। বুঝলে, এই হলো রাশিয়া আর তার নেতা লেনিন। আমাদের নেতাদের দেখো, একেকটা শুয়োরের মতো মোটা হচ্ছে, আর আপ্তবাক্য ছাড়ছে।'

খবরের কাগজের শ্রোতারা আগ্রহ নিয়ে অধ্যাপকের কথা শুনছিল। বুড়ো ডাক্তার বললেন, 'মুরুব্বিরা একটা কথা হামেশা বলতেন, আপনি আচরি পরকে শেখাও। তুমি অপরকে বলবে কৃচ্ছ্রতাসাধন করো, আর নিজে ভোগ বিলাসে দিন কাটাবে— কে তোমার কথা শুনতে যাবে বলো?'

রাজু দীপুর দিকে তাকিয়ে দেখল ও কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। টিকটিকি দুটো বুড়োদের কথায় যথেষ্ট বিরক্ত হচ্ছিল। একজন অধ্যাপককে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি স্কুলে পড়ান?'

'স্কুলে নয় বাবা, কলেজে পড়াতাম। গত বছর ছাত্রদের পরীক্ষায় নকল করতে দেইনি বলে চাকরি গেছে। ওরা সরকারী দল করতো কিনা তাই।' অধ্যাপক একটু থেমে আবার বললেন, 'দেশের যা অবস্থা ভাবছি কাজ পেলে কোথাও ঢুকে পড়বো। প্রাইমারী স্কুলেও আপত্তি নেই।'

ডাক্তার বললেন, 'দেশের কথা আর বলো না। আত্মহত্যা করলে আল্লাহ নারাজ হবেন, তাই মরার মতো বেঁচে আছি। চোখের সামনে ছেলে-মেয়েরা খেতে না পেয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরবে— আর সহ্য হয় না।'

যে টিকটিকিটা খবরের কাগজ পড়ছিলো সে সঙ্গীর মনোযোগ আকর্ষণ করে জোরে জোরে খবরের কাগজ পড়া শুরু করে দিল। কোথায় যেন একটা গরুর দুই মাথাওয়ালা বাচ্চা হয়েছে— খবরটা কিছুদূর পড়তেই বড়ো অধ্যাপক বিরক্ত হয়ে তাকে থামিয়ে দিলেন— 'এসব কাগজ আর পোড়ো না বাপু। মানুষ মরে গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে যাচ্ছে সেসব খবর লিখবে না, যতসব ছাইপাঁশ দিয়ে পাতা ভরাবে। সাংবাদিকরা পর্যন্ত করাপ্ট হয়ে গেছে।' জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে থু থু ফেলে অধ্যাপক আবার বললেন, 'আজকাল মন্ত্রীদের ছবি ছেপে কাগজঅলারা কূল পায় না। জায়গা থাকলে ছাপে কার কটা মাথা এইসব হাবিজাবি।'

ডাক্তার অপরাধীর মতো মুখ করে বললেন, 'আমার এক ছেলে পত্রিকায় কাজ করে। ও বলে, একটা সত্য খবরের জন্য একশটা কৈফিয়ৎ দিতে হয়; ওরা নিজেরাই জানে না কোনটা খবর আর কোনটা খবর নয়। বলে, ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করি, ঘাড়ে তো মাথা একটাই।' লম্বা এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডাক্তার ভুলে গেলেন, তিনি কোন প্রসঙ্গে কথা বলছিলেন।'

অধ্যাপক এবার একটু বিরক্ত হলেন— 'সবাই হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছে। পলিটিক্যাল পার্টির ভেতর ভেবেছিলাম জাসদ কিছু করবে। না, কিস্‌স্যু হবে না।'

ডাক্তার বললেন, 'যেরকম রিপ্রেশন চলছে, জাসদ বলো আর সিরাজ শিকদার বলো, সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ভাসানীকে তো হাউস এ্যারেস্ট করে রেখেছে।'

দীপু উঠে বাথরুমে গেল। টিকটিকিটা এবার রাজুকে প্রশ্ন করল— 'আপনারা কোথায় যাবেন?'

রাজু নির্লিপ্ত গলায় বলল, 'ঢাকা।'

'ঢাকাতেই থাকেন বুঝি?' লোকটা কৌতূহলী হয়ে উঠল।

রাজু মাথা নেড়ে সায় জানাল।

'আপনার বন্ধুও বুঝি ঢাকায় থাকেন? উনি আপনার বন্ধু তো?'

এবারও আগের মতো মাথা নাড়ল রাজু।

'পড়েন বুঝি?'

'না চাকরি করি।'

'কোথায় আছেন? আপনি কিছু মনে করছেন না তো?'

বিরক্তি চেপে শান্ত গলায় রাজু বলল, 'প্রাইভেট ফার্মে।'

'আমিও ঢাকায় থাকি। বুঝলেন কিনা . ' এই বলে লোকটা মহা উৎসাহে রাজুকে কি যেন বলতে যাবে, বুড়ো অধ্যাপক বিরক্ত হয়ে ওকে বাধা দিলেন— 'তুমি তো আচ্ছা লোক বাপু! কথা বলতে জানো না, তখন থেকে থুথু ছিটিয়ে আমার জামাটা নোংরা করে দিচ্ছো!'

দমে গিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে লোকটা ওর সঙ্গীর কানে কি যেন ফিশ ফিশ করে বলল। সঙ্গীটি আড়চোখে দেখল রাজুকে। দীপু বাথরুম থেকে ভেজা মুখ নিয়ে বেরিয়ে এল। ওর গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। কলের নোংরা পানিই আকণ্ঠ গিলে এসেছে। রুমালে মুখ মুছে রাজুর দিকে তাকাল। রাজু বেশ গম্ভীর। দীপু কোন

কথা না বলে নিজের জায়গায় বসে ভাঁজ করা বইটা আবার মুখের সামনে তুলে ধরল।

পরের স্টেশনে ট্রেন থামতেই মহা উৎসাহী টিকটিকিটা নেমে গেল। রাজু প্রমাদ গুণল। ও কি জাফরদের সনাক্ত করার জন্য নেমেছে, নাকি কাউকে খবর দেয়ার জন্য? দীপুকে বসতে বলে রাজুও নেমে গেল। লোকটাকে দেখল, স্টেশন মাস্টারের কামরায় ঢুকছে। রাজু জাফরকে ডেকে আড়ালে নিয়ে বলল, 'পেছনে টিকটিকি লেগেছে। তোমরা পরের স্টেশনে নেমে প্ল্যাটফর্মের উল্টোদিকে শালবনে ঢুকে যেও।'

ট্রেনের হুইসেল বাজল। রাজু কামরায় ওঠার একটু পরে টিকটিকিটাও এল। উত্তেজনায় ওর চোখ দুটো তখন চকচক করছে।

রাজু বুঝল, লোকটা এবার পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়ে এসেছে। টিকটিকির জাতটাকে ও কোনদিনই পছন্দ করতে পারেনি। ছাত্র ইউনিয়ন করার সময়— বয়স যখন কম ছিল, সুযোগ পেলেই ওদের নাজেহাল করে ছাড়ত। একবার পিটুনি খেয়ে একজন হাউমাউ কান্না— বলে, 'আমরা কুত্তার জাত, পেটের দায়ে কুত্তার চাকরি করি, এবার মাফ করে দেন'— এইসব। অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করল রাজু।

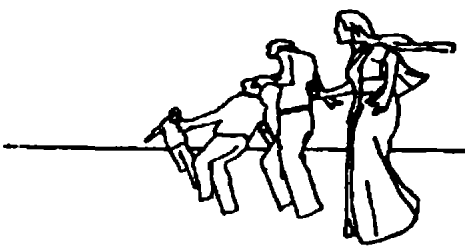

কখনও কুয়াশাজমা ন্যাড়া ধানক্ষেত, কখনও অন্ধকার শালবনের ভেতর দিয়ে প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলছিল বাহাদুরাবাদ মেল। এদিকে শালবন নতুন তৈরি করা হচ্ছে। গাছপালা বেশ ফাঁকা ফাঁকা, কিছুটা সাজানো। মাঝে মাঝে ছোট ছোট টিলা, ঝোপঝাড়, প্রাচীন কোনো গাছ।

রাজু বাইরে তাকাল। আবার ট্রেন ছাড়তে হবে, শালবনের ভেতর পালাতে হবে। ওদের ধরার জন্য বেশ বড় জালই ফেলা হয়েছে। কে জানে সেদিন ওদের খুঁজে না পেয়ে— পালিয়েছে ভেবে মানুই হয়তো বেনামে পুলিশের কাছে খবর পাঠিয়েছে। মানু জানে রাজুরা উত্তরবঙ্গে কোথাও শেল্টার পাবে না। উত্তেজিত হলে ওর বিচারবুদ্ধি সব লোপ পায়। মানুর কথা ভাবতে গিয়ে রাজুর ঠোঁটের ফাঁকে ম্লান এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল। একাত্তরে মুজিব বাহিনীর সঙ্গে ছিল মানু। বাহাত্তরের মাঝামাঝি মানুকে একজন পুরোদস্তুর ডাকাত হিসেবে আবিষ্কার করে রাজু। এক ব্যাঙ্ক ডাকাতি করতে গিয়ে ও প্রায় ধরা পড়ে গিয়েছিল। রাজুর সঙ্গে আগে সামান্য পরিচয় ছিল। সেবার রাজু ওকে না বাঁচালে নির্ঘাত পুলিশের হাতে ধরা পড়ত। সাধারণ মানুষও তখন এত ক্ষিপ্ত যে, ডাকাত ধরতে পারলে পুলিশে দিতো না, নিজেরাই পিটিয়ে মারা শুরু করে দিয়েছিল। পার্টিতে এসে অল্প সময়ের ভেতর অনেকগুলো খতম করে নিজেকে একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে।

ভাবতে না চাইলেও পুরোনো অনেক কথা রাজুর মাথায় এসে ভিড় করছিল। গভীর ক্লান্তিতে সারা শরীর ভেঙ্গে পড়তে চাইছে। জানালায় মাথা রেখে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল রাজু। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখল, প্রচন্ড এক ঝড়ের সমুদ্রে সে তলিয়ে যাচ্ছে। বহুদূরে উত্তাল সমুদ্রের ভেতর বাতিঘরের আলো। সেই বাতিঘর স্বপ্নের ভেতর আস্তে আস্তে পূরবী হয়ে গেল। পূরবীর নাম ধরে ডাকল রাজু। প্রচন্ড ঝড় আর সমুদ্রের গর্জনে সেই ডাক সে নিজেই শুনতে পেল না। আবার ডাকল। বাতিঘর সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে পূরবীও হারিয়ে যাচ্ছে। অন্ধকার সমুদ্রে রাজু আবার ডাকল— 'পূরবী'।

দীপু লক্ষ্য করল, ঘুমের ভেতর বিড়বিড় করছে রাজু। কান পেতে শুধু পূরবীর নাম শুনল। হঠাৎ ধপ করে ট্রেনের কামরায় আলো নিভে গেল। জানালা গলিয়ে কয়েক টুকরো ম্লান চাঁদের আলো এসে পড়ল কামরার ভেতর। যাত্রীদের অনেকেই তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। নিজেকে ভীষণ একা মনে হল দীপুর। আস্তে আস্তে রাজুকে ডাকল। দীপুর ভয় হচ্ছিল, স্বপ্নের ঘোরে রাজু একটা কিছু বলে হয়তো চিৎকার করে উঠবে। আর সঙ্গে সঙ্গে একদল পুলিশ ওদের ঘিরে ফেলবে। দীপু আবার ডাকল, 'রাজু, এই রাজু!'

রাজু চোখ মেলে তাকাল। আস্তে আস্তে বলল, 'অন্ধকার কেন?'

'বাতি নিভে গেছে।'

'স্টেশন এখনও আসেনি?'

'না।'

রাজু বাইরে তাকাল। একটানা শালবন ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কামরার ভেতর আবার আলো জ্বলে উঠল। দীপুকে ইশারায় কাছে ডেকে ফিশ ফিশ করে বলল, 'সামনের স্টেশনে প্ল্যাটফর্মে নেমে ট্রেনের পেছন দিক দিয়ে রেললাইন পার হবে। জাফর পূরবীকে দেখতে পাবে। ওদের সঙ্গে সোজা শালবনে ঢুকে যেও।'

দীপু কোনো কথা না বলে শুধু মাথা নেড়ে সায় জানাল। বুড়ো দু'জন মাঝে মাঝে একটা দু'টো কথা বলছিলেন। সবই ফেলে আসা অতীতের কথা। রাজু জানালায় আবার মাথা রেখে অতীতের স্মৃতি খুঁজল। টুকরো টুকরো বিবর্ণ স্মৃতি— সাজানো যায় না। ওর চোখের সামনে আকাশ থেকে একটা উল্কা খসে পড়ল। আপন মনে হাসল রাজু। ছোটবেলায় মা বলতেন, কোন সৎ লোক মারা গেলে নাকি আকাশ থেকে তারা খসে পড়ে। রাজু তখন মাকে বলতো, আমি মরলে দেখো অনেকগুলো তারা খসে পড়বে। মা শুনে মৃদু মৃদু হাসতেন। কবে কোন শৈশবের কথা এসব! অথচ কয়েক বছর আগের অনেক কথা সে ভুলে গেছে। বাবা কি তাঁর পুরোনো হাঁপানির অসুখ নিয়ে এখনো বেঁচে আছেন? বাড়ির সবাই এখনও কি নবরায় লেনের সেই পুরোনো বাড়িতে আছে না নদীর ওপারে গ্রামের বাড়িতে চলে গেছে? গত তিন বছর বাড়ির কোন খবর পায়নি রাজু। ছোট ভাইটা নিশ্চয়ই কলেজে যাবার বদলে কোথাও চাকরি জুটিয়ে নিয়েছে। শেষবার রাজুকে দেখে মা শুধু কেঁদেছেন। যুদ্ধের পরে একবার বাড়ি গিয়েছিল রাজু। মা তখন বলেছিলেন, 'পলিটিক্স আমাদের জন্য বাবা। যাদের খাওয়া-পরার চিন্তা নেই, তারা পলিটিক্স করে। তুই আমাদের বড় ছেলে, তোর বাবার কত আশা ছিলো তোকে নিয়ে।' বাইশ বছরের রাজুর রক্তে তখন আগুন জ্বলছে। মাকে শান্তভাবে শুধু বুঝিয়েছে।

বাড়িতে মায়ের যন্ত্রণা আর জীবনের কাছে প্রতিপদে মার খাওয়া বাবার অক্ষম ক্রোধ সইতে না পেরে দু'দিন পর আবার বাড়ি ছেড়েছে রাজু। রহমান ভাই বাড়ির কথা শুনে ওকে বলেছেন, 'আপনার মায়ের মতো লক্ষ লক্ষ মা অভাবের যন্ত্রণায় ভুগছেন। এদেশের মায়েরা খাবার দিতে না পেরে সন্তানের মুখে বিষ তুলে দিচ্ছে। তাদের কথা ভাবুন। এ বাজারে চাকরি পাওয়া সবচেয়ে কঠিন কাজ। আর চাকরি পেলেও কি অভাব দূর হবে?' রাজু নিজেও অনেক ভেবেছে। বাবার অভিজ্ঞতাই বলে এ সমাজে সৎভাবে জীবিকা নির্বাহ সম্ভব নয়। বাবা তিরিশ বছরেরর চাকরি জীবনে পারেননি।

ট্রেনের হুইসেলের শব্দে রাজু সম্বিত ফিরে তাকাল। স্টেশন এসে গেছে। দু'জন যাত্রী নামার জন্য তৈরি হচ্ছে। টিকটিকি দু'টো মাঝে মাঝে আড়চোখে রাজু আর দীপুকে দেখছিল। রাজু নির্বিকার ভঙ্গিতে হাই তুলল, যেন ওর কোথাও যাওয়ার কোনো তাড়া নেই। ট্রেন স্টেশনে থামার পর দীপু নেমে গেল। লোক দুটো একটু উশখুশ করল। একজন বলল, 'আপনার বন্ধু কি এখানেই নামলেন?'

রাজু মাথা নাড়ল। অন্য লোকটা তার সঙ্গীকে নীচু গলায় বলল, 'চা খেতে গেছে বোধ হয়।'

'আমরাও তো চা খেতে পারি।' একজন টিকটিকি রাজুকে শুনিয়েই বলল, 'একটু চা পেলে মন্দ হতো না। যাই দেখি প্ল্যাটফর্মে কাউকে পাই কিনা।'

লোকটা কামরা থেকে নামার পর রাজু জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। জাফর আর পূরবী শালবনের ভেতর হেঁটে যাচ্ছে। আরো কয়েকজন বিনা টিকেটের গরিব যাত্রী সেদিকে নেমেছে। একটু পরে দীপুকে দেখতে পেয়ে কিছুটা স্বস্তিবোধ করল রাজু।

একটা চা-ওয়ালাকে ডেকে এনে টিকটিকিটা ততক্ষণে আবার কামরায় উঠে এসেছে। রাজুকে দরাজ গলায় আহ্বান জানাল, 'আপনার চলবে নাকি এক কাপ?'

মৃদু হেসে রাজু মাথা নাড়ল।

লোকটা আবার বলল, 'খেলেই পারতেন। ফ্রেশ লাগতো।'

'অভ্যেস নেই'— বলে আবার বাইরে তাকাল রাজু।

বুড়ো অধ্যাপক তাঁর সঙ্গীকে বললেন, 'আগে দিনে দশ বারো কাপ চা না হলে চলত না। এখন চা খাওয়া একরকম ভুলেই গেছি।'

ডাক্তার আপনমনে বললেন, 'বাচ্চাদের দুধ চিনি জোটে না আবার চা!'

লোক দু'টো কোন কথা না বলে এক মনে চা খেল। ট্রেন ছাড়ার ঘন্টা বাজল। রাজু হাই তুলতে তুলতে দেখল জাফররা অনেকটা পথ এগিয়ে গিয়েছে। টিকটিকিটা চা শেষ করে রাজুর দিকে তাকাল। হুইসেল বাজিয়ে ট্রেন নড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে উদগ্রীব হয়ে বলল, 'আপনার বন্ধু যে এখনও এলেন না?'

রাজু আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আসবে নিশ্চয়ই। বাচ্চা তো নয়!'

লোক দুটো একে অপরের দিকে তাকাল। কি করবে, কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না ওরা। দীপুকে দেখার ভান করে রাজু দরজার কাছে গিয়ে বাইরে তাকাল। ট্রেন চলা শুরু করেছে। প্ল্যাটফর্মটা পেরিয়ে এলো। কামরার ভেতর লোক দুটো রীতিমতো অধৈর্য

হয়ে পড়েছে। একজন বলল, 'আপনার বন্ধু কি উঠতে পারেন নি?'

রাজু মৃদু হেসে বলল, 'পাশের কোন কামরায় উঠেছে বোধ হয়। শুনে গম্ভীর হয়ে গেল লোকটা— 'দরজাটা বন্ধ করে দিন। এদিকে আবার ডাকাতি হয় খুব।'

রাজু মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে সামনে তাকাল। ট্রেনের গতি ক্রমশঃ বাড়ছে। সামনে ঘন অন্ধকার। রাজু সিঁড়িতে এক পা নেমে অন্ধকারের ভেতর লাফ দিল। মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঢালু জমিতে গড়িয়ে কিছুদূর গিয়ে হাত পা ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল। হাতের বেশ খানিকটা জায়গা ছড়ে গিয়েছে। কনুইতে ভেজা চটচটে রক্তের ছোঁয়া টের পেল। ট্রেন তখন পূর্ণ গতিতে এগিয়ে চলেছে। কয়েকটা কৌতূহলী মুখ জানালায় ঝুলতে দেখল রাজু। সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে রাজু শালবনের দিকে ছুটল।

ঠিক তখনই কয়েকবার হুইসেল বাজিয়ে ট্রেনের গতি মন্থর হয়ে এল। পুরোপুরি থামার আগেই কয়েকজন রেল পুলিশ ঝটপট নেমে পড়ল। শালবনের ভেতর ঢোকার পর রাজু পেছনে পুলিশের এলোমেলো হুইসেল বাজানো শুনল। একটু পরেই জাফরদের দৌড়াতে দেখল। ওরা দৌড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে পেছনেও তাকাচ্ছিল। পুলিশের হুইসেল ওরাও শুনেছে। রাজুকে পেয়ে সবাই একসঙ্গে অন্ধকার শালবনের গভীরে ছুটল।

বেশ কিছুক্ষণ পর ওরা আবার ট্রেনের হুইসেল শুনল। তখন অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেছে। ওরা একটা শিরিষ গাছের নিচে ক্লান্ত শরীর বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। দূরে তখনও পুলিশের হুইসেলের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। দীপু হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'মনে হচ্ছে পুলিশ সারারাত এভাবে খুঁজবে।'

রাজু মাথা নেড়ে সায় জানাল। জাফর বলল, 'নিজেদের খুব গুরুত্বপূর্ণ লোক মনে হচ্ছে। সবখানে পুলিশ ওৎ পেতে আছে।'

'ধরা পড়লে গুরুত্বটা হাড়ে হাড়ে টের পাবে।' পূরবী তেতো হেসে বলল, 'আমি আর ট্রেনে উঠছি না। এত টেনশন সহ্য হয় না।'

জাফর বলল, 'সেকি কমরেড, লং মার্চের কথা কি ভুলে গেলে?'

রাজু মৃদু হেসে বলল, 'পূরবীকে কেউ কিছু বলেছে নাকি!'

'বলতে আর বাকি রেখেছে। একজন গেরস্তের বৌ সারাক্ষণ বক বক করেছে— কবে কোথায় বিয়ে হয়েছে, বাপের বাড়ি কোথায়, দেখে শহরের মেয়ে মনে হয়। মহিলা এমনভাবে বলছিল যে, সবাই আমাদের তাকিয়ে দেখছিল। জাফরের দিকেও অনেকে বাঁকা চোখে তাকিয়েছে।'

রাজু বলল, 'এতদিন গ্রামে থেকেও গ্রামের কিছু অভ্যাস তুমি রপ্ত করতে পারোনি পূরবী। মাথায় তেল দেবে না, মুখে তেল মাখবে না, ওরাতো বলবেই শহরের মেয়ে।'

পূরবী মুখ টিপে হাসল— 'গ্রামের মেয়েদের সম্পর্কে তোমার বর্ণনা শুনে মনে হচ্ছে তুমি এখনো শরৎচন্দ্রের যুগে আছো। কটা গ্রামের মেয়ের মুখের দিকে তুমি তাকিয়ে দেখেছো রাজু? খাবার তেল জোটে না আবার মাথায় দেবে! আমার পাশে যে মেয়েটা বসেছিল ওর মাথায় কবে যে শেষ তেল দিয়েছিল ও নিজেও বোধহয় বলতে পারবে না। জট পড়ে মাথায় উকুন কিলবিল করছে।'

দীপু হেসে বলল, 'একই কথা হল পূরবী, তোমার চুলে জট পড়েনি। উকুনও

কিলবিল করছে না। অতএব তুমি গ্রামের মেয়ে হতে পারো না। বলতে পারো গ্রামের এক সুদর্শন যুবক শহর থেকে তোমাকে ইলোপ করে নিয়ে যাচ্ছে।'

জাফর বলল, 'পূরবীর চুল সত্যিই অপূর্ব। আমি বাজি ধরে বলতে পারি, ওকে যে বিয়ে করবে, তার যদি আমার মতো সৌন্দর্যবোধ থাকে তাহলে সারাক্ষণ ওর চুলে মুখ গুঁজে পড়ে থাকবে।'

দীপু কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল, 'যা বলার স্পষ্ট করে বলো জাফর।'

পূরবী শব্দ করে হাসল— 'তোমাদের দুজনকে পেটাতে হবে।'

রাজু মৃদু হেসে প্রসঙ্গ পাল্টাল— 'কাজের কথায় এসো। ট্রেন ছাড়া এতটা পথ কিভাবে যাবে ভেবে দেখেছো?'

জাফর আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সে ভাবনা কখন তোমার মাথায় চাপিয়ে দিয়েছি টের পাওনি বুঝি?'

পূরবী বলল, 'বাসে গেলে হয় না?'

'এখান থেকে?' রাজু মাথা নাড়ল— 'বাসে যেতে হলে আগে শহরে যেতে হবে। রাস্তা থেকে বাসে উঠতে পারবে না। আর শহরের বাস স্ট্যান্ডগুলো আদৌ নিরাপদ নয়। ওদের ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে সেখানেও তারা নজর রাখবে।'

দীপু বলল, 'পথে কোনো ট্রাক বা লরি থামিয়ে উঠে গেলে কেমন হয়? কিছু পয়সা দিলে ড্রাইভার নিশ্চয়ই আপত্তি করবে না।'

রাজু আর পূরবী মাথা নেড়ে সায় জানাল। রাজু বলল, 'আমিও তাই ভাবছিলাম।'

'তাহলে এবার কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেয়া যাক।' বলে পূরবী সুটকেস থেকে চাদর বের করল— 'রাজু আর দীপু ইচ্ছে করলে কলা খেতে পারো। আমার কর্তা আমাকে ট্রেনে খাইয়েছে।'

জাফর নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল, 'সেই খাবারে বোধহয় লবণ ছিলো না।'

'থাকলে কি হতো?' পূরবী ভুঁরু কুঁচকে বলল।

'পেটানোর কথা বলতে না।'

'ফের ইয়ার্কি!' পূরবী আর দীপু শব্দ করে হাসল।

রাজু দুটো কলা দীপুর দিকে ছুঁড়ে দিল। 'আপাততঃ এই খেয়েই রাত কাটাতে হবে। ধারে কাছে পানি নেই।'

দীপু কলা খেতে খেতে বলল, 'রাজু তখন ঠিকই বলেছো। যেখানে যাই সেখানেই পুলিশ, মিলিটারী, টিকটিকি আর রক্ষীবাহিনী। আমাদের ভয়ে মুজিবের ঘুম নষ্ট হয়ে গেছে।'

জাফর চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছিল। মাথা বের করে বলল, 'একটু আগুন জ্বালালে হয় না রাজু?'

'মাথা খারাপ! এখানে আগুন জ্বালালে এক মাইল দূর থেকে আলো দেখা যাবে।'

'তুমি কি মনে করো পুলিশ এখনো আমাদের খুঁজছে?'

'হয়তো এখন কোথাও ঘাপটি মেরে বসে আছে। সকাল হলে আবার খুঁজবে। রাতে জঙ্গলের ভয় তো ওদেরও আছে।'

দীপু বিড় বিড় করে বলল, 'ভয় শুধু আমাদেরই নেই।'

রাজু ওর পিঠে হাত রেখে আস্তে আস্তে বলল, 'শুয়ে পড়ো দীপু। কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নাও। কে জানে কাল কোন বিপদ অপেক্ষা করছে।'

পরদিন ভোর হওয়ার আগেই ওরা উঠে পড়ল। কুয়াশায় ভিজে গায়ের চাদর স্যাঁতসেতে হয়ে গেছে। বনের ভেতর একটা দুটো পাখি মাঝে মাঝে ডাকছিল ভোরের জন্য। জাফর আর পূরবী পোষাক পাল্টে নিল। রাজু বলল, 'বড় রাস্তা পর্যন্ত যেতে যেতে সূর্য উঠে যাবে।'

বিপদের সব রকম ঝুঁকি নিয়েই ভোরের আলোয় ওরা শালবন থেকে বেরিয়ে এল। বড় রাস্তা ধরে কিছুটা পথ হাঁটার পর ওরা দুটো সব্জির লরিতে জায়গা পেয়ে গেল। দুটোই সরকারী খামারের লরি। তরকারি বোঝাই করে ঢাকার দিকে যাচ্ছিল।

সামনের লরিতে উঠল রাজু আর পূরবী। পেছনের লরিতে জাফর আর দীপু। ওদের লরিতে একজন হেলপারও ছিল। রাজুদের লরি চালাচ্ছিল একজন বুড়ো ড্রাইভার। রাস্তা একেবারে ফাঁকা। লরিতে ওঠার পর থেকে বুড়ো অনর্গল কথা বলছিল। পূরবীও চাচা ডেকে কিছুক্ষণের মধ্যেই বুড়োর হাড়ির খবর জেনে নিল।

শহরে ঢোকার পথে চেকপোস্টে ওদের গাড়ি থামানো হলো। পূরবী একবার বুড়ো ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে মাথায় আঁচল টানল। বুড়ো গজগজ করতে লাগল— 'আজ আবার এসব কি? সরকারি গাড়ির ছাপ কি হারামজাদাদের চোখে পড়ে না?'

স্টেনধারী দুজন পুলিশ এসে রাজু আর পূরবীকে উঁকি মেরে দেখল। বুড়ো ড্রাইভারকে সরাসরি প্রশ্ন করল, 'এরা কোত্থেকে উঠেছে?'

বুড়ো বিরক্ত গলায় বলল, 'আমার বাড়ি থেকে।'

এবার এগিয়ে এল একজন সার্জেন্ট— 'এরা তোমার কে হয়?'

বুড়ো নির্বিকার গলায় বলল, 'আমার ভাইপো আর ভাইঝি। ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল।'

সার্জেন্ট একপাশে সরে গিয়ে পুলিশকে ইশারা করল ওদের গাড়ি যেতে দেয়ার জন্য। নিচু গলায় বলল, 'না এরা নয়।'

বুড়ো ড্রাইভার ইঞ্জিন স্টার্ট দিল। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল পূরবী আর রাজু। পেছনের লরিতে জাফর আর দীপু হেলপার বলে পার হয়ে গেল।

পূরবী আড়চোখে একবার বুড়োকে দেখল। একমনে গাড়ি চালাচ্ছে। মুখে কোন প্রতিক্রিয়া নেই। একটু পরে রাস্তার উপর চোখ রেখে বুড়ো বলল, 'তোমরা ভদ্রলোকের ছেলেমেয়ে। ভাইঝি বললাম বলে কিছু মনে কোরো না মা। পথ থেকে তুলেছি বললে অনর্থক হয়রানি করতো। বলতো পয়সা নিয়ে সরকারি গাড়িতে তুলেছি। তোমাদের কাছ থেকে কিছু খসাবার জন্য নামিয়েও নিতো হয়তো।' একটু থেমে কি যেন ভাবল বুড়ো। ঘাড় ফিরিয়ে পূরবী আর রাজুকে এক নজর দেখে আবার বলল, 'ক'দিন আগে একটা ছেলে এভাবে পথে গাড়ি থামিয়ে উঠেছিল। পুলিশ জিজ্ঞেস করতেই বলে দিলাম পথে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটাকে নামিয়ে নিল। তোমাদেরই বয়সী হবে। কি যেন বেআইনী পার্টি করে। পুলিশ বলেছিল সেজন্যে রক্ষীবাহিনীর লোকেরা নাকি ওকে নিয়ে

গেছে। একটু থেমে দীর্ঘশ্বাস ফেলল বুড়ো— 'কোন মায়ের নাড়িছেঁড়া ধন কে জানে!'

শহরের রাস্তায় তখন গাড়ি আর লোকজনের ব্যস্ত চলাফেরা আরম্ভ হয়েছে। বহুদিন পর ঢাকাকে দেখে মনে হল ব্যস্ততার ভেতরও দারিদ্র্য আর বিষণ্ণতাকে ঢাকতে পারে নি। গ্রাম থেকে আসা ছিন্নমূল পরিবার এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। যারা হাঁটছে বা বাসে যাচ্ছে, মনে হল সবাই আনন্দহীন এক অনিশ্চিত পথের যাত্রী। পূরবীর মনে হল সত্তর একাত্তরের সেই উত্তাল আন্দোলনের দিনগুলোর কথা। কত সজীব ছিল তখন এ শহরের মানুষ। চার বছরে কি অস্বাভাবিক পরিবর্তন। দুপাশে জয়নুল আবেদীনের দুর্ভিক্ষের ছবি, ভাঙাচোরা মানুষ, রিকশা, ঠেলাগাড়ি, বাস আর মটরগাড়ির ভেতর দিয়ে লরি দুটো পালাচ্ছিল। যেন গাড়ির টাটকা সবজির ওপর ওই নিরন্ন মানুষগুলো হামলা করবে।

নীলক্ষেতের রেল ক্রসিং পেরিয়ে লরি যখন বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ঢুকল হঠাৎ পূরবীর বুকের ভেতরটা হু হু করে উঠল। ঝাঁকড়া রেইনট্রি, রিচার্ডিয়ানা, জারুল আর দেবদারু গাছগুলো অনেক দিনের পুরোনো বন্ধুর মতো এখনও দাঁড়িয়ে আছে। যেন বলতে চাইছে, কোথায় ছিলে এতদিন! কলাভবনের সামনে দিয়ে যাবার সময় রাজু আর পূরবী একে অপরের দিকে তাকাল। ছল ছল করে উঠল পূরবীর চোখ দুটো। ইচ্ছে হল এখনই রাজুর হাত ধরে ছুটে যায় পাবলিক লাইব্রেরির সবুজ প্রাঙ্গণে রাধাচূড়া গাছটার তলায়। স্মৃতির উপর জমে থাকা সময়ের মাটি খুঁড়ে অতীতের কিছু অন্তরঙ্গ মুহূর্ত বের করে আনতে চাইল সে। প্রচন্ড এক অস্থিরতা আর শূন্যতা ওকে কয়েক মুহূর্তের জন্য আচ্ছন্ন করে ফেলল। রাজু বুঝতে পারল, পূরবীর বুকের ভেতর কি ভীষণ ঝড় বইছে। ম্লান হেসে নিজের হাতের মুঠোয় তুলে নিল ওর হাত। তির তির করে কাঁপছে পূরবী। রাজু ওর রক্ত চলাচলের গতি অনুভব করল।

পেছনের গাড়িতে একইভাবে অভিভূত হয়ে পড়েছিল দীপু। মহসিন হলের দিকে তাকাতেই বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। ছশ বিশ নম্বর রুমটা কি আগের মতো আছে? রুমমেট সামাদ ভাই'র এতদিনে চলে যাওয়ার কথা। এখন যারা আছে তারা কি জানে আলমারির কাঠের সবুজ পাল্লার উপর লেনিনের ছবিটা কে এঁকেছে? নাকি কেউ মুছে ফেলেছে সেই ছবি!

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে জাফরের কোনো আবেগ নেই। পড়তো রংপুরে। ছাত্র ইউনিয়নের সম্মেলন বা কোন বর্ধিত বৈঠক হলে এখানে আসতো। রাজুর সঙ্গে পরিচয় তখনই, সংস্কৃতি সংসদের এক গানের অনুষ্ঠানে। যতবার এসেছে এস এম হলের ক্যান্টিনের ওপরের কামরায় থেকেছে, সবাই মেঝেতে শতরঞ্জি বিছিয়ে রাতে লাইন দিয়ে ঘুমোতো।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পূরবীদের বাড়ি বেশি দূর নয়। বকশিবাজার থেকে সে হেঁটেই আসত। রাতে কাজ থাকলে রোকেয়া হলে থেকে যেত। পূরবীর মনে পড়ল উনসত্তরের মিছিল, উত্তেজিত বটতলা, সকালে মধুর ক্যান্টিন, দুপুরে কলাভবনের নির্জন করিডোর আর বিকেলে কামিনী গাছের ঝোপের পাশে ঘাসের সবুজ বিছানায় রাজুর সান্নিধ্য। হলুদ পাপড়ি বিছানো রাধাচূড়া গাছের তলায় ঘন্টার পর ঘন্টা কিভাবে কেটে গেছে

কেউ টের পায় নি। অতীতের আরো অনেক স্মৃতি সময়ের ধূলোমাটি জমে এতদিনে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। সহসা সেই সব স্মৃতি চুয়াত্তরের নভেম্বরের সেই কুয়াশাভেজা সকালে দারুণ সজীব মনে হল।

পূরবী ওর হাতের মুঠোয় দ্বিতীয় বর্ষ অনার্সে পড়া উজ্জ্বল শাণিত এক তরুণের আবেগময় হৃদয়ের উত্তাপ অনুভব করছিল। কে জানে বাড়িতে সবাই এখন কি করছে! রেবা, খোকন, টোকন, বুলি, অনি— ওর ছোট ভাইবোনরা কি মনে রেখেছে ওদের বড়দিকে! কে জানে মা হয়তো এখনও গভীর রাতে কাঁদেন ওর কথা ভেবে, যেমন কাঁদতেন কোনদিন খবর না দিয়ে হলে থেকে গেলে!

রাজু মৃদু গলায় বলল, 'বাড়ির এত কাছে দিয়ে যাচ্ছি, অথচ কেউ ভাবতেও পারবে না।' একটু থেমে রাজু আবার বলল, 'বাড়ি গিয়ে সবাইকে চমকে দিতে ইচ্ছে করে না পূরবী?'

ম্লান হেসে মাথা নাড়ল পূরবী। অস্ফুট কণ্ঠে বলল, 'না রাজু, বহু আগেই সেই ইচ্ছের কবর হয়ে গেছে।' কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার বিড়বিড় করে বলল, 'ঢাকা আমার কাছে দারুণ অস্বস্তি আর ভয়ের শহর। তুমি তো জানো রাজু, বহুবার আমি ঢাকা আসার প্রোগ্রাম বাতিল করে দিয়েছি। বাবার কথা আমি ভাবি না। তার দলের ছেলেদেরও আমি ভয় পাই না। আমি ভাবি কখনো হঠাৎ যদি রেবা খোকনদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, ওদের কেউ যদি এসে বলে বড়দি আমাদের এভাবে ফেলে কেন চলে গেলে— কি বলবো ওদের! কত চেষ্টা করেছি রাজু তোমার মতো অতীতকে ভুলে যেতে— পারি না। অতীতের অভ্যাসগুলোকে ঠিকই ভুলে গেছি, তবু ভয় হয় যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যায়! এই শহরে আমার জন্ম। প্রত্যেকটা ঘর বাড়ি, রাস্তার মোড়, লাইটপোস্ট, গাছপালা আমার চেনা, তবু দেখো কত অচেনা মনে হচ্ছে। শহরে এখন অনেক অচেনা মানুষের ভিড়। মানুষের চেহারা বদলে গেছে। ঘরবাড়ির চেহারা বদলে গেছে। আর কেউ না বুঝলেও তুমি অন্তত বুঝবে রাজু, এ শহরে তুমি আমি দু'জনেই এখন অচেনা, আগন্তুক।'

রাজু কোন কথা না বলে শুধু গভীর দৃষ্টিতে পূরবীকে দেখল। পার্টি জীবনের দারুণ ব্যস্ততার ভেতর পূরবী যখন নিজেকে ডুবিয়ে রাখতো তখন মনে হতো ওর অতীত বলে কিছুই নেই। এখন পার্টির স্বাভাবিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পূরবী অতীতের কাছে ফিরে যেতে চাইছে। হয়তো এটাই স্বাভাবিক। অতীতের কিছু স্মৃতি রাজুর মনের বন্ধ দুয়ারেও হানা দেয়, যদিও এ কথা রাজু কাউকে কখনও বলেনি। অতীত কখনো জীবন থেকে মুছে ফেলা যায় না।

পূরবীর মুখের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে রমনার ধূসর মাঠের দিকে তাকাল রাজু। রোদে পুড়ে সবুজ ঘাস মাটির সঙ্গে মিশে ধূলো হয়ে গেছে। আকাশে এক ফোঁটা মেঘের চিহ্ন নেই। হেমন্তের এই সময়ে বাংলাদেশে খুব কমই বৃষ্টি হয়। তবু রাজুর মনে হল, একবার বৃষ্টি হলে ভাল হতো। পূরবীর দিকে আবার তাকিয়ে দেখল, ওর চোখে কান্নার দাগ। রাজুর কখনও কান্না পায় না। কি বলবে পূরবীকে? সেই মুহূর্তে ওর চোখ দু'টো রোদে জ্বলা শুকনো ঘাসের মতো খরখরে মনে হচ্ছিল।

হাইকোর্টের কাছে এসে ওরা লরি থেকে নেমে পড়ল। জাফর বলল, 'কামাল ভাই'র বাসা থেকে একবার ঘুরে আসবো নাকি! রহমান ভাই'র খোঁজ পাওয়া যেতে পারে।'

রহমান ভাই'র সঙ্গে দেখা হওয়াটা এখন খুবই দরকার। জেলা কমিটির কামাল ভাই এখন কি চিন্তাভাবনা করছেন ওরা কেউ জানে না। কে জানে রফিক ভাইদের কেউ হয়ত সেখানে আছে। কিংবা এমনও হতে পারে তাঁর ওখানেই আজকের জন্য ওদের শেল্টারের ব্যবস্থা হয়ে গেল। রাজু কিছুটা ঝুঁকি নিয়ে জাফরকে বলল, 'তুমি আর পূরবী তাহলে কামাল ভাই'র বাসা থেকে ঘুরে এসো। দেখো আজকের জন্য শেল্টারের ব্যবস্থা করতে পারেন কিনা। আমি দীপুকে নিয়ে জি পি ও যাচ্ছি। আমরা সেখানেই তোমাদের জন্য অপেক্ষা করবো।'

জাফর আর পূরবী একটা রিক্সা নিয়ে নয়া পল্টনের দিকে গেল। দীপুকে নিয়ে রাজু জি পি ও-র দিকে পা বাড়াল। হাঁটতে হাঁটতে দীপু বলল, 'দু'বছর আগেও শহরের এরকম অবস্থা ছিল না। ফুটপাতে পা ফেলার জায়গা নেই।'

রাজু কিছুক্ষণ চুপ থেকে কি যেন ভাবল। তারপর আপন মনে বলল, 'মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া একেই বলে। আমরা গ্রামের জোতদারদের গলা কাটছি ঠিকই, এমনকি দশ পনেরো বিঘা জমি যাদের আছে তাদেরও।। অথচ প্রশ্ন করলেই জানতে পারবে একসময় পঁচিশ তিরিশ বিঘা জমির মালিক ছিল, এরকম অনেকেই এখন ঢাকার ফুটপাতে পড়ে আছে। দুর্ভিক্ষে শত শত মানুষ মারা যাচ্ছে কি সামান্তবাদের কারণে? এর জবাব আমাদের দিতে হবে।'

জি পি ও-তে বেশি ভীড় ছিল না। দু'টো মানি অর্ডার ফর্মে রাজু চারশ টাকার দু'টো অংক লিখল। একটায় ঠিকানা লিখল অরুণের মায়ের, আরেকটায় লিখল জমিরের মায়ের। ফর্মের নিচের ছোট সাদা জায়গাটায় লিখল, 'মা, অনেকদিন আপনাদের কোন খোঁজ খবর নিতে পারিনি। কেমন আছেন, কিভাবে আছেন, কিছুই জানি না। কিছু টাকা পাঠাচ্ছি। আপনার ছেলেকে কখনও আমরা ভুলবো না। ওদের ভোলা যায় না। সময় পেলে দেখা করবো।—'

চিঠি লিখতে লিখতে রাজু বলল, 'রফিক ভাইকে বহুবার বলেছি আমাদের শহীদ কমরেডদের পরিবার পরিজন কে কিভাবে আছে যোগাযোগ রাখতে। এটা নাকি একধরনের সংশোধনবাদী চিন্তা। তিনি বলেন, বিপ্লবীদের কোন বন্ধন থাকতে নেই। পার্টির জন্য, বিপ্লবের জন্য কত হাজার কমরেড জীবন দিয়েছে, আমরা তাদের অনেকেরই নাম জানি না।'

দীপু কোনো কথা বলল না। রাজুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় ওর মন ভরে গেল। সবাই যদি সহযোদ্ধাদের জন্য এভাবে ভাবতে পারতো তাহলে পার্টি জীবন আরও অনেক সুন্দর হতো। টাকা জমা দিয়ে ওরা পোস্ট অফিসের বাইরে করুই গাছটার ছায়ায় এসে দাঁড়াল।

জীবনে কোনদিন কারো কাছে হাত পাতেনি এমন সব মানুষ ভিক্ষার হাত বাঁড়িয়ে ফুটপাতে বসে ধুঁকছে। পথচারীদের তাকাবার সময় নেই। ওদের অবস্থাও বসে থাকাদের চেয়ে খুব একটা ভালো নয়। স্টেডিয়ামের গেটে আঞ্জুমানের গাড়ি এসেছে

বেওয়ারিশ লাশ তুলতে। খবরের কাগজের রিপোর্ট— ঢাকায় প্রতিদিন পনেরো বিশটা বেওয়ারিশ লাশ দাফন করছে আঞ্জুমানের লোকেরা।

রাজু বলল, 'কী ভাবছো দীপু?'

দীপু কথা না বলে শুধু মাথা নাড়ল। জাফর আর পূরবী এল কিছুক্ষণ পর। ওদের মুখ শুকনো। চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে জাফর বলল, 'রহমান ভাই ঢাকায় নেই। কামাল ভাই জঘন্য ব্যবহার করলেন।'

দীপু ভুঁরু কুঁচকে বলল, 'জঘন্য ব্যবহার মানে?'

জাফর বিরক্তির সঙ্গে বলল, 'আমরা নাকি খুনে ডাকাত। আমাদের পার্টির সঙ্গে তিনি আর সম্পর্ক রাখবেন না। আমরা যেন তাঁর বাসায় আর না যাই— এমনি সব কথা। দরজা খুলে আমাদের দেখেই শুরু করলেন— পেয়েছেন কি আপনারা? আমার তখন ইচ্ছে হচ্ছিল বুড়োর টুটি চেপে ধরতে। পূরবীই সামাল দিয়েছে।'

রাজু ম্লান হেসে বলল, 'তিনি সব সময় এরকমই। মাঝে মাঝে পার্টির কাগজপত্র ছেপে দেন, এছাড়া অন্য কোনো কাজই করেন না। শুধু প্রেসের সুবিধার জন্য তাকে গোটা জেলার দায়িত্ব দিয়ে বসিয়ে রাখা হয়েছে।'

পূরবীও রেগে গিয়েছিল। ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, 'রহমান ভাই'রও ধারণা ইনি না থাকলে ঢাকায় পার্টি করা যাবে না।'

জাফর বিরক্ত কণ্ঠে বলল, 'বাদ দাও ওসব। যত বয়স হচ্ছে— রহমান ভাই বাঁধাকপি হয়ে যাচ্ছেন। অনেক উল্টোপাল্টা কাজ করেন তিনি। এখন চল হোটেলে গিয়ে কিছু খাই। তারপর তো আবার বাস, নয়তো হাঁটা।'

স্টেডিয়ামের দিকে যেতে যেতে রাজু বলল, 'এখন থেকে আমাদের খুব হিসেব করে চলতে হবে। অরুণ আর জমিরের মাকে আমি আটশ টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি।'

পূরবী মৃদু গলায় বলল, 'গত জুলাইতে আমি এক জায়গায় শুনেছি, পাবনা আর রাজশাহীর বহু শহীদ আর জেলবন্দী কৃষক কমরেডের পরিবার ভিক্ষে করে দিন কাটাচ্ছে, এই দুর্ভিক্ষে তারা কিভাবে বেঁচে আছে, না মরে গেছে— কেউ তার খবর রাখে নি। জেল থেকে ওরা যখন বেরিয়ে আসবে, তখন তাদের কি জবাব দেবো?'

ওরা কেউ পূরবীর কথার জবাব দিল না। ওরা তিনজনই ওর ক্ষোভটুকু সমানভাবে ভাগ করে নিয়েছিল।

স্টেডিয়ামের একটা সস্তা হোটেলে ডাল আর রুটি খেয়ে ওরা যখন বাস স্ট্যান্ডে এল তখন চট্টগ্রাম যাওয়ার শেষ বাস চলে গেছে। মতিঝিলের টিকেট ঘরের একজন জাফরকে বলল, 'এখন ফুলবাড়িয়া স্টেশনে কুমিল্লার বাস পাবেন। সেখান থেকে চট্টগ্রামের বাস পেতে পারেন।'

জাফর এসে রাজুকে বলল, তাই চলো। যত রাতই হোক আনিসের বাসায় গিয়ে একটা ঘুম না দিলে শরীরের যন্ত্রপাতি সব বিকল হয়ে যাবে।

ফুলবাড়িয়া স্টেশনের পথে হাঁটতে হাঁটতে দীপু বলল, 'কামাল ভাই'র ব্যাপারে আমাদের একটা সিদ্ধান্ত নেয়া উচিৎ। ঢাকা থেকে এভাবে আমাদের চলে যেতে হবে আর তিনি এখানে জেলার নেতা হয়ে কর্তাগিরি করবেন এটা হতে পারে না।'

রাজু শান্ত গলায় বলল, 'সব ঠিক হয়ে যাবে দীপু। আসলে বিপ্লব বলতে যে কি বোঝায় এটা তাঁর উপলব্ধিতে নেই। গ্রামের কয়েকটা ছেলে জোতদার মহাজনের গলা কাটবে আর তিনি মাসে দুমাসে একটা পত্রিকা বের করে তার রিপোর্ট ছাপবেন— বিপ্লবকে এভাবে ভাবতে গিয়ে তিনি ধরে নিয়েছেন তাঁর কাজ তিনি ঠিকই করে যাচ্ছেন।'

জাফর বলল, 'তুমি যাই বলো রাজু, আমি কিন্তু দীপুর সঙ্গে একমত। আমরা বিপ্লব করতে এসেছি। এটা ছেলেখেলা নয়। কে শত্রু, কে মিত্র পার্টির এই অবস্থায় আমাদের অবশ্যই জানতে হবে। আমাদের সঙ্গে তারাই থাকবে যারা সত্যিকার অর্থে বিপ্লবী।'

দীপু, রাজু বা জাফর কি বলছে কিছুই পূরবীর কানে যাচ্ছিল না। দৃষ্টি যেখানে যায় সেখানেই কঙ্কালের মতো মানুষ। ফুটপাতে পা ফেলার জায়গা নেই। দু একজন ক্লান্ত ফ্যাশফ্যাশে গলায় ভিক্ষা চাইছে বটে, তবে বেশির ভাগই নির্বাক এবং চলৎশক্তিহীন, মনে হয় মৃত। যারা মৃত আর যারা মৃত্যুপথযাত্রী সবাই এমনভাবে পড়ে আছে যে, বোঝার উপায় নেই কে জীবিত কে মৃত। শত শত মানুষ শহরের শান বাঁধানো রাস্তায় খোলা আকাশের নিচে পড়ে আছে। প্রতিটি মৃত অথবা প্রায়-মৃত মানুষের নির্বাক দৃষ্টি পূরবীর বুকের ভেতর একের পর এক গেঁথে গেল। মাথা ঝিম ঝিম করেছিল। একবার মনে হল বমি আসবে। মুখের ভেতরটা ভীষণ তেতো লাগছে। শরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরা প্রচন্ড এক অস্বস্তিতে টানটান হয়ে আছে। পূরবীর মনে হল সে বুঝি আর এ পৃথিবীতে নেই। দুপুর বারোটায় গুলিস্তান বাস স্ট্যান্ডের ব্যস্ত অঞ্চলটিকে মনে হল জনমানবহীন ধূসর কোন প্রান্তরের মতো।

পূরবীর দিকে চোখ পড়তেই জাফর চমকে উঠল। পা সামান্য টলছে, চোখে উদভ্রান্ত দৃষ্টি, দরদর করে ঘামছে। কাছে এসে জাফর ওর একটা হাত ধরল। পূরবী চমকে উঠে জাফরের দিকে তাকাল। জাফর বলল, 'শরীর খারাপ লাগছে?'

পূরবী জাফরের হাত থেকে নিজের হাতটা ধীরে ধীরে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'ও কিছু নয়। মাথাটা কেমন যেন করছিল।'

জাফর ম্লান হেসে বলল, 'এতেই ভেঙে পড়ছো পূরবী। রংপুরতো যাওনি তুমি। আমি এক গ্রামে গিয়েছিলাম। সেখানে মানুষকে পঙ্গপালের মতো গাছের পাতা সেদ্ধ করে খেতে দেখেছি। তবু মানুষ বাঁচেনি। না খেয়ে যত না মরেছে, এসব খেয়ে মরেছে তার চেয়ে বেশি।'

পূরবী আস্তে আস্তে বলল, 'ওসব কথা এখন থাক জাফর।'

জাফরের ঠোঁটের ফাঁকে তিক্ত হাসির রেখা ফুটে উঠল। শুনতে না চাইলেও দেখতে তো হবে পূরবীকে! চোখ বুঁজে তো আর রাস্তা দিয়ে হাঁটতে পারবে না। জাফর যত দেখেছে, বুকের ভেতর ক্রোধ আর ঘৃণা তত বেশি পুঞ্জিভূত হয়েছে। রমিজ হাজীকে ও মারতে চায়নি। কিন্তু যখনই মনে হয়েছে ওর মতো মানুষেরাই দেশের লক্ষ কোটি মানুষের দুর্দশার জন্য দায়ী তখন সেই ঘৃণা আর ক্রোধ ওর সমস্ত অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। রমিজ হাজীকে এত জোরে মেরেছে যে জায়গা মতো লাগলে মরেই যেতো। জাফর তাকিয়ে দেখল, পূরবীর চোখ দুটো ছলছল করছে। মনে মনে বলল,

'কান্না নয় পূরবী। কান্নাকে ক্রোধে পরিণত করো।'

ফুলবাড়িয়া স্টেশনে এসে ওরা কুমিল্লার কোচ সার্ভিস পেয়ে গেল। ড্রাইভার বলল চারটার আগেই নাকি কুমিল্লায় পৌছানো যাবে। টিকেট কেটে ওরা বাসে উঠে নম্বর মিলিয়ে যে যার সিটে বসে পড়ল। একসঙ্গে সিট পাওয়া যায়নি। জাফর আর পূরবী দুটো পাশাপাশি সিটে বসল। দীপু আর রাজু বসল ওদের এক সারি পেছনে। সুটকেসটা কন্ডাক্টার ছাদে তুলে দিয়েছে।

এবারের বাসাযাত্রাও ওদের নির্বিঘ্ন হল না। ছাড়ার মিনিট দু'য়েক আগে বাসে উঠেছে সদ্য বিয়ে করা দম্পত্তি। মেয়েটির গা ভর্তি গয়না, পরনে সস্তা লাল কাতান, প্রসাধনে কিছুটা গ্রাম্যতার ছাপ। পূরবীর দিকে চোখ পড়তে কয়েক মুহূর্ত হতবাক থেকে সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে নাসরীন যে, যাচ্ছো কোথায়?'

পূরবী মেয়েটিকে ওঠার সময়ই দেখেছিল। তখন থেকেই রীতিমতো অস্বস্তি বোধ করছিল। নাম ভুলে গেছে, তবে চেহারা মনে আছে; ইডেনে একসঙ্গে পড়তো। রাজনীতির ধারে কাছেও আসত না, কিছুটা বোকা আর নিরীহ ধরনের ছিল। পূরবীর সঙ্গে খুব একটা হৃদ্যতাও ছিল না।

পূরবী শূন্য, অচেনা দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে তাকাল— 'আমাকে বলছেন?'

একটু অপ্রস্তুত হয়ে মেয়েটি বলল, 'আমি রাহেলা। তুমি ইডেনের নাসরীন না? চিনতে পারছো না আমাকে?'

পূরবী মৃদু হেসে মাথা নাড়ল— 'আপনি ভুল করছেন, আমি নাসরীন নই। কখনও ইডেনেও পড়িনি।'

বাসের কয়েকজন কৌতূহলী যাত্রী ওদের দু'জনকে দেখছিল। মেয়েটি এবার বিব্রত হয়ে বলল, 'আমি ভেবেছিলাম আপনি নাসরীন। ইডেনে আপনার মতো দেখতে নাসরীন পড়তো আমর সঙ্গে।'

'হতে পারে।' বলে পূরবী জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। ততক্ষণে বাস চলতে আরম্ভ করেছে।

মেয়েটির স্বামী আগেই বসে পড়েছিল রাজুদের পেছনের সিটে। মেয়েটি তার পাশে গিয়ে বসতেই চাপা গলায় বলল, 'কে না কে আন্দাজে হৈ চৈ বাঁধিয়ে ফেললে।'

মেয়েটি আরো চাপা গলায় বলল, 'আমার চিনতে এতটুকু ভুল হয়নি। কেন যে না চেনার ভান করল বুঝলাম না।'

স্বামীটি আগের মতো নিচু গলায় বলল, 'হয়তো এমন কিছু করেছে যে জন্যে পরিচয় দিতে চায় না।'

এরপর মেয়েটি কি বলল বোঝা গেল না। রাজু আর দীপুর মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হল। বিড়ম্বনা আর বিপদ ছায়ার মতো ওদের পায়ে পায়ে ফিরছে। দীপু ভীষণ অস্বস্তিবোধ করছিল। পূরবী আর জাফরও সমান অস্বস্তিতে ভুগছিল। তবে রাজুর চেহারা দেখে ওর মনের প্রতিক্রিয়া বোঝার উপায় নেই। শান্ত চোখে ও জানালার বাইরে ন্যাড়া ধান ক্ষেত দেখছিল।

বাসের খোলা জানালা দিয়ে পূরবীও বাইরের দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে ভাবছিল,

রাহেলা তাকে ঠিকই চিনতে পেরেছে। পরিচয় দিলেই ওর সঙ্গে কথা বলতে হত, হয়তো জাফরের সিটে বসে ওকে পেছনে পাঠিয়ে দিত। অজস্র মিথ্যে কথা বলতে হত পূরবীকে। এ ধরনের পরিস্থিতি সব সময় সে এড়িয়ে গিয়েছে। একবার সিরাজগঞ্জ যেতে ইস্টিমারে কলেজের এক পরিচিত অধ্যাপিকার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল। রাহেলার চেয়ে অনেক বেশি পরিচিত ছিলেন তিনি। পূরবী তাঁকেও বিনয়ের সঙ্গে বলেছে, তিনি ভুল করছেন। পূরবী নাসরীন সুলতানা নয়, ওর বাড়ি উল্লাপাড়া।

পূরবী জানে রাহেলার সঙ্গে আলাপ করলে পুরোনো বন্ধুদের অনেকের খবর জানা যেত। হয়তো বাড়ির খবরও বলতে পারত। কলেজে থাকতে রাহেলা কয়েকবার পূরবীদের বাড়িতে এসেছিল বই কিম্বা নোট নিতে। রাহেলার কাছে পরিচয় গোপন রাখার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, পূরবী চায় না নাসরীন সুলতানা নামে চার বছর আগে ভার্সিটিতে পড়া মেয়েটি যে এখনও বেঁচে আছে এটা কেউ জানুক। হয়তো পুরোনো দিনের পরিচিতরা একদিন দৈনিক কাগজে 'দুষ্কৃতকারী নিহত' শিরোনামযুক্ত কোন খবরে পড়বে, পুলিশ বা রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে গুলি বিনিময়ের সময় যে চরমপন্থী বা দুষ্কৃতকারীরা নিহত হয়েছে, তাদের একজনের নাম জানা গেছে নাসরীন সুলতানা। যাদের পরিচয় ও সান্নিধ্য পূরবী স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছে তাদের কেউ তার অন্য কোনো পরিচয় জানুক এটা সে চায় না। ওকে নিয়ে কেউ হা-হুতাশ করবে এটা সে মনেপ্রাণে অপছন্দ করে।

পূরবীর এ ধরনের পছন্দ অপছন্দ রাজু কখনও সমর্থন করতে পারেনি। পূরবীকে সে বলেছে, 'মধ্যবিত্তদের অনেকেই আমাদের বন্ধু হতে পারে এবং হবেও। একটা পর্যায়ে গিয়ে আমরা তাদের ভেতর থেকে প্রচুর কর্মী পাবো'। পূরবী উত্তর দিয়েছে, 'দেশের যা অবস্থা তাতে মধ্যবিত্ত হিসেবে বেশিদিন কেউ টিকতে পারবে না। বেশির ভাগ নিচে নেমে আসবে মজুরের পর্যায়ে, কিছু ওপরে উঠে যাবে। এ শ্রেণীটিকে আমি বুর্জোয়াদের চেয়ে কম ঘৃণা করি না। বুর্জোয়াদের চেনা যায়, কিন্তু এরা দু'মুখো সাপের মতো। সবাইকে সন্তুষ্ট রাখতে চায় নিজেদের অবস্থানে টিকে থাকার জন্য।' রাজু শুনে হেসেছে। পূরবীকে বিপ্লবের স্তর বুঝিয়েছে। মধ্যবিত্তের ক্ষোভের আর ব্যর্থতার উৎস অনুসন্ধান করতে বলেছে।

পূরবী যা পারে না, রাজু তা পারে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে রাজুকে কখনও বিব্রত হতে দেখেনি পূরবী। পুরোনো পরিচিতদের সঙ্গে কখনও দেখা হলে রাজু নিজের নাম লুকোনোর প্রয়োজন বোধ করে না। গোপন রাখে ওর পার্টি-জীবন আর গতিবিধি। রাজু স্বচ্ছন্দে এরকম পরিস্থিতিতে একজনকে বলে দিতে পারে খুলনায় বা চট্টগ্রামে ছোটখাট ব্যবসা করে সে, সাপ্লাইয়ের ব্যবসা, সুবিধে করতে পারছে না ইত্যাদি। পূরবীর কখনও মনে হয় এরকমই করা উচিৎ, নিজেকে তাহলে একজন স্বাভাবিক মানুষের মতো ভাবা যায়, সর্বক্ষণ ভিন্ন কোনো জগতের বাসিন্দার মতো সন্ত্রস্ত থাকতে হয় না। তবে মেয়েদের ব্যাপারে কৌতুহল সবারই একটু বেশি থাকে। যেমন রাহেলাকে পরিচয় দিলে ও একসময় নিশ্চয়ই জানতে চাইত, বিয়ে করেছে কিনা, করলে কবে, কোথায়, বর কি করে, দেওর ননদ ক'জন কিম্বা যদি না বলত, তাহলে জাফরের কথা জানতে চাইত,

আরো অনেক মেয়েলি প্রসঙ্গ আসত যা পূরবী পছন্দ করে না। হয়তো সামাজিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত থাকলে এতটা অস্বস্তি সে বোধ করত না। কিন্তু পরিস্থিতি তাকে অন্য মানুষে পরিণত করেছে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই।

কুমিল্লা যাওয়ার পথে পর পর তিনটি ফেরিতে ওদের বাস থেকে নামতে হয়েছে। পূরবী লক্ষ্য করেছে প্রতিটি ফেরিতে রাহেলার একজোড়া অনুসন্ধিৎসু চোখ ওকে সারাক্ষণ অনুসরণ করছে। পূরবীর অস্বস্তি ক্রমশ বেড়েছে। গত রাতের ট্রেনের বিড়ম্বনা আর উদ্বেগ এড়ানোর জন্য ওরা বাসে যেতে চেয়েছিল। অথচ সেই বিড়ম্বনার বোঝা এখনও বয়ে বেড়াতে হচ্ছে।

দাউদকান্দির লম্বা ফেরী পার হয়ে বাসে উঠে পূরবী কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। কুমিল্লাতে নেমেই চট্টগ্রামের বাস খুঁজে বের করে ধরতে হবে। শরীরটা অসম্ভব ক্লান্ত মনে হচ্ছে। খোলা জানালা দিয়ে আসা তুমুল বাতাসে পূরবীর চোখের পাতা ভারি হয়ে এল।

মাইলের পর মাইল ফসল শূন্য মাঠের দিকে তাকিয়ে দীপু বলল, 'বন্যার পর মনে হয় কেউ ধান লাগাতে পারেনি।'

রাজু সায় জানিয়ে বলল, 'হাল, গরু, বীজ সবই হারিয়েছে চাষীরা। পেটের দায়ে গ্রাম ছেড়েছে, চাষ করবে কে?'

দাউদকান্দি পার হওয়ার পর দীপুর একবার বাড়ির কথা মনে হল। এই জেলাতেই ওর বাড়ি। মা কিম্বা হাসিনা জানতেও পারবে না এত কাছে এসেও সে বাড়ি যায়নি। মা র শেষ চিঠিতে জেনেছিল চেয়ারম্যান রোজ এসে দীপুর খোঁজ করে। মাকে শাসিয়ে যায়। দীপুর বাবা চাকরি থেকে রিটায়ার করার পর গ্রামে এসে কিছু ভালো কাজ করেছিলেন। রাস্তা পাকা করিয়েছেন, প্রাইমারি স্কুলটাকে হাই স্কুল বানিয়েছিলেন। তাই তাঁর অবর্তমানেও চেয়ারম্যান এখনও দীপুর মাকে ভিটেছাড়া করতে পারেননি। মা মুখ বুজে ভিটে আঁকড়ে হাসিনাকে নিয়ে পড়ে আছেন দীপুর ফেরার অপেক্ষায়। মাকে অনেকদিন চিঠি লেখা হয়নি। এবার সময় পেলে লম্বা একটা চিঠি দিয়ে মাকে অবাক করে দেয়ার কথা ভাবল দীপু। কবে বাড়ি ফিরতে পারবে সে? ভাবতে গিয়ে অদ্ভুত এক শূন্যতা বুকের ভেতর মোচড় দিল।

রাজু একসময় বলল, 'এ পথে আমি আগে কখনও আসিনি।'

দীপু ম্লান হাসল— 'এই পথের প্রত্যেকটা বাঁক, প্রত্যেকটা গাছ, দোকানপাট, ঘরবাড়ি সব আমার অনেক দিনের চেনা। এ পথেই আমি সবচেয়ে বেশি যাওয়া আসা করেছি।'

দীপুর মনে হল, আগের যাওয়া আর এ যাওয়ার মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। আগে দীপু এ পথ দিয়ে যেতো তিতাসের তীরের এক গ্রামে, যেখানে মা ওর জন্য অপেক্ষার আলো জ্বেলে সময় কাটান। যেখানে আরও অপেক্ষা করে হাসিনা নামের কোমল একটি মেয়ে, দীপু ছাড়া যার অস্তিত্বে দ্বিতীয় কোনো মানুষ নেই। ছোটবেলায় ওর বাবা, মা মারা যাওয়ার পর দীপুর মায়ের কাছেই বড় হয়েছে। পার্টিতে যোগ দেয়ার প্রথম দিকে দীপুর মনে হত ওর কাজের পথে এই দু'জনই সবচেয়ে বড় বাধা। একবার

মাকে সে প্রশ্ন করেছিল, 'তোমার কি ইচ্ছে হয় না মা, তোমার বাবার মতো তোমার ছেলেও একটা কিছু করুক।' দীপুর নানা কুমিল্লা শহরে ওকালতি করতেন। আজীবন খদ্দর পরেছেন, বৃটিশ আমলে বহু বছর জেলও খেটেছিলেন। দীপুর কথা শুনে ওর মা হেসে বলেছিলেন, 'আমার দুটো ছেলে থাকলে একটাকে না হয় আমার বাবার মতো খরচের খাতায় লিখে রাখতাম।' হেসে দীপু আবার বলেছিল, 'রাজনীতি করা মানেই কি খরচের খাতায় নাম লেখা?' মা তখন গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন, 'দেশের জন্য কেউ সত্যিই যদি কেউ কিছু করতে চায়, তাহলে তাকে দরকার হলে জীবন দেয়ার জন্যও তৈরি থাকতে হয়। অন্তত আমার বাবা তাই বলতেন।' এ কথার পর দীপু ধরে নিয়েছিল মা তার পথে কখনো বাধা হবেন না।

রাজুকে দীপু বলতে যাচ্ছিল, চট্টগ্রামে যে আনিস ভাই'র বাসায় ওরা উঠবে বলে ভেবেছে সেখানে সত্যিই কি ওঠা যাবে, নাকি ঢাকার মতো অভিজ্ঞতা হবে। তাকিয়ে দেখে রাজু ঘুমিয়ে পড়েছে। সামনের সিটে পূরবীও ঘুমিয়ে পড়েছে। কেবল একটার পর একটা সিগারেট টেনে চলেছে জাফর। বাতাসে উড়ে এসে পূরবীর চুলের এক গোছা বার বার জাফরের মুখে এসে পড়ছে, আর জাফর মাঝে মাঝে সরিয়ে দিচ্ছে। পূরবীর দিকে তাকিয়ে জাফর একবার ভাবল ওর মাথাটা সোজা করে দেবে। পরে মনে হল পূরবীর ঘুম ভেঙে যেতে পারে। থাক, কিছুক্ষণ যদি ঘুমোতে পারে ঘুমিয়ে নিক। দীপুর মতো জাফরও ভাবল আনিস যদি ওদের সহজভাবে গ্রহণ না করে তাহলে রাতে হয়তো আদৌ ঘুমোবার সুযোগ হবে না। জাফর মুখে যতোই বলুক সমস্ত দুশ্চিন্তার বোঝা রাজুর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে, আসলে এভাবে তো দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় না।

বাসের ঝাঁকুনিতে ঘুমন্ত পূরবীর মাথা কাত হয়ে জাফরের কাঁধে পড়ল। বেচারা পূরবী! জাফরের মনে হল এতখানি ধকল বোধ হয় আগে কখনও পোহাতে হয়নি। একাত্তরের যুদ্ধের সময় অনেক বেশি পথ হাঁটতে হয়েছিল ঠিকই কিন্তু এখনকার মতো এত উদ্বেগ আর অনিশ্চয়তা তখন ছিল না। ওরা জানত ওদের গন্তব্য কোথায়। এখন ওদের সকল গন্তব্যে তালা ঝুলছে। গতকাল রাতেও ওরা ধরা পড়তে পারত। আইবির লোকেরা ওদের ঠিকই সনাক্ত করতে পেরেছিল। এ ধরনের পরিস্থিতিতে তড়িৎ গতিতে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। রাজু না থাকলে বহু আগেই জাফর শেষ হয়ে যেত।

সাড়ে তিনটার দিকে ধূলো উড়িয়ে ওদের বাস কুমিল্লা এসে পৌছল। যাত্রীদের কাছ থেকে তাড়াতাড়ি আসার কৃতিত্ব নিচ্ছিল ড্রাইভার। বাস থামার সঙ্গে সঙ্গে রাজু আর পূরবীর ঘুম ভেঙে গেছে। অন্য যাত্রীরা না নামা পর্যন্ত ওরা বসে রইল। রাহেলা যাওয়ার সময় অবজ্ঞার চোখে পূরবীকে একবার দেখল। অস্বস্তি গোপন করে মুখে আঁচল চেপে হাই তুলল পূরবী। জাফর ততক্ষণে ছাদের উপর থেকে ওদের সুটকেস নামিয়ে এনেছে। দীপু চট্টগ্রাম যাবার বাস খুঁজতে গেল।

বাস স্ট্যান্ডের পাশে রেস্টুরেন্টে গিয়ে চায়ের কথা বলতে না বলতেই দীপু এসে হাজির। বলল, 'চট্টগ্রামের বাস এক্ষুণি ছেড়ে যাচ্ছে। শেষ বাস। জলদি চলো।'

ওদের চা খাওয়া হল না। হন্তদন্ত হয়ে বাসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কন্ডাক্টার হুইসেল

বাজিয়ে ছাড়ার সংকেত দিল। দূরের যাত্রী বলে ওরা পেছনে বসার জায়গা পেয়েছে কাছাকাছি যারা নামবে তাদের কেউ বাক্স-প্যাটরার উপর বসেছে, কেউ দাঁড়িয়ে আছে।

ট্রেনের মতো বাসেও একই আলোচনা— জিনিষপত্রের দাম, দুর্ভিক্ষ, চোরাচালান এইসব। কুমিল্লার দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর হার সবচেয়ে কম। সম্ভবত মৃত্যুর হার কম বলেই ভিক্ষুকের সংখ্যা বেশি। চলন্ত বাসেও কয়েকজন ভিক্ষে করছে। রাহেলা বাস থেকে নামার পর ওর সাজগোজ দেখে ভিখিরীরা হামলে পড়েছিল। দুঃখের ভেতরও পূরবীর হাসি পেল। কলেজে থাকতে পড়া মানিক বন্দোপাধ্যায়ের একটি গল্পের কথা মনে পড়ল— 'কেড়ে খায়নি কেন?' এই মানুষগুলো যেদিন ভিক্ষে না চেয়ে গ্রাম থেকে লাখে লাখে শহরে ছুটে যাবে সব কিছু কেড়ে নেয়ার জন্য তখন কি হবে? বেশি দূর ভাবতে পারলো না পূরবী।

বাসের একজন যাত্রী, সম্ভবত আওয়ামী লীগের কোন পাতিনেতা হবে, পরনে পায়জামা পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবির ওপর মুজিব কোট, তার ওপর উড়নির মতো গলায় চাদর ঝোলানো। স্থূলবপু লোকটা দুজনের জায়গা দখল করে পান চিবোতে চিবোতে গল্প করছিল। আশে পাশে অনুগত কয়েকজন গোগ্রাসে সেই গল্প গিলছিল। মুখের ভেতর পানের পিকটুকু অদ্ভুত কৌশলে জমিয়ে রেখে লোকটা বলল, 'বুঝলা লাতুর বাপ, কাফনের কাপড় কিনতে কিনতেই আমি শ্যাষ হইলাম। ফকিরগুলা মরনের আর জায়গাও পায় না। সব আইসা মরে আমার এলাকায়। গত কাইলও চাইরটা মরছে ভেদবমি হইয়া।'

যাকে উদ্দেশ্য করে বলা, থুতনিতে ছাগুলে দাড়িওয়ালা টাউট ধরনের লোকটা তোষামোদের সুরে বলল, 'আপনের এলাকায় মরলে তো কাফনের কাপড় পায়। আমগো এলাকায় মরলে কাফন আর কপালে জুটে না, হিয়াল কুত্তায় কামড়াইয়া খায়। আল্লার মর্জি, যাগো কপালে কাফনের কাপড় লেখা আছে হেরা আপনের এলাকায় গিয়া মরে। আল্লার নেক বান্দারাই কাফন পায়।'

ঢক করে পানের পিক গিলে পাতিনেতা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'হ, সবই আল্লার মর্জি। আমি আমার কাফনের কাপড় গতবছর মক্কা শরিফ থনে আনছি। আমার চোখের সামনে কেউ মরলে বিনা কাফনে আমি তাগোরে কবর দিই না। এম পি সাবরে কইছিলাম রিলিফে কিছু কাফনের কাপড় দিতে। তিনি পাঠাইলেন চাইরশ মন গম। অদ্দেক গম বেইচা আমি কাফনের কাপড় কিনছি। বাকিটা দিছি যাগো একেবারে না দিলে চলে না তাগোরে। তোমরাই কও কামডা আমি ভালা করি নাই?'

লাতুর বাপ বিগলিত কণ্ঠে বলল, 'কি যে কন হুজুর! আপনের দয়াতেই আমরা চাইরটা গম পাইলাম। না ওইলে বৌ বাচ্চা নিয়ে রাস্তায় নামন লাগতো।'

বাসের মাঝখানে রাখা একটা বস্তার উপর হতশ্রী এক বুড়ি বসেছিল। লাতুর বাপের কথা শেষ না হতেই— 'আমার শামসু গেদু কই গেলিরে'— বলে বুড়ি ডুকরে কেঁদে উঠল। বাসের লোকজন হঠাৎ এরকম বুকফাটা কান্নায় চমকে উঠল। 'আমার শামসুরে, আমার গেদুরে'— বলে বুড়ি সমানে কাঁদতে লাগল।

পাতিনেতা ভুরু কুঁচকে বলল, 'এ কি জ্বালাতন বাসের মইদ্যে কওতো? বাস

আলাগো কান্ডজ্ঞান কিছু নাই?'

সঙ্গে সঙ্গে লাতুর বাপ বুড়িকে ধমক দিল— 'এই বুড়ি থাম! এত চিল্লাস ক্যান!'

ধমক খেয়ে গলা নামিয়ে বিলাপের সুরে কাঁদতে কাঁদতে বুড়ি যা বলল, তার সারমর্ম হচ্ছে— বুড়ির নাতি দুটো মরেছে কদিন আগে। কবর দেয়ার সামর্থ ছিল না বলে ওদের নদীতে ভাসিয়ে দিতে হয়েছে।

রাজুদের পাশে বসা রুক্ষ চেহারার মাঝারি বয়সের একজন, চোখে পুরু লেন্সের চশমা— বুড়িকে বললেন, 'ঠিক আছে, তুমি হুজুরের ইউনিয়নে চলে যেও, তোমার নাতির কাফন জোটেনি তো কি হয়েছে, হুজুরের দয়ায় তোমার জন্য কাফনের কাপড়ের অভাব হবে না।'

পাতিনেতা কটমট করে মন্তব্যকারীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কোন জায়গার বেয়াদপ, কথা কওন শিখে নাই।'

ভদ্রলোকের পরনে আধময়লা পায়জামা-পাঞ্জাবী, চুলগুলো রুক্ষ, দাড়ি কামানো হয়নি চার পাঁচ দিন হবে; কোটরে বসা চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছিল। পাতিনেতার দিকে সরাসরি তাকিয়ে বললেন, 'আমি ভিক্টোরিয়া কলেজে পড়াই। তোমার মত বদমাশদের হাতের কাছে পেলে শায়েস্তা করি। ফাজলামি করার জায়গা পাওনি?'

পাতিনেতা হুঙ্কার ছেড়ে বলল, 'কি! এত বড় কথা! ড্রাইভার এই লোকটারে অক্ষণি বাস থেইকা নামাইয়া দাও।'

এতক্ষণ বাসের অন্যান্য যাত্রীরা পাতিনেতার ব্যবহারে যথেষ্ট বিরক্তি বোধ করেছিল। ড্রাইভার বাসের গতি কমাতেই জাফর ধমক দিয়ে বলল, 'ড্রাইভার, বাস থামাবেন না।' তারপর পাতিনেতার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি অনেক বাড়াবাড়ি করছেন। আর একটা বাজে কথা বললে, আপনাকেই বাস থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেবো।'

বাসের যাত্রীদের ভেতর গুঞ্জন উঠল। একজন মন্তব্য করল, 'মুজিব কোট গায়ে দিলে সবাই ধরাকে সরা জ্ঞান করে।'

'তুইলা ফালাইয়া দিলেই হয়।'

'মক্কাশরীফের কাফন ওয়ালারে জিগান, দেশে এখন চাইলের সের কত?'

এমনি সব মন্তব্যে মুখর হল গোটা বাস। ড্রাইভার বাস থামাতে গিয়েও পারল না। যাত্রীরা হইচই করে উঠল। পাতিনেতা মুখ কালো করে জানালা দিয়ে ঘন ঘন পানের পিক ফেলছিল। দীপু জাফরের পাশে বসেছিল। মৃদু হেসে জাফরের হাতের উপর মৃদু চাপ দিল। জাফর অপ্রস্তুত হয়ে তাকাতে দীপু চাপা গলায় বলল, 'সবাই বীরপুরুষকে তাকিয়ে দেখছে।'

জাফর জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'বাসের ভেতর না হলে লোকটাকে আমি নির্ঘাত খুন করতাম।'

দীপু ম্লান হাসল। বাইরে তখন হেমন্তের সন্ধ্যা নেমেছে। ধান কাটা ক্ষেতে দুধের মতো সাদা কুয়াশার চাদর বিছানো। বাসের ভেতরে মিটমিটে একটা আলো জ্বলছে। পূরবী গায়ে একটা খদ্দরের চাদর জড়িয়েছে। ঘুমে চোখের পাতা ভারি হয়ে এলেও বাসের প্রবল ঝাঁকুনিতে দীপু বা জাফর কেউ ঘুমোতে পারল না। পাতিনেতা ফেনীর

পরের স্টপেজে নেমে গেছে। রাজু নিচু গলায় ভিক্টোরিয়া কলেজের রাগী অধ্যাপকের সঙ্গে কথা বলছিল।

মাঝে মাঝে পুব দিকের পাহাড়ের ফাঁক গলিয়ে বিবর্ণ পেতলের থালার মতো চাঁদ উঁকি দিচ্ছে। একটু পরে ক্ষয়াটে চাঁদটা পাহাড় থেকে পাহাড়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ওদের সঙ্গে চলতে লাগল। পূরবী পাহাড়ের গায়ে অন্ধকার জমে থাকা গাছের দিকে তাকিয়ে আগামী দিনের কথা ভাবছিল। নতুন জীবনের সন্ধানে ওরা চলেছে দক্ষিণে। জেলে পাড়ার সুঁচাদ মাঝিরা এখন কেমন আছে কে জানে! সম্ভব হলে থেকে যাবে সেখানে। রফিকরা অন্য সব শেল্টারে ওদের খোঁজ করলেও দক্ষিণের এই জেলেপাড়ার কথা জানে না।

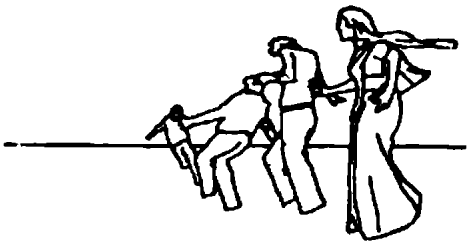

রাজু, পূরবী আর জাফরের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে মানুকে এ্যাকশনের দায়িত্ব দিয়ে রফিক চলে গেছে দার্জিলিঙ। সিএম-এর শ্রেণীশত্রু খতমের লাইন সম্পর্কে চীনের পার্টির পক্ষ থেকে চৌ এন লাই আর কাং শেঙ ভারতীয় পার্টির প্রতিনিধিকে যে মন্তব্য করেছেন তার সত্যতা যাচাই করা দরকার। ভারতের পার্টির মহাদেব মুখার্জী নাকি চৌ এন লাইদের এ ধরনের মন্তব্যের সমালোচনা করেছেন।

মানু তখন থেকে হন্যে হয়ে রাজুদের খুঁজছিল। ওরা ঢাকা আসতে পারে এটা পাবনা গিয়েই অনুমান করতে পেরেছিল। সেদিন সন্ধ্যায় সিরাজগঞ্জ হয়ে ঢাকা এসে কামালউদ্দিনের কাছে শুনলো সকালে জাফর আর পূরবী এসেছিল রহমান ভাই'র খবর জানার জন্য। ঢাকা জেলা কমিটি রাজুদের ব্যাপারে কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত না জানলেও— এটা জানতো পার্টির ভেতর রহমান ভাই ভিন্ন চিন্তা করছেন, যার প্রধান অবলম্বন হচ্ছে রাজুদের কয়েকটি এলাকা। মানু কামালউদ্দিনের জন্য রফিকের চিঠি নিয়ে এসেছিল।

চিঠি পড়ে জেলা কমিটির বয়োজ্যেষ্ঠ নেতা কামালউদ্দিন বললেন, 'ঢাকায় ওদের কোথাও শেল্টার মিলবে না। আমার মনে হয় ওরা বরিশাল কিংবা চট্টগ্রাম গেছে।'

'চট্টগ্রামে কোথায় যেতে পারে?' জেরা করার ভঙ্গিতে জানতে চাইলো মানু।

'কেন রাজুর পেয়ারের বন্ধু আনিস নামের সেই সাংবাদিকটা সেখানে আছে না। আমাদের বুড়োওতো শুনি ওখানে ওঠে।'

'বুড়োকে কোথায় পাওয়া যাবে আপনি জানেন?'

'বলা মুশকিল।' চিন্তিত মুখে কামালউদ্দিন জানালেন, 'ঢাকার সব কটা শেল্টারে আমি বলে রেখেছি, এখানে এলে খবর পেয়ে যাবো।' এই বলে হঠাৎ সতর্ক হয়ে গেলেন তিনি— 'বুড়োর ব্যাপারে এই মুহূর্তে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া কি উচিৎ হবে?'

'ক্ষেপেছেন!' সামান্য হাসির রেখা ফুটে উঠলো মানুর ঠোঁটে— 'আমরা শুধু বুড়োর বাড়তি কিছু হাত পা ছেঁটে দেবো। আপনি জেলা কমিটির মিটিঙ ডাকুন।'

কামালউদ্দিন মৃদু হেসে বললেন, 'আজ রাতেই মিটিঙ ডেকেছি। জেলার অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। বুড়ো গত মাসে পাঁচবার এসেছিল। প্রত্যেক বারই আলাদা আলাদা শেল্টারে উঠেছে। জেলা কমিটির অনেককে ডেকে নিয়ে কথা বলেছে, সে খবরও আমি পেয়েছি।'

'খবর পেয়ে এ্যাদ্দিন কেন বৈঠক ডাকেন নি?' মানু উত্তেজিত হয়ে বলল, 'বুড়ো সব জায়গায় ফ্রি স্টাইল কাজ করে বেড়াবে আর আপনারা চুপচাপ বসে থাকবেন—সর্বনাশের আর বাকি রইলো কি?'

'থামোতো, যা বোঝো না তা নিয়ে কথা বলতে এসো না। জেলার বৈঠক কখন ডাকতে হবে সেটা তোমার চেয়ে আমি ভালো বুঝি।' কামালউদ্দিন বিরক্ত বোধ করলেন মানুর কর্তৃত্বব্যঞ্জক কথায়। বুড়োকে তিনি পছন্দ করেন না পাকিস্তান আমল থেকে যখন তাঁরা প্রকাশ্য রাজনীতি করতেন। লোকে এই পার্টিকে বিশেষভাবে চেনে বুড়োর নামে। এটা তিনি পছন্দ করেন নি কোন কালে। তবে এ ব্যাপারে তাঁর সমালোচনাও বুড়ো মতিউর রহমান কখনও গ্রাহ্য করেন নি। বহু ঝগড়া হয়েছে এ নিয়ে। বিশেষ করে ভাসানীর লালটুপি সম্মেলনের কৃতিত্ব সবাই যখন মতিউর রহমানের ঘাড়ে চাপাল তখনও তিনি সমালোচনা করেছেন। সত্তরের কংগ্রেসে রহমান ইচ্ছা করলেই তাকে কেন্দ্রীয় কমিটিতে নিতে পারতেন কিন্তু নেননি পুরোনো রেষারেষির জন্যে। মানুরা এসব কথা জানে না। ওদের সঙ্গে তিনি কখনো পুরোনো প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেন না। ওরা জানে কামালউদ্দিনের সঙ্গে মতিউর রহমানের বিরোধটা মূলতঃ ব্যক্তিত্বের। তাই মতিউর রহমানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কামালউদ্দিনকে হাতে রাখা দরকার। তাঁর রগচটা স্বভাবের কথা জানে বলে মানুও তাকে বেশি ঘাঁটাতে সাহসী হল না। প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, 'আজকের মিটিঙের এজেন্ডা কি?'

'এজেন্ডা আবার আলাদা কিছু দিয়েছি নাকি! যা বরাবর হয় তাই— রাজনৈতিক, সাংগঠনিক, তহবিল, বিবিধ এইতো। ওরা যদি আগে থেকে জানতে পারে বুড়োর ব্যাপারে কথা বলবো তাহলে সাবধান হয়ে যাবে না?' কামালউদ্দিন এবার সামান্য হাসলেন।

মানু পরিস্থিতিটা আরো স্বাভাবিক করার জন্য বলল, 'ভীষণ ক্ষিদে লেগেছে ভাই। খাবার কি আছে ভাবীকে দিতে বলেন।'

কামালউদ্দিন উঠে ভেতরে গেলেন। একটু পরে কয়েকখানা আটার রুটি আর একটু ভাজি এনে দিলেন মানুকে। বললেন, 'তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। ওরা এখনি এসে পড়বে। বৈঠকে এক পেয়ালা লবণ চায়ের বেশি কিছু দিতে বললে তোমাদের ভাবী আমাকে বাড়িছাড়া করবেন।'

জেলা কমিটির বৈঠকে মানুর জন্য যথেষ্ট বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। কামালউদ্দিন অবশ্য আগে থেকে আঁচ করতে পেরেছিলেন মতিউর রহমানের ফোরাম বহির্ভূত আলোচনার প্রসঙ্গ তুললে ওঁর যে গুটিকতক অন্ধ অনুসারী আছে তারা গন্ডগোল করবে।

আগে থেকেই সতর্ক ছিলেন কোন বিরোধে তিনি যাবেন না। নিজে কোন সিদ্ধান্তও চাপিয়ে দেবেন না। ওরা সংখ্যাগরিষ্ঠ যে সিদ্ধান্ত নেয় নিক, মতিউর রহমানের সমালোচনা সিদ্ধান্তে না থাকলেও মিনিটস-এ থাকুক এটাই তিনি চেয়েছিলেন। কিন্তু শুরুতেই মানু সব গুলিয়ে ফেলল।

ভেতরের শোবার ঘরে মাদুর বিছিয়ে বসেছে সবাই। তিনি ছাড়া জেলা কমিটির বাকি আটজন সদস্যই বৈঠকে উপস্থিত হয়েছে। সবই ছাত্র, বুদ্ধিজীবী। পার্টির পরিভাষায় আক্ষরিক অর্থে কৃষক বা শ্রমিক ছাড়া বাকি সবাই বুদ্ধিজীবী, যদি তারা শহরে থাকে আর প্যান্ট-শার্ট পরে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে অনার্স দেবে সাইদ, টিপু আর ফারুক। গন্ডগোলটা বেশি করল ওরাই। বৈঠক আনুষ্ঠানিক ভাবে শুরু করার কথা বলতেই সাইদ প্রথমে হাত তুলে কিছু বলার জন্য সভাপতি কামালউদ্দিনের অনুমতি চাইল। ইতিবাচক ইঙ্গিত পেয়ে সে বলল, 'মূল এজেন্ডায় যাওয়ার আগে আমি সভাপতির কাছে একটা বিষয়ে ক্ল্যারিফিকেশন চাইবো। আমরা জানি কমরেড রহমান কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে আমাদের জেলার দায়িত্বে আছেন। কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত অমান্য করে, গঠনতন্ত্র লংঘন করে কমরেড পলাশ কিভাবে জেলার বৈঠকে উপস্থিত থাকছেন এটা আগে জানা দরকার।'

জেলা কমিটির সদস্যদের কাছে মানু পলাশ নামে পরিচিত। হাসানের সরাসরি আক্রমণে সে উত্তেজিত হয়ে বলল, 'কেন্দ্রের যে কোন সদস্য জেলার বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারেন। এর জন্য সেক্ট*-এর অনুমোদনই যথেষ্ট।

সাইদ আবার আগের মতো অনুত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'সভাপতির মাধ্যমে বলছি, কমরেড পলাশ দুটো কথা বলেছেন। যা আমাদের গঠনতন্ত্রে নেই। আমি আবারও সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, কেন্দ্রীয় কমিটির যে কোন সদস্য যে কোন জেলার বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারেন না। এটা গোপনীয়তার ব্যাপার। গোপন পার্টির জেলা কমিটির সদস্যদের জানা উচিৎ নয় কেন্দ্রে কারা আছেন। কেন্দ্রের বক্তব্য তারা নির্দিষ্ট একজন প্রতিনিধি মারফতই জানবে। আমি কমরেড সভাপতির কাছে জানতে চাই এই প্রতিনিধি বদল কেন্দ্রীয় কমিটির পরিবর্তে সেক্ট নিতে পারে কিনা এবং এ ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত তিনি লিখিতভাবে কেন্দ্র বা সেক্ট থেকে পেয়েছেন কিনা। আর কমরেড পলাশকে অনুরোধ করবো তিনি যেন বৈঠকে কথা বলার সময়ে সভাপতির মাধ্যমে কথা বলেন। কারণ এটা একটা ফর্মাল বৈঠক।'

জেলা কমিটির কনিষ্ঠতম সদস্য ফার্স্ট ইয়ারের কামরুল দ্রুত হাতে বৈঠকের ধারাবিবরণী লিখছিল। কামালউদ্দিন ওর দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বললেন, 'আমি আজ পার্টি সম্পাদকের চিঠি পেয়েছি, এখন থেকে কমরেড রহমানের বদলে কমরেড পলাশ ডিসি**তে সিসি***র প্রতিনিধিত্ব করবেন। আর আমি মনে করি সেক্ট-এ

---

* সেক্রেটারিয়েট (সম্পাদকমণ্ডলী)-এর সংক্ষেপে। কেন্দ্রীয় কমিটির উচ্চ পর্যায়ের পাঁচজন সদস্য নিয়ে গঠিত।

** ডিস্ট্রিক্ট কমিটি (জেলা কমিটি)

*** সেন্ট্রাল কমিটি (কেন্দ্রীয় কমিটি)

ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।'

কামালউদ্দিনের কথা শেষ হওয়ার পর কামরুল মাথা তুলে বলল, 'এটা কি সিদ্ধান্ত?'

কামালউদ্দিন একটু ইতস্তত করে বললেন, 'হ্যাঁ, এটা সিদ্ধান্ত হিসেবে লেখা যেতে পারে।'

ফারুক কামালউদ্দিনকে বলল, 'কমরেড সভাপতি, এটা কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত। জেলায় কেন্দ্রের প্রতিনিধিত্ব কে করবেন এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ডিসির এখতিয়ারের বাইরে বলে আমি মনে করি।'

কামালউদ্দিন বিব্রত বোধ করলেন। অন্য সবার মুখের উপর চোখ বুলিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আপনাদের সবার কি একই মত?'

সাইদ বলল, 'কমরেড ফারুক ঠিকই বলেছে। এটা আপনি রিপোর্ট করতে পারেন। কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত আমরা মেনে চলবো।'

কামালউদ্দিন কামরুলকে বললেন, 'ঠিক আছে, কোন সিদ্ধান্ত লেখার দরকার নেই।'

টিপু বলল, 'কমরেড সভাপতি, কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আমি কিছু বলতে চাই।'

কামালউদ্দিন একটু বিরক্ত হয়ে তাকালেন টিপুর দিকে। টিপু মানুর দিকে একবার তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, 'কমরেড রহমানের বদলে কেন কমরেড পলাশ আমাদের বৈঠকে সিসির প্রতিনিধিত্ব করবেন এ ব্যাপারে কেন্দ্রের ব্যাখ্যা জানতে চাই আমি।'

মানুর ভুরু দুটো কুঁচকে গেল। ধারাল গলায় বলল, 'কেন্দ্রের সিদ্ধান্তকে আপনি কি চ্যালেঞ্জ করছেন?'

'না।' টিপু মানুর চোখে চোখ রেখে শান্ত গলায় বলল, 'সভাপতির মাধ্যমে বলছি, কেন্দ্রের যে কোন সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা চাইবার অধিকার নিশ্চয়ই আমাদের আছে।'

'আমি ব্যাখ্যা দিতে বাধ্য নই। এটা কেন্দ্রের নির্দেশ।'

টিপু আগের মতো শান্ত গলায় বলল, 'আমি আপনার কাছে ব্যাখ্যা চাইছি না। কমরেড সভাপতি, আমি আপনার মাধ্যমে কেন্দ্রের কাছে এর ব্যাখ্যা চাই। উপস্থিত কমরেডরা যদি এ বিষয়ে একমত হন তাহলে এটা ডিসির সিদ্ধান্ত হিসাবে আমরা সিসিকে জানাতে পারি।'

কামালউদ্দিন একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'সব কিছুতেই আপনাদের বাড়াবাড়ি। আমার একদম ভালো লাগে না এসব কচকচি। কথায় কথায় খালি পয়েন্ট অব অর্ডার— ওকি! আপনি এগুলো মিনিট্‌স-এ লিখছেন নাকি! কেটে ফেলুন।' বিরক্তি না চেপেই কামালউদ্দিন অন্যদের প্রশ্ন করলেন, 'আপনারাও কি এই কমরেডের দলে নাকি।'

সবাই মাথা নাড়ল। সাইদ মৃদু হেসে বলল, 'কমরেড সভাপতি, কথাটা এভাবে বলা বোধহয় ঠিক হল না। দলে বলতে আপনি যদি .

কামালউদ্দিন দু'হাত জোড় করে হা হা করে উঠলেন— 'বুঝতে পারছি কমরেড,

আপনি কি বলতে চান। মাপ চাই, আমি কোন কিছু বোঝাতে চাইনি। এ নিয়ে আর কোন কথা নয়।'

কামালউদ্দিনের কথার ধরনে মানু ছাড়া সবাই হেসে উঠল। কামরুল কামালউদ্দিনের দিকে তাকাতেই তিনি ধমকের সুরে বললেন, 'আমার দিকে তাকিয়ে আছেন কেন, সিদ্ধান্ত লিখুন।'

কামরুল সিদ্ধান্ত লিখে পড়ে শোনাল। কামালউদ্দিন বললেন, 'এবার তাহলে আমরা রাজনৈতিক আলোচনা শুরু করতে পারি। আমি প্রথমে কেন্দ্রের প্রতিনিধি কমরেড পলাশকে এ বিষয়ে বলার জন্যে অনুরোধ করছি।'

কিছুদিন আগে পার্টির মুখপত্রে প্রকাশিত সম্পাদকীয়টি প্রায় হুবহু মুখস্ত বলল মানু। পার্টিতে সিএম লাইনের যথাযথ প্রয়োগ হচ্ছে না, অনেক কমরেড এখনও দৃঢ়ভাবে সিএম লাইন আঁকড়ে ধরতে পারেন নি এসব কথাও সে বলল। সব শেষে বলল, 'পার্টিতে শুদ্ধি অভিযান শুরু হয়েছে। মহান চেয়ারম্যান কমরেড মাও সেতুঙ আমাদের শিখিয়েছেন কিভাবে সংশোধনবাদী ও মধ্যপন্থীদের উৎখাত করতে হয়। তিনি যথার্থই বলেছেন, ঘৃণা করুন চূর্ণ করুন মধ্যপন্থাকে। কেন্দ্রের গত বৈঠকে রাজু, পূরবী আর জাফরকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে দু'এক দিনের ভেতরই আপনারা সার্কুলার পাবেন।'

প্রথম দিকে মানুর কথাগুলো এত একঘেঁয়ে ছিল যে সাইদরা কেউ মন দিয়ে শোনেনি। কিন্তু রাজুদের বহিষ্কারের কথা শুনে সবাই চমকে উঠল। কামরুল লেখা থামিয়ে মানুর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল, না, ভুল শোনেনি। সাইদ, টিপু, ফারুক— এরা তিনজনই পার্টিতে রাজুর রিক্রুট। রাজু ভাই আর পুরবীদি— দু'জন ওদের কাছে যুদ্ধের সময়কার রাশান উপন্যাসের নায়ক নায়িকাদের মতো। কোনো আদর্শ বিপ্লবীর উদাহরণ দেয়ার সময় ওরা এদের কথা বলে। মানুর কথা শুনে ওরা এমনই হতবিহ্বল হল যে, কয়েক মুহূর্ত কেউ কোন কথা বলতে পারল না। ফারুক স্খলিত কণ্ঠে বলল, 'রাজু ভাইদের কেন বহিষ্কার করা হয়েছে কারণ জানতে পারি?'

'সার্কুলারে সব বিস্তারিত বলা হয়েছে।' শক্ত গলায় বলল মানু।

টিপু সভয়ে জানতে চাইল, 'ওদের কি এ্যাকশন করা হয়েছে?' কথা বলার সময় ওর গলা রীতিমতো কাঁপছিল।

মানু কঠোর দৃষ্টিতে টিপুকে দেখল। তারপর থেমে থেমে বলল, 'এখনও করা হয়নি, তবে কেউ যদি এ্যাকশন করার মতো অপরাধ করে সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই তা করা হবে। আপাততঃ এর বেশি কিছু আমি বলতে চাই না।'

কামরুল কিছুটা অসহায়ের মতো কামালউদ্দিনকে প্রশ্ন করল, 'সিদ্ধান্ত লিখবো?'

মানু কামালউদ্দিনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এদের সম্পর্কে কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, পার্টির কেউ যদি এদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে তাহলে তার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়া হবে।'

মানুর কথায় সবাই এত বেশি বিচলিত বোধ করছিল— যে জন্য পরবর্তী আলোচনায় কেউ তেমন আগ্রহ দেখাল না। গৎবাঁধা কিছু রিপোর্টিং হল। মানু

রিপোর্টিং-এর উপর আলোচনা করতে গিয়ে বলল, 'আপনারা জানেন কেন্দ্রীয় কমিটির গত সার্কুলারে বলা হয়েছে চুয়াত্তরের একত্রিশে ডিসেম্বরের ভেতর কোন ডিসি যদি এ্যাকশন করতে না পারে তাহলে সেটা বাতিল করে নতুন ডি ও সি গঠন করা হবে।'

সাইদ যান্ত্রিকভাবে বলল, 'সার্কুলার পেয়ে আমরা কেন্দ্রকে জানিয়েছিলাম এখানে এ্যাকশন করার মতো অবস্থা নেই।'

মানু শীতল দৃষ্টিতে তাকাল সাইদের দিকে— 'অবস্থা তৈরি করে নিতে হয়। চুপচাপ বসে বসে কেন্দ্রের সমালোচনা করলে অবস্থা তৈরি হয়ে যাবে না।'

সাইদ আগের মতো নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল, 'আমরা কি করছি না করছি সব ডিসিতে নিয়মিত রিপোর্ট করা হয়। এখানে কেউ বসে নেই।'

কামালউদ্দিন দেখলেন, এ ধরনের আলোচনা চলতে থাকলে তাকে বাধ্য হয়েই একটা পক্ষ নিতে হবে। এই মুহূর্তে তিনি মতিউর রহমানের বিরোধিতা করলেও সরাসরি মানুদের পক্ষ নিতে চান না। কারণ তাঁর সম্পর্কে মানুদের ধারণা কি এটা তিনি ভালোভাবেই জানেন। এরপর অল্প কথায় আলোচনার সার সংকলন করে তিনি রাত দশটার ভেতরই বৈঠক শেষ করে দিলেন।

মানু ছাড়া সবাই এক এক করে বেরিয়ে গেল দু'তিন মিনিট সময়ের ব্যবধানে। কামালউদ্দিন যথেষ্ট ক্লান্তবোধ করছিলেন। হাই তুলে মানুকে বললেন, 'তুমি তো রাতে চকবাজারের শেল্টারে থাকছো?'

'থাকবো কোথাও।' এ বিষয়ে মানু কামালউদ্দিনের সঙ্গে কথা বলা নিরাপদ মনে করলো না। প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, 'এদের ভাবসাব কিন্তু সুবিধের মনে হচ্ছে না।'

কামালউদ্দিন উপেক্ষার ভঙ্গিতে বললেন, 'ওদের আমার হাতে ছেড়ে দাও। রাজুদের ব্যাপারে কি ফাইনাল ডিসিশন হয়ে গেছে?'

মানুর চোয়াল দু'টো শক্ত হয়ে গেল— 'গত সিসিতেই ওদের এ্যাকশনের সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। পার্টির এমন অনেক খবর ওরা জানে যা পার্টির বাইরের কারো জানা উচিৎ নয়।'

'কিন্তু পরিণতি কি হবে ভেবে দেখেছো? জানাজানি হলে সামলানো মুশকিল হবে।'

'সেটা আমার হাতে ছেড়ে দিন।' কামালউদ্দিনের কথাটা তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে মানু বলল, 'সি সি আমাকেই দায়িত্ব দিয়েছে। আপনি তো জানেন পার্টির কোনো নির্দেশ পালন করার ব্যাপারে আমি কখনও গাফেলতি করিনি।'

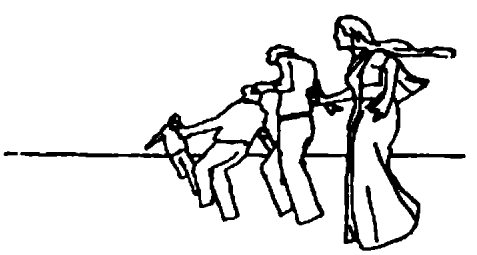

চট্টগ্রামে এসে রাজুরা যখন বাস থেকে নামল, রাত তখন সাড়ে দশটা। রাস্তাঘাট একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে। দীপু বলল, 'যা ক্ষিদে পেয়েছে, আনিস ভাই'র বাসায় যদি

ভাত খেতে পেতাম!'

জাফর হাই তুলে বলল, 'আমার মনে হচ্ছে একনাগাড়ে চব্বিশ ঘন্টা ঘুমোতে হবে।'

রাজু মৃদু হাসল— 'সবই হবে, যদি আনিসের দেখা পাই। নইলে—'

পূরবী বাধা দিয়ে বলল, 'আর ভয় দেখিয়ো না রাজু। তুমি এক্ষুণি গিয়ে দেখে এসো, আনিস ভাই বাসায় আছেন কিনা।'

ওদের তিনজনকে একটা রেস্টুরেন্টে বসিয়ে রেখে রাজু আনিসের খবর আনতে গেল। বাস স্ট্যান্ড থেকে লাভ লেন বেশি দূরে নয়। আনিসের বাবা পুলিশের চাকরি থেকে অবসর নিয়ে সেখানে বাড়ি করেছেন। আনিস ঢাকার এক দৈনিক পত্রিকার প্রতিনিধি, রাজুর সমবয়সী। এক সময় ছাত্র ইউনিয়ন করলেও পার্টিতে ঢোকেনি। তবে ওকে পার্টির একজন সক্রিয় সমর্থক বলা যেতে পারে। আনিসকে ওর বাবা পরিস্কার বলে দিয়েছেন, বিপ্লব করো আর যাই করো, বাড়িতে থেকে করতে হবে। বাড়িতে দু'একজনকে মাঝে মাঝে রাখতেও পারো, আপত্তি করবো না। কিন্তু বাড়ি ছাড়তে পারবে না।'

মিনিট পনেরো পর আনিসের বাসা থেকে হাসিমুখে ফিরে এল রাজু। বলল, 'চলো, আনিসের দেখা পেয়েছি। এক্ষুণি তোমাদের নিয়ে যেতে বলেছে। তবে রহমান ভাই'র দেখা পাওয়া যাবে না। আজ সকালেই তিনি ঢাকা গেছেন।'

জাফর হইচই করে জড়িয়ে ধরল রাজুকে— 'কতদিন পর একটা সুখবর শোনালে রাজু। রহমান ভাইকে আমরা ঠিকই ধরে ফেলবো। চলো, সবাই রিক্সায় গিয়ে সেলিব্রেট করি।'

পূরবী হাসতে হাসতে বলল, 'ঘোড়া না দেখেই খোঁড়া হয়ে গেলে নাকি!'

বহুদিন পর সবাই কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা ভুলে গেল। জাফর রিক্সায় যেতে যেতে দীপুকে বলল, 'আনিস ভাইকে তুমি আগে দেখো নি। আমাদের বিপদের সময় তিনি স্বর্গের দূতের মতো পাশে এসে দাঁড়ান। কেন যে পার্টিতে ঢুকলেন না, তাই ভাবি। কর্মীদের জন্য পারলে জান দিয়ে দেন।'

দীপু মৃদু হেসে বলল, 'কে জানে, পার্টিতে এলে আজ হয়তো আমরা পাঁচজনই এভাবে ঠিকানা ছাড়া ঘুরে মরতাম।'

জাফর একটু অপ্রতিভ হয়ে বলল, 'তা কেন হবে! তবে সবাই যে পার্টি করবে তাতো নয়। আনিস ভাইদের মতো বন্ধুরা আছে বলেই আমরা বেঁচে আছি।'

আনিস দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল। হেসে অভ্যর্থনা জানাল ওদের। দীপুর সঙ্গে হাত মেলাবার সময় বলল, 'আপনার কথা রহমান ভাই'র কাছে শুনেছি।'

ভেতরের একটা ঘরে নিয়ে সবাইকে বসাল আনিস। চেহারা দেখেই বোঝা যায় এত রাতে ওদের এভাবে আসার জন্য সে মোটেই অখুশি হয় নি। বলল, 'আপনারা হাত মুখ ধুয়ে নিন। আমি খাবার দিতে বলি।'

জাফর আবদারের গলায় বলল, 'আমি কিন্তু গোসল করবো আনিস ভাই।'

আনিস হেসে বলল, 'বাথরুমে সাবান, তোয়ালে সব আছে। আলনায় আমার লুঙ্গি

আছে।'

খেতে বসে ভাত দেখে জাফর উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল— 'কতদিন পর ভাতের চেহারা দেখলাম! দীপু, দেখা যাবে কত ভাত খেতে পারো।'

দীপু লজ্জায় লাল হয়ে বিষম খেল। আনিস সবাইকে পাতে তুলে দিচ্ছিল। আয়োজন সামান্য হলেও ওদের খাওয়া দেখে আনিসের বুকের ভেতরটা টনটন করে উঠল। দেখলেই বোঝা যায় বহুদিন ওরা ভাত খায় নি।

খেয়ে উঠে আনিস পূরবীকে বলল, 'আপনি রুবির ঘরে শোবেন। আমরা ছেলেরা সবাই এ ঘরে শোব।'

পূরবী মৃদু হেসে বলল, 'আপনারা রাত জাগবেন বুঝতে পারছি। আমার পোষাবে না। রুবি জেগে আছে তো?'

'জেগে আছে মানে? আপনি আসছেন শুনে তখন থেকে উত্তেজিত হয়ে রান্না করতে গিয়ে হাতে ফোস্কা ফুটিয়ে বসে আছে।'

'আগে বলতে হয়তো।' পূরবী স্যুটকেসটা নিয়ে ভেতরে চলে গেল।

রাজু বলল, 'চাচা কি শুয়ে পড়েছেন আনিস?'

মাথা নেড়ে সায় জানাল আনিস— 'ওঁর শরীরটা ক'দিন ধরে ভালো যাচ্ছে না। দশটার ভেতরই ঘুমিয়ে যান।'

জাফর হাই তুলল— 'আনিস ভাই'র সঙ্গে রাজুর নিশ্চয়ই অনেক কথা আছে। আমি কিন্তু ঘুমোবো। দীপুর কী অবস্থা? শোবে না?'

দীপু বলল, 'পরে শোবো।'

আনিস রাজুকে বলল, 'চলো আমরা পাশের ঘরে গিয়ে বসি। জাফর ঘুমোক।'

রাজু আর দীপুকে সঙ্গে নিয়ে আনিস ড্রইং রুমে এসে বসল। সিগারেট বের করে ওদের দিয়ে নিজেও ধরাল। রাজু বলল, 'এবার খবর বলো আনিস।'

আনিস হেসে বলল, 'খবর তো এখন তোমরা। আমার খবর সব খবরের কাগজের পাতায়। রোজ যা দেখ।'

'আমরা খবরের কাগজ দেখার সুযোগ পাই নাকি! তোমাদের খবরের কাগজে কী বেরোয় সেটাই আগে শোনাও।'

ড্রইং রুমে সেন্টার টেবিলের নিচে কয়েকটা পত্রিকা রাখা ছিলো। আনিস উপর থেকে সেদিনের দৈনিক বাংলা তুলে বললো, 'কি খবর শুনতে চাও বলো। আজকের দৈনিকে একটা ফিচার বেরিয়েছে আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলামের উপর। হেডিং হচ্ছে—'মৃত্যু দেখে দেখে ওরা পাথর হয়ে গেছে'। পুরোটা পড়বো না। আমি নিজে পড়ার সময় কিছু জায়গা আন্ডারলাইন করেছি। সেখান থেকে পড়ে শোনাচ্ছি। আঞ্জুমানের কয়েকজন কর্মচারী আর ডাক্তার বলছেন—

> . . . . মৃত্যু এখন পথে ঘাটে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। খবর পেলেই যখন লাশের সন্ধানে ছুটি, যখন তুলতে যাই লাশ, তখন প্রায়ই চোখে পড়ে তাদের জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালসার দেহ। চোখে পড়ে দারিদ্র্য, অসহায়, অভাব, পুষ্টিহীনতা আর অবহেলার ছাপ। পথের ধারে পড়ে থাকা তাদের প্রাণহীন দেহ গাড়িতে তুলতে গেলে মনটা মোচড় দিয়ে ওঠে। রাস্তা দিয়ে

যাবার সময় চোখের সামনে পড়ে এমনি হাজারো জীবন্ত কঙ্কাল। যারা আগামী কালের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। মৃত্যু তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। . . . . . .

সেদিন লালবাগের রিফিউজী হাসপাতাল থেকে দু'টো লাশ তুলতে গিয়ে নিজেকে আর সামলে রাখতে পারি নি। দু'টোই জোয়ান লাশ। না খেয়ে খেয়ে কঙ্কালসার হয়ে গিয়েছে। বলতে গেলে প্রায় বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে। উলঙ্গপ্রায় এই লাশ দু'টো তোলার সময় মনে হলো সবারই ইজ্জত আছে। বোধহয় ইজ্জত নাই শুধু তাদের— যাদের পেটে ভাত নাই। না হলে এরা এভাবে মরবে কেন? আজ আমি দশটা লাশ তুলেছি। এর মধ্যে আটটা বাচ্চার লাশ। খিলগাঁও ক্যাম্প থেকে তুলেছি দুটো বাচ্চা। এদের একটা তিন মাসের আর অন্যটা নয় মাসের। গুলি খেয়ে মরে গেলেও তারা এর চেয়ে শান্তিতে মরতো। এ মরণ দুঃসহ। . . .

মৃত্যু আর মানুষের বোধকে এখন পীড়িত করে না। এইতো গত শুক্রবারের ঘটনা। খবর পেয়ে গেছি আজিমপুর গেটে লাশ তুলতে। গিয়ে দেখি ক্ষুধার্ত বাপ সদ্যমৃত তিন বছরের ছেলের মাথার কাছে বসে নির্বিকারভাবে চিড়া চিবুচ্ছে।....

এমনি আরো অসংখ্য মৃত্যু প্রতিদিন দেখছি। আর মৃত্যুর পরে তাদের বেওয়ারিশ লাশ দাফন করে আসার সময় মনে হয় প্রতিদিন, প্রতিবার যেন নিজেকেই দাফন করছি।

দিন দিন না খেতে পেয়ে মানুষ ধুঁকে ধুঁকে মরছে অথচ কিছু করার উপায় নেই। এ দুঃসহ বেদনা সহ্য করতে পারি না। কেমন যেন বোবা বনে যাই। এইতো সেদিনের কথা। দেড় বছরের এক লাশ কোলে নিয়ে সুত্রাপুর থেকে আমাদের অফিসে এলেন এক অসহায়া মা। দাফনের মতো সঙ্গতি নেই তার। পাড়ারও কেউ এগিয়ে আসে নি সাহায্যে। বাড়ায় নি সান্ত্বনার হাত। তার কোল থেকে কেউ লাশটি পর্যন্ত নামিয়ে নিতে পারে নি। ভাবতেও অবাক লাগে মানুষের অনুভূতি এমন স্থূল হয়ে গেছে। . . . '

পড়া থামিয়ে আনিস ওদের দিকে তাকিয়ে বললো, 'এটা সরকারী পত্রিকা দৈনিক বাংলার রিপোর্ট। ইত্তেফাকে দুর্ভিক্ষের আরো ভয়াবহ খবর পাবে। রংপুরে প্রতিদিন দেড় হাজার মরছে এ খবর ইত্তেফাকেই বেরিয়েছে। দুর্ভিক্ষের খবরের পর যেটা পাবে সেটা হচ্ছে চোরাচালানীর খবর। আজকের দৈনিকেই দেখ তিনের পাতার হেডিং— ধান কাটা শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই চোরাচালানী তৎপরতা বৃদ্ধি। প্রথম পাতায় দেখ— দিনাজপুরে ১১ লাখ টাকার চোরাইমাল উদ্ধার। এরপর পাবে হত্যা, ছিনতাই, কলকারখানায় আগুন— এইসব। না রাজু, ভালো কোন খবর তোমাদের শোনাতে পারবো না।'

দীপু বলল, 'একটা খবর আনিস ভাই ভুলে গেছেন। পুলিশ আর রক্ষীবাহিনীর গুলিতে ক'জন দুষ্কৃতকারী মারা গেলো সে খবরও তো ছাপা হওয়ার কথা।'

'তাও বেরোয় বৈকি। দুষ্কৃতকারীদের হাতে আওয়ামী লীগের লোকজন মারা যাওয়ার খবরও কাগজে বেরোয়।' এই বলে আনিস মুখ টিপে হাসল— 'এ্যাকশনের রেট অনেক বেড়েছে, না?'

রাজু বিষণ্ন গলায় বলল, 'বিচ্ছিন্নভাবে দু'একজন আওয়ামী লীগের লোক মারলে সমস্যা দূর হবে কিংবা বিপ্লব এগুবে এটা আমি সঠিক বলে মেনে নিতে পারছি না আনিস।'

'এবার তাহলে আসল কথায় এসো।' আনিস কিছুটা উত্তেজিত হয়ে বলল, 'এ কথা

আমি আগেও অনেক বলেছি এখনও বলছি। গলাকাটার লাইন বাদ দিয়ে পার্টি আর পলিটিক্স নিয়ে একটু সিরিয়াসলি ভাবো। সরকারের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ চরমে গিয়ে পৌঁছেছে এটা নতুন কথা নয়। দুর্ভিক্ষ, চোরাচালান, রাজনৈতিক সন্ত্রাস সবই জানা কথা। দেশের অর্থনীতি একেবারে ভেঙে পড়েছে, দেশ এভাবে চলতে পারে না। এগুলো শুধু তোমাদের গোপন পত্রিকায় নয়, আজকাল অনেক সেমিনারে সম্মেলনেও শুনি। এ মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি দরকার ছিল একটা সঠিক বিপ্লবী পার্টি। অথচ সেটাই খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিছু মনে কোরো না রাজু। আমি তোমাদের সিম্প্যাথাইযার হতে পারি, কিন্তু তোমাদের বিরুদ্ধেও আমার অভিযোগ আছে। সব ক'টা আন্ডারগ্রাউন্ড পার্টি আধা সামন্ত না সিকি সামন্ত, জাতীয় দ্বন্দ্ব না গৃহযুদ্ধ, এ নিয়ে বাকবিতন্ডা করেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। গতকাল রহমান ভাই'র কথায় আমি বুঝতে পেরেছি তোমরা প্রধান দ্বন্দ্ব নির্ধারণ করতে গিয়ে আরেকটা ভাঙনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছো। আর কত ভাঙবে রাজু?'

রাজু ম্লান হেসে বলল, 'আমরা ভাঙছি কোথায় আনিস?' তুমি বোধ হয় জানো না আমাদের তিনজনকে শুধু বহিষ্কারই করা হয়নি, জাফর, পূরবী আর আমাকে খতমের সিদ্ধান্তও হয়ে গেছে।'

আনিস তিক্ত হেসে বলল, 'আমি জানতাম রাজু এরকম একটা কিছু হবে। সি এম লাইনের লজিকাল পরিণতি এটা। একবার ভাবো আটষট্টি, উনসত্তর, সত্তর সালে আমাদের কি প্রচন্ড শক্তি ছিল। কৃষক ফ্রন্ট, শ্রমিক ফ্রন্ট পুরো আমাদের নিয়ন্ত্রণে। ছাত্র ফ্রন্টেও কি কম শক্তিশালী ছিলাম? শাহপুরের লালটুপি সম্মেলনে তো তুমিও গেছো। উনসত্তরে গ্রামে গ্রামে গণ আদালত বসানো হয়েছিল। প্রত্যেকটা কারখানা ঘেরাও করে দাবি আদায় করার মতো অবস্থা ছিল। অথচ সি এম লাইন এসে সব কিছু কিভাবে তছনছ করে দিল! একটা পার্টি ভেঙে ছ'টা হয়েছে। আর কিছুদিন এভাবে চললে গোটা কমিউনিস্ট আন্দোলন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।'

দীপু গভীর আগ্রহ নিয়ে আনিসের কথা শুনছিল। বলল, 'আপনি শুধু সমস্যার কথা বলছেন আনিস ভাই। এর সমাধান কোথায় সেটা বলুন।'

আনিস এবার উত্তেজিত গলায় বলল, 'আমি প্রয়োগ থেকে বিচ্ছিন্ন। আমি কি সমাধান দেবো? সমাধান দেবে পার্টি। পার্টি যাঁরা পরিচালনা করেন, আপনারা যারা প্রয়োগে আছেন— তাদের কাছেই তো পথের সন্ধান চাইবো আমরা। আজ আধা ডজন পার্টি বলছে আমরাই একমাত্র বিপ্লবী পার্টি, আমাদের পতাকাতলে এসো— আর বলতে বলতেই ভেঙে খান খান হচ্ছে।'

রাজু বলল, 'সমস্যাটা সঠিকভাবে যদি উপলব্ধি করতে পারো, তাহলে বলতেই হবে সমাধানের পথে তুমি অনেকটা এগিয়ে গেছো। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই, কমিউনিস্ট আন্দোলনের অনৈক্য একটা বড় সমস্যা। ঐক্যের কথা বলার আগে আমাদের জানতে হবে অনৈক্য কেন।'

আনিস বলল, 'আমি তো মনে করি নেতৃত্বের কোন্দলই এর জন্য দায়ী। সবাই নেতা হতে চাইলে যে জনে জনে আলাদা পার্টি করতে হবে!'

মাথা নাড়ল রাজু— 'না, এতটা সরল সিদ্ধান্ত আমি মানতে পারছি না আনিস। আমি মনে করি গত পঞ্চাশ বছর ধরে যে সমস্যাটা সবচেয়ে কম আলোচিত হয়েছে, সেটা হল তত্ত্বের সমস্যা। আমাদের এখানে সঠিক কমিউনিস্ট পার্টি না থাকলেও কমিউনিস্ট আন্দোলন সবসময় ছিল। জীবন দেয়ার জন্য প্রস্তুত হাজার হাজার কর্মী আছে কিন্তু নেই সঠিক নেতৃত্ব, নেই সঠিক রাজনৈতিক লাইন, রাজনৈতিক দর্শন। দেশ হিসেবে আমরা যত না দরিদ্র, তার চেয়ে দরিদ্র আমাদের দর্শন।'

আনিস এবার হাসল— 'এতক্ষণে একটা সত্যি কথা বলেছো রাজু। এই দারিদ্র্য তোমাদের পত্রিকা আর ইশতেহারগুলো পড়লে আরো বেশি বোঝা যায়। মনে হয় বছরের পর বছর একই লেখা পড়ছি। তোমাদের লেখা পড়লে মনে হয়, বাংলাদেশে খারাপ যত কিছু হচ্ছে সব কিছুর জন্য দায়ী রুশ-ভারত। তোমাদের যে কোন লেখায় কম করে পঞ্চাশবার রুশ ভারত লেখা হয়। তর্কের প্রধান বিষয় হয় আওয়ামী লীগ সরকার রুশ-ভারতের তাবেদার, না লাঠিয়াল, না পুতুল না নির্ভরশীল— এ নিয়ে। চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান বলে তো কম গলাবাজী করোনি। অথচ দ্বন্দ্ব সম্পর্কে মাওয়ের চমৎকার লেখাটা তোমরা কেউ খুঁটিয়ে পড়োনি। মাও খুব সহজভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন— কোন দ্বন্দ্ব বিচারের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ শর্ত হচ্ছে প্রধান, বাহ্যিকটা হচ্ছে অপ্রধান। ডিমের উপমাটা মনে আছে? একটা বাচ্চা ফোটানোর জন্যে ডিমে তা দিতে হয়, পাথরে তা দিলে কোন দিন বাচ্চা বেরোবে না। তোমাদের কাছে আসল ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে বাইরে থেকে তাপ প্রয়োগটা, অথচ ডিমের বদলে যে পাথরে তা দিচ্ছো এটুকু হুঁশ কারো নেই।'

ওদের তর্কে রাত গভীর হয় কিন্তু এতটুকু ক্লান্ত বোধ করে না কেউ। তর্ক করা আনিসের স্বভাব। রাজুও এ ধরনের তর্কের মুখোমুখি হয়েছে বহুবার। অভিজ্ঞতাটা দীপুর জন্যে নতুন। উত্তেজনায় ওর চোখ দু'টো চকচক করছিল। আনিসের কথা শেষ না হতেই ও বলল, 'আপনি বলতে চাইছেন ভারত বা রাশিয়াকে শত্রু না বলে আওয়ামী লীগকে প্রধান শত্রু বলা উচিৎ। তাহলে চারু মজুমদারের গৃহযুদ্ধের লাইনের বিরোধিতা করেন কেন?'

বাধা পেয়ে আনিস একটু অধৈর্য হয়ে বললো, 'আপনি ঠিক বুঝতে পারেননি আমি কি বলতে চাইছি। রাশিয়া বা ভারতের সঙ্গে দ্বন্দ্বকে আমি অস্বীকার করছি না। দ্বন্দ্ব আমেরিকার সঙ্গেও আছে। বরং পুঁজির হিসেব করলে যে কোনো সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির ভেতর এদেশে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের লগ্নিপুঁজির অবস্থান এখনও বেশি। তবে হ্যাঁ, আওয়ামী লীগ সরকারের উপর এই মুহূর্তে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ভারত বা রাশিয়ার বেশি। কিন্তু এটা মনে রাখবেন আমেরিকা চুপচাপ বসে নেই। তার পুঁজির শোষণকে আরও বাড়াবার জন্য, রাজনীতিতে রাশিয়ার প্রাধান্য সে মেনে নেবে না। কথা হচ্ছে মূল দ্বন্দ্বটা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে হলেও আপনি কিন্তু ভারত, রাশিয়া বা আমেরিকা কাউকেই সরাসরি আক্রমণ করতে পারছেন না। যাদেরকে দিয়ে ওরা শাসন বা শোষণ করছে, আঘাতটা তাকেই করতে হবে। এবং তারা অবশ্যই একটা শ্রেণীর প্রতিনিধি। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব প্রধান হলে শ্রেণী সংগ্রাম শিকেয় তুলে রাখতে হবে একথা

আপনাকে কে বলল? এটা নিশ্চয়ই একাত্তর সাল নয়। তখন বহিঃশক্তির আক্রমণ প্রধান দ্বন্দ্ব হলেও এখন কিন্তু সে অবস্থা নেই। একাত্তরের কথা যখন উঠলো তখন আরও বলি একাত্তরের যুদ্ধের মূল্যায়ন সম্পর্কেও আপনাদের সঙ্গে আমি একমত নই। আমি মনে করি একাত্তরে আপনারা পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে না লড়ে মস্ত ভুল করেছেন। চীন বলল, এটা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার আর মুষ্টিমেয় লোক বিচ্ছিন্নতা চাইছে— আপনারাও এটাকে সত্য বলে মেনে নিয়ে মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়লেন।'

রাজু বলল, 'একাত্তরে আমাদের লাইন যে সঠিক ছিল না এ নিয়ে পার্টির ভেতরেও কথা উঠেছে আনিস। তুমি তো জানো একাত্তরে সালাম ভাইরা পার্টির কেন্দ্রীয় লাইন অগ্রাহ্য করে পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, যশোরে হক ভাইদের ছেলেরা, নোয়াখালীতে তোয়াহা ভাইদের ছেলেরাও পার্টির কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছে।'

'করেছে। তবে পরে তারা ভুলও স্বীকার করেছে।' তিক্ত গলায় আনিস বলল, 'তোমরা এখনো বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে মেনে নিতে পারোনি। এখনও তোমাদের কাগজে লেখা হয় পূর্ব বাংলা।'

দীপু বলল, 'আপনি কি বলতে চান বাংলাদেশ পুরোপুরি স্বাধীন? তাহলে জাতীয় মুক্তির কথা কেন বলেন?'

'বাংলাদেশ যদি স্বাধীন না হয় তাহলে পাকিস্তান কি স্বাধীন ছিল? যে অর্থে বাংলাদেশ স্বাধীন নয়, সে অর্থে তৃতীয় বিশ্বের কোন দেশই স্বাধীন নয়। আমি বলছি ভৌগোলিক স্বাধীনতার কথা, রাজনৈতিক মানচিত্রে বাংলাদেশ একটা নতুন স্বাধীন দেশ। বিশ্ববাসী এ সত্যকে মেনে নিয়েছে। মানেনি শুধু পাকিস্তান আর তার কিছু ঘনিষ্ঠ মিত্র। এই দেশকে বাংলাদেশই বলতে হবে। বিপ্লব তোমাদের বাংলাদেশের মাটিতেই করতে হবে, বাংলাদেশকে একটা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বানাবার জন্য। তোমরা নিশ্চয়ই বাংলাদেশকে পাকিস্তানের সঙ্গে জুড়ে দেয়ার জন্য বিপ্লব করছো না?'

আনিসের ধারাল প্রশ্নে অপ্রস্তুত হল দীপু— 'না, তা কেন হবে?' পার্টির নাম পূর্ব বাংলা কেন এটা রাজু অন্যভাবে বলেছিলো একদিন। রাজুর দিকে তাকিয়ে দীপু সমর্থন চাইল— 'রাজু, বলো না?'

রাজু মৃদু হেসে বলল, 'পার্টির কোন কোন নেতা এখনও মনে করেন পাকিস্তান ভাঙা ভুল ছিল, বাংলাদেশ রুশ ভারতের জারজ সন্তান, আমি তা মনে করি না। আমি অন্য কারণে পূর্ব বাংলা বলি। বাঙালী জাতি বলতে আমি পূর্ব আর পশ্চিম দুই বাংলার মানুষকেই বুঝি। একজন র‍্যাডক্লিফ সাহেব দুই বাঙলার মাঝখানে একটা কৃত্রিম দাগ টেনে দিয়ে বললেন— এ দুটো আলাদা দেশ, যে দাগ কারও শোবার ঘর, কারো বসার ঘর, কারো ধানক্ষেতকে দু টুকরো করে টানা হয়েছে, সেটাকে চিরকালের জন্য সত্য বলে মেনে নেয়া যায় না।'

আনিস ভুরু কুঁচকে বলল, 'তুমি যে নতুন কথা শোনাচ্ছো রাজু! একাত্তরে কোলকাতায় দেখেছিলাম কারা যেন দুই বাংলা এক করার কথা বলতো। তুমি তাদের

ফিলসফিতে বিশ্বাস করো নাকি?'

রাজু আবারও হাসল— 'ওখানে কে কি উদ্দেশ্যে বলেছে আমি জানি না। আমি দুই ভিয়েতনামে বিশ্বাস করি না, দুই কোরিয়ায় বিশ্বাস করি না, দুই বাংলায়ও বিশ্বাস করি না। তবে এটা ঠিক দুই বাংলায় বিপ্লব না হওয়া পর্যন্ত পূর্ব বাংলার আলাদা রাষ্ট্রীয় সত্তা মেনে নিতে হবে।'

'তবু বাংলাদেশ বলবে না?'

'ঠিক আছে, বলছি র‍্যাডক্লিফের বাংলাদেশ।' যেমন ছিল ইকবালের স্বপ্নে দেখা পাকিস্তান।' রাজু শব্দ করে হেসে উঠল।

আনিসও হাসল— 'ভাঙবে তবু মচকাবে না।'

উত্তপ্ত পরিবেশ কিছুটা সহজ হয়ে এলে দীপু হাসি মুখে বলল, 'আপনি এত জানেন, তবু কেন পার্টিতে আসেন না ভেবে পাই না। এ মুহূর্তে বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের অনেক কিছু করার আছে।'

আনিস হাসতে হাসতে বলল, 'আমাকে বুদ্ধিজীবী বলে লজ্জা দিও না। বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী যদি কাউকে বলতে হয় তাহলে বদরুদ্দীন উমর ছাড়া তো আর কাউকে দেখি না আমি। 'সংস্কৃতি'তে যা লিখছেন উমর স্যারের সাহসের প্রশংসা না করে পারি না। রহমান ভাই'র কাছে শুনলাম তাঁকেও নাকি এ্যাকশনের সিদ্ধান্ত হয়েছে?'

রাজু বলল, 'ঠিকই শুনেছেন। সংস্কৃতিতে চৌ এন লাই আর কাঙ শেঙের লেখা* বেরোবার পর আমাদের কমরেড রফিক এতই ক্ষিপ্ত হয়েছিল যে, ঢাকা ডিসিকে নির্দেশ দিয়েছিল তাকে খতম করার জন্য। ডিসি অবশ্য বিনয়ের সঙ্গে অক্ষমতা জানিয়ে বলেছে, বদরুদ্দীন উমরকে খতম করলে সবচেয়ে বেশি খুশি হবে বর্তমান সরকার। এতে রাষ্ট্রযন্ত্রের চোখ কানা হওয়ার বদলে নির্যাতনের হাত শক্তিশালী হবে।'

আনিস আবারও উত্তেজিত হয়ে বলল, 'আচ্ছা এদের বাস্তবজ্ঞান বলে কি ছিটেফোটাও মাথায় থাকবে না? তোমরাই বা কি! এখনও অন্ধের মতো এদের পেছনে ঘুরছো?'

রাজু হাসল— 'আর ঘোরার সুযোগ পাচ্ছি কোথায়? এখন বলা যেতে পারে ওরা আমাদের পেছনে ঘুরছে খতম করার জন্য।'

আনিস বলল, 'এখন কি করবে ভেবেছো কিছু? রহমান ভাইতো বলে গেলেন হেড কোয়ার্টারে তোপ দাগবেন।'

রাজু বলল, 'সবই হবে। তবে সবার আগে নিজেদের পায়ের নিচে শক্ত মাটি খুঁজে নিতে হবে। তারপর অন্যদের সঙ্গে ঐক্যের আলোচনা শুরু করতে হবে। সিরাজ সিকদার আলোচনার জন্য রহমান ভাইকে চিঠি দিয়েছেন। বশির ভাইদের সঙ্গেও আলোচনা শুরু হয়েছে। তুমি শুনে খুশি হবে তোমার উমর স্যারই বশির ভাইদের সঙ্গে আলোচনার ব্যবস্থা করেছেন।'

---

*চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরোর প্রভাবশালী সদস্য কাঙ-শেঙ-এর এই লেখায় চারু মজুমদারের শ্রেণীশত্রু খতমের লাইন সহ তাঁর রাজনীতির অন্যান্য কিছু দিকের মৃদু সমালোচনা ছিল। সি পি আই (এম এল)-এর একজন প্রতিনিধির কাছে তাঁরা এই সমালোচনা করেছিলেন '৭১-এর মাঝামাঝি সময়ে। এই লেখাটি 'সংস্কৃতি'তে বেরোয় '৭৪-এর শেষের দিকে।

আনিস উৎসাহিত হয়ে বলল, 'ঐক্যের আলোচনা তাহলে শুরু হয়ে গেছে? রহমান ভাই কিন্তু কিছুই বলেননি। কী দীপু, কী মনে হয় তোমার? হবে কিছু?'

দীপু হাসল— 'আপনি চুপচাপ বসে থাকবেন, এটা আমি একেবারেই মানতে পারছি না।'

'পার্টি হোক আগে। তারপর দেখো ঠিক ঠিক তোমাদের পেছনে থাকবো।'

'পেছনে নয় সামনে।' শব্দ করে হেসে উঠল দীপু। ওদের কথার ধরন দেখে রাজুও হাসল।

অনেক রাত অবধি ওরা কথা বলল। আরও তর্ক হল। শেষে কক্সবাজার যাওয়ার ব্যাপারে রাজু আনিসের মত জানতে চাইল।

আনিস বলল, 'যত পুরোনো এলাকাই হোক সবাই একসঙ্গে হুট করে গিয়ে হাজির হয়ো না। দেখে শুনে এলাকার লোকদের সঙ্গে ভালোভাবে কথা বলে তারপর যাও। রফিকরা যখন খতমের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, বলা যায় না সেখানে গিয়েও হামলা করতে পারে।'

দীপুকে হাই তুলতে দেখে আনিস বলল, 'চলো শুয়ে পড়া যাক। সকালেই তো আবার বাস ধরবে তোমরা।'

দূরে দমকল অফিসের পেটা ঘড়িতে রাত তিনটার ঘন্টা শোনা গেল। বহুদিন পর ওরা আনিসের বাসায় তুলোর তোষকের নরম বিছানায় শুয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোল।

পরদিন দুপুরে কক্সবাজার নেমে ওরা উখিয়ার বাস ধরল। সকালে আনিস বাস স্ট্যান্ডে এসে ওদের বাসে তুলে দিয়েছে। বোঝাও দুটো বাড়িয়ে দিয়েছে। জেলেপাড়ায় ঢোকার আগে ক'দিন বাইরে থাকতে হয় কে জানে। আনিস অবশ্য বলেছে অবস্থা খারাপ হলে ফিরে আসার জন্য। ও রাঙ্গামাটির ওদিকে শেল্টারের ব্যবস্থা করতে পারবে। রাজু অবশ্য পূরবীর ভরসাতেই জেলেপাড়ায় সাময়িক আস্তানা গাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পূরবী বলেছে পুরোনো লোকজন যদি থাকে তাহলে খুব একটা অসুবিধে হবে না। রাজু ভেবে দেখেছে, পায়ের নিচে মাটি খুঁজে পেতে হলে পুরোনো জায়গাই দরকার, বিশেষ করে যেখানে সি এম লাইনের প্রয়োগ হয়নি।

শেষ বিকেলে ওরা বাস থেকে উখিয়া বাজারে নেমে পুব দিকে কয়েক মাইল হাঁটল। পূরবীর হিসেব মতো ওর চেনা সেই গোপন ঘাঁটি বাজার থেকে তিন মাইলের বেশি দূরে হবে না।

পাহাড়ের ভেতর সরু পায়ে চলার পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে জাফর বলল, 'জায়গাটার লোকেশন মনে আছে তো পূরবী?

মনে কিছুটা সংশয় থাকলেও পূরবী হেসে বলল, 'থাকবে না কেন? আমার তো মনে হচ্ছে মাত্র সেদিন বিজন আর জমিরকে নিয়ে গেলাম এখান থেকে।'

লম্বা শুকনো পাহাড়ী ঘাস মাড়িয়ে হাঁটছিল ওরা। দীপু বলল, 'জায়গাটা বেশ নিরাপদ মনে হচ্ছে। কোন পুলিশ নিশ্চয়ই এর আগে এখানে আসেনি।'

জাফর রহস্যভরা গলায় বলল, 'ভবিষ্যতের কথা কেউ বলতে পারে না।'

উঁচু একটা পাহাড়ে উঠতেই ওরা দূরে লাল টকটকে সূর্যকে দেখল বিশাল আকাশ আর সমুদ্রের প্রান্ত সীমায়। পুব আকাশে নানা রঙের মেঘ। চারপাশে চেনা অচেনা অসংখ্য ঘরে ফেরা পাখির ডাক। বুক ভরে সমুদ্রের তাজা বাতাস টেনে নিয়ে জাফর বলল, 'বিপ্লবের পর এখানে একটা বাড়ি বানাবো আমি।'

দীপু হালকা গলায় বলল, 'বিপ্লবের পরও আমি থাকবে নাকি! আমরা হবে না?'

জাফর পূরবীর দিকে তাকিয়ে হাসল— 'সে ভাগ্য কি আর হবে! কী পূরবী, আর কতদূর নিয়ে যাবে এই তিন এতিমকে? তুমি ছাড়া আমরা তিনজন কিন্তু আক্ষরিক অর্থেই এতিম।'

পূরবী হেসে বলল, 'মনে হচ্ছে ভারি ফুর্তিতে আছো।'

'তুমি আর রাজু থাকতে ভয়ের কিছু আছে নাকি! কি বলো দীপু!'

দীপু মৃদু হেসে চুপ করে রইল। রাজু পূরবীকে বলল, 'সমুদ্রের কাছে এলে মানুষের মন এমনিতেই ভারমুক্ত হয়ে যায়।'

পূরবী মুখ টিপে হাসল— 'এসব বইয়ের কথা। জেলেপাড়ার সুচাঁদ খুড়োদের কষ্ট দেখলে এ কথা বলতে না।'

পাহাড়ের ওপরে যখন ওরা উঠল তখন অন্ধকার নামতে শুরু করেছে। দূরে ঝোপেঝাড়ে কুয়াশার চাদর বিছানো। পশ্চিমের আকাশে তখনও বিচিত্র বর্ণের সমারোহ। সমুদ্রের রঙিন ঢেউ আর আকাশকে ফ্রেমে বাঁধানো ছবির মতো মনে হল ওদের। পাহাড়ের একপাশে দক্ষিণমুখি একটা গুহার মতো দেখতে পেল ওরা। খুব বেশি প্রশস্ত নয়। মনে হয় কেটে বানানো। এই গুহার জন্যেই জায়গাটা একসময় গোপন ঘাটির জন্য নির্বাচন করা হয়েছিল। তবে যারা করেছিল তাদের ভেতর পূরবী ছাড়া এখন আর কেউ বেঁচে নেই।

জাফর আর দীপু রীতিমতো উত্তেজিত। কিছুক্ষণের ভেতর ওরা দুজন ছুটোছুটি করে প্রচুর শুকনো ডাল পাতা এনে জড়ো করে ফেলল। পাহাড়ে অজস্র ঝাউ আর সেগুন গাছ। বাতাসে সমুদ্রের গর্জনের পাশাপাশি বনের ভেতর থেকে চাপা হুইসেলের মতো শব্দ এলোমেলো ভেসে আসছিল। পূরবী ঝাউ গাছের কয়েকটা ডাল ভেঙে ঝাড়ন বানিয়ে ওদের নতুন আস্তানার ভেতরটা ঝেড়ে ফেলল। আর রাজু আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা করল। কক্সবাজার থেকে পাউরুটি কিনেছিল জাফর। চায়ের সঙ্গে পাউরুটি দিয়ে ওরা রাতের খাবার সারল।

আনিস ওদের সঙ্গে অনেক জিনিস দিয়েছে। ঝোলায় সাত আট দিনের মতো চাল ডাল আর আলু ছিলো। আনিসের বোন রুবি পূরবীকে ওর একখানা পুরোনো গরম শাল দিয়েছে। রাজুরা পেয়েছে আনিসের তিনটি পুরোনো সুয়েটার।

সমুদ্রের তীরে খোলা জায়গা বলেই শীত বেশি লাগছিল। জাফর আর দীপু দুজনেই আনিসের দেয়া সুয়েটার গায়ে দিয়েছে। জাফর বলল, 'এবারের শীতটা মনে হয় আরামেই কাটবে। গত বছর রংপুরে যা কষ্ট পেয়েছিলাম।'

দীপু আগুন পোহাতে পোহাতে বলল, 'সত্যি আনিস ভাই'র তুলনা হয় না।'

রাজু আনিসের আলমারি থেকে কটা বই এনেছিল। সুটকেস থেকে স্টালিনের লেখা

ফাউন্ডেশন অব লেনিনিজম বের করে মোমের আলোয় পড়তে বসল। পূরবী ডায়রী লিখছিল—

'এতদিনে উদ্বেগ কিছুটা কমেছে। আমাদের অনিশ্চিত চলার পথের সবচেয়ে বড় পাথেয় এখনও আমরা হতাশ হইনি, ভেঙে পড়িনি। সামনে অনেক কাজ। আরও বহুদূর যেতে হবে আমাদের। . . . . '

ডায়রী লেখা শেষ করে পূরবী শুয়ে পড়ল। রাজু তখনও পড়ছে। মোমবাতিটা ফুরিয়ে যাবার আগেই আরেকটা ধরিয়েছে। পূরবী বলল, 'বেশি রাত জেগো না রাজু। কাল রাতেও তুমি ঘুমোওনি।'

রাজু মুখ না তুলে মৃদু হাসল— 'তুমি তো জানো, আমার না ঘুমিয়ে থাকার অভ্যাস আছে।'

সকালে সূর্যের নির্মল আলো গুহার মুখে ছড়িয়ে পড়ল। ঘুম থেকে উঠে ওরা চারজনই কমবেশি উচ্ছ্বল হয়ে উঠল। ভোরের সূর্যের সতেজ অনুভূতি ওদের আচ্ছন্ন করে রাখল সারাদিন। পাহাড়ের নির্জনতাকে ওরা শব্দের কোলাহল দিয়ে ভরিয়ে ফেলতে চাইল। দিগন্ত বিস্তৃত বিশাল আকাশ আর সমুদ্রের সান্নিধ্যে এসে ওরা বহুদিনে জমে থাকা উদ্বেগ, সন্দেহ আর ঈর্ষার প্রচন্ড মানসিক চাপ থেকে মুক্ত হয়ে পাখির পালকের মতো সময়ের স্রোতে ভাসছিল। কিছুদিনের জন্য ওরা ভুলে গেল, ওদের প্রত্যেকের নামে মৃত্যুর পরোয়ানা ঝুলছে। চেনা মাত্র ওদের গুলি করে মারা হবে— হোক সে সরকারী কোনো বাহিনী কিংবা নিজেদের দলের কেউ।

এরই ভেতরে একদিন জাফর আর পূরবী গিয়েছিল জেলেপাড়ার খবর নিতে। গ্রামে ঢোকেনি, কাছাকাছি আর্মি ক্যাম্প বসেছে শুনে। তবু মোটামুটি খবর পেয়েছে উখিয়া বাজার থেকে। জেলেদের অনেকে কেনাবেচা করতে আসে এখানে। জাফর কৌশলে খবর নিয়েছে বুড়ো সুচাঁদ মাঝি বেঁচে আছে এবং জেলেপাড়াতেই আছে। ওর পরিচিত একজনকে দিয়ে খবর পাঠাতে সুচাঁদ এল পূরবীর সঙ্গে দেখা করতে। বহুদিন পর পূরবীকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। সুচাঁদের কাছেই এলাকার পুরো খবর পাওয়া গেল। চোরাচালান বেড়ে যাওয়ার কারণে আর্মি ক্যাম্প বসেছে কয়েকদিনের জন্য। শিগগিরই উঠে যাবে। তখন জেলেপাড়ায় নতুন করে কাজ শুরু করা যাবে। সুচাঁদ বলেছে আর্মি ক্যাম্প না ওঠা পর্যন্ত এলাকায় ঢোকা ওদের জন্য উচিৎ হবে না। সুচাঁদকে দিয়ে ওরা বাজার থেকে কিছু চাল কিনে এনেছিল।

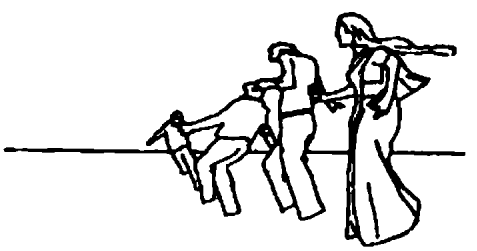

কয়েকদিন পর ওরা অনুভব করল, এভাবে বসে বসে সময় কাটানোর কোন অর্থ হয় না। সেদিন বিকেলে পাহাড়ের একটা বড়ো পাথরের ওপর বসেছিল ওরা। জাফর

কিছুটা অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল, 'এতো চুপচাপ আর ভালো লাগে না। চলো, জেলেপাড়ায় কাজ শুরু করে দিই।'

পাহাড়ের সীমাহীন নির্জনতা এ কদিনে ওদের সবাইকে কমবেশি আচ্ছন্ন করেছে। রাজু আস্তে আস্তে বলল, 'উখিয়া থেকে আর্মি ক্যাম্প না ওঠানো পর্যন্ত সেখানে যাই কি করে?'

দীপুও অধৈর্য হয়ে বলল, 'ক্যাম্পে আর কটাইবা আর্মি আছে। মেরে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিলে কেউ টেরও পাবে না।'

রাজুর কপালে বিরক্তির ভাঁজ পড়ল, 'একজন সাহেবালী মন্ডলকে মারা আর একজন আর্মিকে মারা এক কথা নয় দীপু। আত্মহত্যা করার কি কোন মানে আছে?'

'কোন কাজটা করার যে মানে আছে আমি কিছু বুঝে উঠতে পারছি না।' বিড় বিড় করে বলল জাফর।

'আমাদের বেঁচে থাকার চেয়ে বড় অর্থ আর কিছু নেই। যে কাজের দায়িত্ব আমরা কাঁধে তুলে নিয়েছি, সে কাজ শেষ করতেই হবে। কোন রকম হটকারিতার জায়গা এখানে নেই।'

রাজুর কথাগুলো দীপুর কাছে খুব যান্ত্রিক মনে হল।

চারপাশে তখন অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। নিরবতার শব্দহীন মুহূর্তগুলো ওদের চারপাশে নিঃসঙ্গতার দেয়াল গাঁথতে শুরু করছে। দূরে সমুদ্রের আবছা গর্জন ছাড়া কোথাও কোনো শব্দ নেই। রাজু একসময় পূরবীকে বলল, 'একটা গান গাইবে পূরবী?'

পূরবী মৃদু গলায় 'ও আলোর পথযাত্রী' গাইল। বহুদিনের অনভ্যাস সত্ত্বেও পূরবীর সুরেলা গলা হেমন্তের কুয়াশার মতো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। গান শুনতে শুনতে রাজুর মনে পড়ে উনসত্তর-সত্তর সালের কথা, যখন পূরবীকে ছাড়া ছাত্র ইউনিয়নের গানের অনুষ্ঠান অসম্পূর্ণ মনে হত। জাফর ফিরে যায় ওর স্বপ্নের জগতে, সেখানে পূর্ণিমার রাতে অজস্র বুনো হাঁস বিলের পানিতে উড়ে আসে। দীপুর চোখের সামনে তারার অস্পষ্ট আলোয় পূরবী হাসিনা হয়ে যায়। আর গান গাইতে গাইতে পূরবীর দুচোখে শব্দহীন কান্না নামে। অন্ধকারের জন্য কারও নজরে পড়ল না সেই কান্না।

সমুদ্রের ওপর থেকে মাঝে মাঝে ভেজা লোনা বাতাস এসে ঝাউবন কাঁপিয়ে বয়ে যাচ্ছিল। অনেক রাতে ওরা ঘুমোতে গেল। পূরবী অন্য সবার চোখের ওপর থেকে মোমবাতির শিখা আড়াল করে করে ডায়রীতে লিখল, 'আমরা কি সত্যি হারিয়ে যাবো? এভাবে কি . . . . '

ডায়রী লেখা অসমাপ্ত রেখে পূরবী ঘুমিয়ে পড়ল। শেষ রাতে দীপু স্বপ্ন দেখল— অনন্ত এক কুয়াশার সমুদ্রে সে ভাসছে। দূরে লক্ষ মানুষের মিছিল। তারপর দেখল মানুষের মিছিল নয়, অসংখ্য ইউনিফর্ম পরা সৈন্য রাইফেল উঁচিয়ে ওর দিকে এগিয়ে আসছে। দীপু পালাতে চেয়েও পারল না। ধীরে ধীরে ও কুয়াশার সমুদ্রে ডুবে যেতে লাগল। এক সময় মনে হলো ওর শরীরটা বুঝি কুয়াশায় গড়া— বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে। স্বপ্নের ঘোরে দীপু হু হু করে কেঁদে উঠল।

জাফর ওর গায়ে হাত দিয়ে ডাকল, 'দীপু, এই দীপু?'

দীপু চোখ মেলে তাকাল। জাফর আস্তে আস্তে বলল, 'অমন করে কাঁদছিলে কেন? স্বপ্ন দেখছিলে?'

দীপু কোন কথা না বলে কিছুক্ষণ জাফরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বাইরে তাকাল। পুবের আকাশ ফ্যাকাশে হয়ে এসেছে। সূর্য ওঠার বেশি দেরি নেই। জাফর বলল, 'দীপু, চলো বাইরে গিয়ে বসি।'

ওরা দুজন সন্তর্পণে বেরিয়ে এল। বাইরে ঘন কুয়াশায় সব কিছু সাদা হয়ে আছে। ওদের পাহাড়টাকে মনে হচ্ছিল কুয়াশার বিশাল সমুদ্রে ভাসমান ক্ষুদ্র এক দ্বীপের মতো। সমুদ্রের এক ঝলক তাজা বাতাস ওদের গায়ে কাঁপন ধরিয়ে বয়ে গেল ঝাউবনের দিকে। একে অপরের গা ঘেঁষে বড় পাথরের ওপর বসল ওরা। দীপু ওর পুরো স্বপ্নটা জাফরকে আস্তে আস্তে বলল।

শুনে মৃদু হাসল জাফর। কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'আমিও একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি দীপু।'

দীপু ওর দিকে তাকাল।

'দেখলাম আমি একটা বুনো হাঁস হয়ে গেছি। সঙ্গীদের সাথে পাল্লা দিয়ে উড়তে পারছি না। এক সময় আমার সঙ্গীরা হারিয়ে গেল। আমি অথৈ এক বিলের ওপর খোলা আকাশে একা উড়তে লাগলাম। হঠাৎ গুলির আওয়াজ শুনলাম। দেখলাম বাবার হাতে বন্দুক। আমার দিকে উঁচিয়ে ধরেছেন। বাবার ঠিক পাশেই পূরবী দাঁড়িয়ে। প্রাণপণে উড়তে চাইলাম। পারলাম না। ডানা দু'টো মনে হল সিসার মতো ভারি। পাক খেতে খেতে পড়ে গেলাম। বাবা তখন পূরবীকে বললেন, 'এই হাঁসটাকে খোকা সেদিন খুঁজে পায়নি। পূরবী কথা না বলে শুধু হাসল।'

দীপু কিছু না বলে চুপচাপ বসে রইল। কিছুক্ষণ পর জাফর বলল, 'দীপু, সেদিন তুমি জানতে চেয়েছিলে আমি পূরবীকে ভালোবাসি কিনা। সেদিন বলেছিলাম, ভেবে দেখিনি। কথাটা এরপর অনেক ভেবেছি। আজ মনে হচ্ছে, ওকে আমি ভালোবাসি। এতদিনে এটা আমার কাছে পরিস্কার হয়ে গেছে, আমি কখনও রাজুর মতো বিপ্লবী হতে পারবো না। পূরবীর মতো একজন মেয়ের ভালোবাসা আমার বড় বেশি প্রয়োজন।'

কিছুক্ষণ চুপ থেকে দীপু বলল, 'আমরা দু'জনই মৃত্যুর স্বপ্ন দেখছি। তবু তুমি ভালোবাসার কথা ভাবছো জাফর। আজকাল মাঝে মাঝে মনে হয়, আমরা এতো পালাচ্ছি কেন? যদি মরে যাই তাহলে কার কি ক্ষতি হয়? দু'একজন কাছের মানুষ ছাড়া কেউ কি আমাদের মনে রাখবে?' একটু থেমে দীপু আবার বলল, 'পৃথিবীটা এতো বড় জাফর, একজন দীপুর অভাবে বিপ্লব থেমে থাকবে না। তোমার মতো আমিও আমার সীমাবদ্ধতা আস্তে আস্তে বুঝতে পারছি।'

জাফর ম্লান হাসল। পুব দিকের আকাশ আরো সাদা হল। পূরবীর গলা শুনে ফিরে তাকাল। রাজু আর পূরবী ওদের দিকেই আসছে। একপাশে সরে ওদের বসার জায়গা করে দিল।

পূরবী বসতে বসতে বলল, 'মনে হচ্ছে অনেকক্ষণ তোমরা এখানে আছো?'

জাফর মাথা নেড়ে সায় জানাল।

'কি ব্যাপার, আবার কবিতা টবিতা লেখার ইচ্ছে হচ্ছে নাকি'। পূরবী তরল গলায় বলল, 'দিন দিন তুমি কেমন যেন হয়ে যাচ্ছো জাফর।'

জাফর মৃদু হেসে বলল, 'কবিতা আর কোনদিনই লিখতে পারবো না।'

পূরবীর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখল সেখানে সূর্যোদয়ের ছায়া কাঁপছে। রাজুর কানে ফিশফিশ করে পূরবী কি যেন বলতেই ওরা দু'জন একসঙ্গে হেসে উঠল। রাজু বলল, 'পূরবী কি বলছে শোন জাফর। তোমার নাকি একটা বিয়ে করা দরকার।'

পূরবীও হাসতে হাসতে বলল, 'করবে নাকি জাফর। তাহলে বলো, মালাকে চিঠি লিখি। ওর লিস্টে তুমি ছিলে এক নম্বরে। বেচারা তোমাকে পাবে না জেনে পার্টিই ছেড়ে দিল।'

জাফর দেখল, পূরবী যেন ভালো থাকার প্রতিজ্ঞা করেছে। ইচ্ছা হল চিৎকার করে বলে, 'বন্ধ করো তোমাদের গ্রাম্য রসিকতা।' রাজু হাসিমুখে জাফরের দিকে তাকালে সে চোখ নামিয়ে নিল।

দুপুরে রাজু পাহাড়ের নিচে ঝর্ণা থেকে পানি আনতে গিয়ে দেখল, জাফর ঝর্ণার শান্ত পানিতে ওর ছায়া দেখছে। শুকনো ডাল পাতার বোঝাটা একপাশে পড়ে আছে। রাজু কখন যে ওর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে জাফর টের পায়নি। একটা মরা সেগুন পাতা উড়ে এসে ঝর্ণার পানির ওপর পড়তেই জাফরের ছায়াটা ভেঙে গেল। ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস শুনল রাজু। আস্তে আস্তে ডাকল, 'জাফর।'

চমকে উঠে পেছনে তাকাল জাফর— 'তুমি কখন এসেছো?'

রাজু ওর পাশে বসে বলল, 'এখানে কি করছো?'

জাফর ম্লান হাসল— 'অনেকদিন আয়নায় মুখ দেখি না। তাই দেখছিলাম, আমি কেমন দেখতে হয়েছি।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে রাজু হেসে ফেলল— 'দাড়ি রাখাতে তোমাকে আগের চেয়ে বেশি হ্যান্ডসাম মনে হচ্ছে। পূরবী বলছিল তোমার স্বাস্থ্যও নাকি ভালো হচ্ছে।'

আগের মতো বিষণ্ন হেসে জাফর আবার চুপ করে বসে রইল। রাজু বলল, 'কি ভাবছো জাফর?'

জাফর চোখ তুলে তাকাল— 'তোমাকে একটা কথা বলবো রাজু?'

'বলো!' রাজু একটু অবাক হলো।

কিছুক্ষণ রাজুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে জাফর ধীরে ধীরে বলল, 'আমি পূরবীকে বিয়ে করতে চাই।'

রাজুর কপালের মাঝখানে কয়েকটা ভাঁজ পড়ল— 'তুমি কী বলছো জাফর? এটা কি বিয়ে করার সময় হলো?'

জাফর মুখ ফিরিয়ে ঝর্ণার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বিয়ের জন্য আমাদের পাঁজি দেখে দিনক্ষণ ঠিক করতে হবে নাকি?'

'পাঁজি দেখার কথা তোমাকে বলছি না। শুধু আমাদের অবস্থাটা ভেবে দেখতে বলছি। যে কোন মুহূর্তে যে কোন ধরনের বিপদের মুখে পড়তে হতে পারে আমাদের। বিয়েকে এতো হাল্কাভাবে নিচ্ছো কেন? পার্টিরও তো সিদ্ধান্তের ব্যাপার আছে।'

'পার্টি কোথায় যে সিদ্ধান্ত নেবো?' জাফর অসহিষ্ণু গলায় বলল, 'তাছাড়া কাদের সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা বলছো? নেতৃত্বের? রফিক ভাইদের? তুমি আশা করে আছো রহমান ভাই তোপ দাগবেন কেন্দ্রের বিরুদ্ধে। রফিক ভাইরা আত্মসমালোচনা করে আদর্শ এক বিপ্লবী লাইন নেবেন। না রাজু, তোমার মতো আশাবাদী আমি হতে পারছি না।'

শান্ত অথচ কঠোর গলায় রাজু বলল, 'তোমার ভেতর এতখানি হতাশা এসেছে, আমার জানা ছিল না জাফর। তুমি নিজেও জানো না এ হতাশা তোমাকে কোথায় নিয়ে যাবে। আজ হোক কাল হোক পার্টি শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়াবেই। এটা তুমি আমি না চাইলেও হবে।'

'পূরবীর ব্যাপারে তোমার সিদ্ধান্ত আমি জানতে চাই।'

'কি সিদ্ধান্ত চাও?'

'পূরবীকে আমি ভালোবাসি। আমি বিয়ে করতে চাই।'

'পূরবী কি কোন জড় পদার্থ, তুমি চাইলে আর আমি দিয়ে দিলাম? পূরবীর সঙ্গে তুমি কথা বলেছো? পূরবী কি জানে ওর প্রতি তোমার ভালোবাসা শুধু কমরেডের প্রতি ভালোবাসা নয়, অন্য কিছু?'

জাফর মাথা নাড়ল— 'না, জানে না।'

'তাহলে? কিভাবে তুমি ধরে নিলে পূরবীকে তুমি বিয়ে করতে চাইলেই ও রাজী হবে?'

'তোমার আপত্তি না থাকলে হবে। তুমি চাইলে পূরবী রাজী হবে। তোমার কথা ও ফেলতে পারবে না।'

রাজু কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল, 'তোমরা যদি বিয়ে করতে চাও আগে নিজেদের মধ্যে সব ব্যাপারে খোলাখুলি আলোচনা কর।'

কোনো কথা না বলে জাফর মাথা নিচু করে বসে রইল। রাজু আবার বলল, তোমার বিয়ের ব্যাপারে নিয়ে কোন নাটক করার ইচ্ছা আমার আদৌ নেই। ঠিক আছে, আমি পূরবীকে বলবো। পূরবী যদি রাজী না হয় তাহলে তোমার সিদ্ধান্ত পাল্টাতে হবে। আমি এখনও নিজেদের কমিউনিস্ট মনে করি। আমি চাই না ব্যক্তিস্বার্থকে তুমি বড় করে দেখবে। ভেবে দেখো কত বছর আমরা একসঙ্গে কাটালাম। তুচ্ছ ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রশ্নে আমরা যদি বিচ্ছিন্ন হই, এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে!' কথা বলতে বলতে শেষের দিকে রাজুর গলা ভারি হয়ে এল।

জাফর চোখ তুলে তাকাল— 'তুমি কি বলতে চাও আমি বুঝতে পারছি। আমরা সবাই দল থেকে বহিষ্কৃত। ফেরারী আসামীর মতো দিন কাটাচ্ছি। আমাদের কোন অবস্থান নেই। মানুষের কাছে যাবার কোন পথ নেই। তুমি নিজেকে এখনও কমিউনিস্ট ভেবে ধরে নিচ্ছো এটা টেম্পোরারি সেটব্যাক। আমি মনে করি আমরা একটা হারিয়ে যাওয়া জেনারেশন। কক্ষচ্যুত উল্কার মতো আমরা ছিটকে পড়েছি, ছাই হয়ে ফুরিয়ে যাবো। না, কেউ মনে রাখবে না। এ মুহূর্তে বেঁচে থাকাটাই আমার কাছে বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে।'

'জাফর!' হাহাকারের মতো শোনাল রাজুর কণ্ঠ— 'এ তুমি কি বলছো জাফর? দল থেকে আমাদের ষড়যন্ত্র করে বহিষ্কার করা হয়েছে, তাই বলে সেই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করবো না? বেঁচে থাকার কথা যদি বলো, তাহলে আমিও বলবো, আমাদের নিশ্চয়ই বেঁচে থাকতে হবে। পাশাপাশি এটাও মনে রাখতে হবে, আমরা নিশ্চয়ই ঘৃণ্য পশুর মতো বাঁচবো না। বেঁচে থাকার মহৎ উদ্দেশ্য থেকে তুমি দূরে সরে যাচ্ছো জাফর। কেন তাহলে এতদিন সব কিছু ছেড়ে, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অবিরাম কাজ করে গেছি?' একটু থেমে রাজু আবার বলল, 'আমি বুঝতে পারছি জাফর তোমার মনের অবস্থা এখন স্বাভাবিক নয়। এ ধরনের বিপর্যয়ের মুখে মাথা ঠান্ডা রেখে চলা খুবই কঠিন কাজ। তবু তোমাকে বলবো, আমাদের আদর্শের কাছে আমরা পরাজিত হতে পারি না। এই আদর্শের জন্য শত শত কমরেড জীবন দিয়েছেন। আজ যদি আমরা হাল ছেড়ে দিই, কি জবাব দেবো তাদের, যাদের আমরা পার্টিতে এনেছি, পার্টির জন্য যারা শহীদ হয়েছে? অন্তত সেই সব শহীদের মৃত্যু অমর্যাদা কোরো না জাফর। আমাদের এই বিড়ম্বিত পলাতক জীবন, পার্টির ভেতরের ষড়যন্ত্র কোনটাই শেষ কথা নয়। আমাদের পথ চেয়ে অপেক্ষা করছে দেশের লক্ষ কোটি নিরন্ন মানুষ। ওদের কথা কি আমরা একটুও ভাববো না জাফর? আমি জানি আমরা কেউই আমাদের পেটিবুর্জোয়া চিন্তাভাবনা পুরোপুরি বিসর্জন দিতে পারিনি। তাই বলে সেগুলোকে আঁকড়ে ধরে রাখার ভেতর গৌরবও কিছু নেই।'

দূরে পূরবী আর দীপুর গলার আওয়াজ শোনা গেল। কথা বলতে বলতে ওরা ঝর্ণার দিকেই আসছিল। রাজু কথা বলা বন্ধ করল। জাফর মাথা নিচু করে বসে রইল। কাছে এসে পূরবী বলল, 'কি ব্যাপার, তোমরা সারাদিন এখানে বসে থাকবে নাকি?'

রাজু বলল, 'এক্ষুণি যাচ্ছিলাম আমরা। চলো জাফর।'

জাফরের কাঁধে হাত রাখল রাজু। পূরবী বলল, 'তোমরা খেয়ে নিও। আমরা একটু পরে আসছি।'

বিকেলে পূরবী বলল, 'রাতে খাবার কিছু নেই। দীপু একবার হাট থেকে ঘুরে আসবে?'

দীপু হাটে যাবার জন্য তৈরি হল। বেরোবার সময় জাফর বলল, 'দাঁড়াও দীপু। আমিও তোমার সঙ্গে যাবো।'

রাজু মৃদু হেসে বলল— 'দেরি কোরো না।'

ওরা দু'জন বেরিয়ে যাবার পর রাজু পূরবীকে জাফরের সব কথা খুলে বলল। শুনে বেশ কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল পূরবী। তারপর আস্তে আস্তে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে রাজুকে প্রশ্ন করল, 'আমাকে তুমি কী বলতে চাও?'

একটু ইতস্তত করে রাজু বলল, 'তোমাকে গোটা পরিস্থিতিটা ভেবে দেখতে বলছি।'

আগের মতো সতর্ক গলায় পূরবী ওর প্রশ্ন পুনরাবৃত্তি করল, 'তুমি কী বলতে চাও?'

রাজু চুপ করে রইল। পূরবীর প্রশ্ন ওকে এক নির্মম সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে

দিয়েছে। রাজু যা চায় সেটা কি পূরবীকে বলা যাবে? একইভাবে পূরবী যা চায় জানা থাকা সত্ত্বেও সেটা রাজু মুখ ফুটে বলতে পারবে না। নিরবতার মুহূর্তগুলোতে ওদের দু'জনের মাঝখানে অস্বস্তির এক দেয়াল বেড়ে উঠতে থাকে। রাজু খুশি হতো যদি বলতে পারতো, 'পূরবী তুমি জাফরকে বোঝাও, এ বিয়ে হতে পারে না। তোমার ব্যক্তিত্ব দিয়ে জাফরকে প্রভাবিত করো। আমি চাই তুমি যেমন আছো তেমন থাকো, কেউ তোমাকে এককভাবে অধিকার করুক আমি তা চাই না।'— আরো অনেক কথা পূরবীকে বলতে ইচ্ছা হল রাজুর। কিন্তু পার্টি জীবনের অভিজ্ঞতা, পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাজুকে কঠিন হাতে নিয়ন্ত্রণ করল আবেগের স্রোতে ভেসে যাওয়া থেকে। না কোন রকম পেটি বুর্জোয়া ব্যক্তিকেন্দ্রিক আবেগের জায়গা নিজের ভেতর রাখবে না সে।

রাজুর মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল পূরবী। মনে হল, ওর সামনে অচেনা একজন ইউনিট প্রধান বসে আছে, যা বলবে তাই শৃঙ্খলা আর কর্তব্যের খাতিরে মেনে নিতে হবে তাকে।

রাজু তাকিয়েছিল দূরে সমুদ্রের আকাশে। নিঃসঙ্গ এক গাংচিল দলছাড়া হয়ে উড়ছিল সেখানে। ধীরে ধীরে বলল, 'জাফরকে বিয়ে করতে তোমার কোন আপত্তি আছে পূরবী?'

নিঃসঙ্গ গাংচিলের কান্না পূরবীর বুকের ভেতর হাহাকার করে উঠল। ভীষণ কষ্ট পেল পূরবী। বাইরে থেকে এতটুকু বোঝা গেল না। যন্ত্রচালিতের মতো তৃতীয়বার উচ্চারণ করল, 'তুমি কী বলতে চাও?'

সেই মুহূর্তে পূরবীকে ভীষণ নির্দয় মনে হল রাজুর। পূরবী কি ওকে একজন ইউনিট প্রধান ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না? রাজু যা বলবে পূরবী কি তাই মেনে নেবে? এটা ঠিক— পূরবী যদি একজন যথার্থ পার্টিজান হয় জাফর আর রাজুর ভেতর কোন পার্থক্য টানার প্রয়োজন সে বোধ করবে না। রাজু কি অন্য কিছু আশা করছে? সে কি পূরবীকে প্ররোচিত করবে বিচ্যুত হতে? মুহূর্তের জন্য এক টুকরো ম্লান হাসি ফুটে উঠল রাজুর ঠোঁটের ফাঁকে। না, কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হওয়া তার সাজে না। ওর প্রতি জাফরের আস্থা রয়েছে। এই আস্থা হারিয়ে গেলে জাফরকে ফেরানোর কোনো পথ খোলা থাকবে না। রাজু আবেগ সংযত করে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, 'তোমার যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে জাফরকে তুমি বিয়ে করো— আমিও তাই চাই।'

পূরবী নিজেকে আর সংযত রাখতে পারল না। তবু উচ্ছ্বাস দমন করে শান্ত, ধারাল গলায় থেমে থেমে বলল, 'কিন্তু তুমি তো জানো রাজু, কাউকে বিয়ে করলে অনেক আগেই করতে পারতাম। পার্টি যখন রফিক ভাই'র সঙ্গে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, কেন তখন প্রতিবাদ করেছিলাম, সেটাও তোমার অজানা নয়।'

রাজু একবার পূরবীর মুখের দিকে তাকাল। চাপা ক্ষোভ আর উত্তেজনার সঙ্গে শেষ বিকেলের রোদের লালচে আভা ওর চোখে আগুনের মতো দাউ দাউ করে জ্বলছে।

—'আমি তোমাকে তখনও বলেছিলাম পূরবী, আমাকে বিয়ে করে তুমি সুখী হতে পারবে না।'

'হ্যাঁ বলেছিলে।' পূরবীর কণ্ঠেও আগুনের উত্তাপ— 'তখনও তোমাকে আমি বলেছিলাম আমার কাছে সুখের সংজ্ঞা অন্য সব মেয়ের মতো নয়। তোমার ধারণা জাফর সুদর্শন, সুপুরুষ, আমাকে ভালোবাসে— এজন্যে ওকে বিয়ে করলে আমি সুখী হবো? দেহের প্রয়োজন ছাড়া মানুষের কাছে সুখের অন্য কোন অস্তিত্ব কি থাকতে পারে না? তুমি একজন পার্টিজান হয়ে এ কোন সুখের সন্ধান দিচ্ছো রাজু? আমি আবারও বলছি, বিয়ে যদি আমাকে করতেই হয়, তোমাকে নয় কেন?'

'জাফর একজন প্রচন্ড সম্ভাবনাময় কর্মী। অত্যন্ত ভালো কমরেড। ওকে আমরা পার্টির স্বার্থেই এভাবে হারাতে পারি না।'

'আমার সঙ্গে বিয়ে না হলে ও ভালো কমরেড থাকবে না, এটা কি ধরনের কথা হলো?'

'তুমি আমাকে যেমন জানো, জাফরকেও তো ভালোভাবে জানো পূরবী। বিয়ের সামাজিক সংজ্ঞায় আমি বিশ্বাস করি না, কিন্তু জাফর করে। জাফরের প্রচন্ড ক্ষমতার পাশাপাশি কতগুলো সীমাবদ্ধতা আছে। ওর ভেতরে যে আগুন জ্বলছে, সেটাকে যদি ঠিকমতো কাজে লাগানো না যায় ও শেষ হয়ে যাবে। তুমি একাত্তরের কথা ভাবো পূরবী। কিভাবে গোটা পার্টিকে ও রক্ষা করেছিল মনে নেই? তখন যেমন তুমি ওর পাশে ছিলে, আজ ওর এই বিপদের সময়ও আমি চাই তুমি ওর পাশে থাকো। ও অসুস্থ পূরবী, তুমি কি ওকে সাহায্য করবে না?'

পূরবীর দুই চোখে কান্না জমতে লাগল। রাজু আবার বলল, 'রফিক ভাই আর জাফর এক নয় পূরবী।'

চোখের ভেতর কান্না ধরে রেখে পূরবী বলল, 'তুমি আমাদের ইউনিট প্রধান রাজু। জাফরের চেয়ে তোমার পাশেই আমি বেশি থাকতে চাই রাজু। তোমার সিদ্ধান্ত তুমি জাফরকে জানিয়ে দিও।'

নিজেকে আর সামলাতে পারল না পূরবী। শব্দহীন কান্নায় মোমের মতো গলে যেতে লাগল। নিজেকে অস্তগামী সূর্যের মতো ক্লান্ত, বিষাদগ্রস্ত মনে হল রাজুর। পূরবী দুই হাটুর মাঝে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদছিল। একটু ইতস্তত করে মাথায় হাত রাখল রাজু। আস্তে আস্তে বলল, 'তুমি তো জানো, তোমার ব্যাপারে আমি কখনও পক্ষপাত শূন্য হতে পারিনি। এর জন্য আমাকে সমালোচনাও শুনতে হয়েছে। তুমি আগে যেমন ছিলে তেমনই থাকবে আমার কাছে। আমাদের সামনে অনেক কাজ পূরবী। তোমাকে হারাবার ক্ষতি আমি সইতে পারবো না। সব কিছু সহজ আর স্বাভাবিকভাবে নেয়ার চেষ্টা করো পূরবী।'

পূরবী মাথা তুলল। সামনে বিষণ্ন লাল সূর্যকে হারিয়ে যেতে দেখল সমুদ্রের দিগন্তসীমায়। কান্নাভেজা গলায় বলল, 'তোমার কথা আমি মনে রাখবো।'

দক্ষিণের আকাশে কালো মেঘের সমারোহ দেখতে পেল রাজু। মাঝে মাঝে দমকা বাতাস বইছিল ঝাউবন এলোমেলো করে। মনে মনে বলল, 'ঝড় আসবে।'

ভাটার টানে সমুদ্র অনেক দূরে চলে গেছে। বহুদূর পর্যন্ত ধূ ধূ বেলাভূমিতে কুয়াশার মতো অন্ধকার জমছে। সন্ধ্যার সেই নির্জন মুহূর্তে রাজু আর পূরবী দু'জনই

দিয়েছে। রাজু যা চায় সেটা কি পূরবীকে বলা যাবে? একইভাবে পূরবী যা চায় জানা থাকা সত্ত্বেও সেটা রাজু মুখ ফুটে বলতে পারবে না। নিরবতার মুহূর্তগুলোতে ওদের দু'জনের মাঝখানে অস্বস্তির এক দেয়াল বেড়ে উঠতে থাকে। রাজু খুশি হতো যদি বলতে পারতো, 'পূরবী তুমি জাফরকে বোঝাও, এ বিয়ে হতে পারে না। তোমার ব্যক্তিত্ব দিয়ে জাফরকে প্রভাবিত করো। আমি চাই তুমি যেমন আছো তেমন থাকো, কেউ তোমাকে এককভাবে অধিকার করুক আমি তা চাই না।'— আরো অনেক কথা পূরবীকে বলতে ইচ্ছা হল রাজুর। কিন্তু পার্টি জীবনের অভিজ্ঞতা, পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাজুকে কঠিন হাতে নিয়ন্ত্রণ করল আবেগের স্রোতে ভেসে যাওয়া থেকে। না কোন রকম পেটি বুর্জোয়া ব্যক্তিকেন্দ্রিক আবেগের জায়গা নিজের ভেতর রাখবে না সে।

রাজুর মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল পূরবী। মনে হল, ওর সামনে অচেনা একজন ইউনিট প্রধান বসে আছে, যা বলবে তাই শৃঙ্খলা আর কর্তব্যের খাতিরে মেনে নিতে হবে তাকে।

রাজু তাকিয়েছিল দূরে সমুদ্রের আকাশে। নিঃসঙ্গ এক গাংচিল দলছাড়া হয়ে উড়ছিল সেখানে। ধীরে ধীরে বলল, 'জাফরকে বিয়ে করতে তোমার কোন আপত্তি আছে পূরবী?'

নিঃসঙ্গ গাংচিলের কান্না পূরবীর বুকের ভেতর হাহাকার করে উঠল। ভীষণ কষ্ট পেল পূরবী। বাইরে থেকে এতটুকু বোঝা গেল না। যন্ত্রচালিতের মতো তৃতীয়বার উচ্চারণ করল, 'তুমি কী বলতে চাও?'

সেই মুহূর্তে পূরবীকে ভীষণ নির্দয় মনে হল রাজুর। পূরবী কি ওকে একজন ইউনিট প্রধান ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না? রাজু যা বলবে পূরবী কি তাই মেনে নেবে? এটা ঠিক— পূরবী যদি একজন যথার্থ পার্টিজান হয় জাফর আর রাজুর ভেতর কোন পার্থক্য টানার প্রয়োজন সে বোধ করবে না। রাজু কি অন্য কিছু আশা করছে? সে কি পূরবীকে প্ররোচিত করবে বিচ্যুত হতে? মুহূর্তের জন্য এক টুকরো ম্লান হাসি ফুটে উঠল রাজুর ঠোঁটের ফাঁকে। না, কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হওয়া তার সাজে না। ওর প্রতি জাফরের আস্থা রয়েছে। এই আস্থা হারিয়ে গেলে জাফরকে ফেরানোর কোনো পথ খোলা থাকবে না। রাজু আবেগ সংযত করে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, 'তোমার যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে জাফরকে তুমি বিয়ে করো— আমিও তাই চাই।'

পূরবী নিজেকে আর সংযত রাখতে পারল না। তবু উচ্ছ্বাস দমন করে শান্ত, ধারাল গলায় থেমে থেমে বলল, 'কিন্তু তুমি তো জানো রাজু, কাউকে বিয়ে করলে অনেক আগেই করতে পারতাম। পার্টি যখন রফিক ভাই'র সঙ্গে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, কেন তখন প্রতিবাদ করেছিলাম, সেটাও তোমার অজানা নয়।'

রাজু একবার পূরবীর মুখের দিকে তাকাল। চাপা ক্ষোভ আর উত্তেজনার সঙ্গে শেষ বিকেলের রোদের লালচে আভা ওর চোখে আগুনের মতো দাউ দাউ করে জ্বলছে।

—'আমি তোমাকে তখনও বলেছিলাম পূরবী, আমাকে বিয়ে করে তুমি সুখী হতে পারবে না।'

'হ্যাঁ বলেছিলে।' পূরবীর কণ্ঠেও আগুনের উত্তাপ— 'তখনও তোমাকে আমি বলেছিলাম আমার কাছে সুখের সংজ্ঞা অন্য সব মেয়ের মতো নয়। তোমার ধারণা জাফর সুদর্শন, সুপুরুষ, আমাকে ভালোবাসে— এজন্যে ওকে বিয়ে করলে আমি সুখী হবো? দেহের প্রয়োজন ছাড়া মানুষের কাছে সুখের অন্য কোন অস্তিত্ব কি থাকতে পারে না? তুমি একজন পার্টিজান হয়ে এ কোন সুখের সন্ধান দিচ্ছো রাজু? আমি আবারও বলছি, বিয়ে যদি আমাকে করতেই হয়, তোমাকে নয় কেন?'

'জাফর একজন প্রচন্ড সম্ভাবনাময় কর্মী। অত্যন্ত ভালো কমরেড। ওকে আমরা পার্টির স্বার্থেই এভাবে হারাতে পারি না।'

'আমার সঙ্গে বিয়ে না হলে ও ভালো কমরেড থাকবে না, এটা কি ধরনের কথা হলো?'

'তুমি আমাকে যেমন জানো, জাফরকেও তো ভালোভাবে জানো পূরবী। বিয়ের সামাজিক সংজ্ঞায় আমি বিশ্বাস করি না, কিন্তু জাফর করে। জাফরের প্রচন্ড ক্ষমতার পাশাপাশি কতগুলো সীমাবদ্ধতা আছে। ওর ভেতরে যে আগুন জ্বলছে, সেটাকে যদি ঠিকমতো কাজে লাগানো না যায় ও শেষ হয়ে যাবে। তুমি একাত্তরের কথা ভাবো পূরবী। কিভাবে গোটা পার্টিকে ও রক্ষা করেছিল মনে নেই? তখন যেমন তুমি ওর পাশে ছিলে, আজ ওর এই বিপদের সময়ও আমি চাই তুমি ওর পাশে থাকো। ও অসুস্থ পূরবী, তুমি কি ওকে সাহায্য করবে না?'

পূরবীর দুই চোখে কান্না জমতে লাগল। রাজু আবার বলল, 'রফিক ভাই আর জাফর এক নয় পূরবী।'

চোখের ভেতর কান্না ধরে রেখে পূরবী বলল, 'তুমি আমাদের ইউনিট প্রধান রাজু। জাফরের চেয়ে তোমার পাশেই আমি বেশি থাকতে চাই রাজু। তোমার সিদ্ধান্ত তুমি জাফরকে জানিয়ে দিও।'

নিজেকে আর সামলাতে পারল না পূরবী। শব্দহীন কান্নায় মোমের মতো গলে যেতে লাগল। নিজেকে অস্তগামী সূর্যের মতো ক্লান্ত, বিষাদগ্রস্ত মনে হল রাজুর। পূরবী দুই হাটুর মাঝে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদছিল। একটু ইতস্তত করে মাথায় হাত রাখল রাজু। আস্তে আস্তে বলল, 'তুমি তো জানো, তোমার ব্যাপারে আমি কখনও পক্ষপাত শূন্য হতে পারিনি। এর জন্য আমাকে সমালোচনাও শুনতে হয়েছে। তুমি আগে যেমন ছিলে তেমনই থাকবে আমার কাছে। আমাদের সামনে অনেক কাজ পূরবী। তোমাকে হারাবার ক্ষতি আমি সইতে পারবো না। সব কিছু সহজ আর স্বাভাবিকভাবে নেয়ার চেষ্টা করো পূরবী।'

পূরবী মাথা তুলল। সামনে বিষণ্ন লাল সূর্যকে হারিয়ে যেতে দেখল সমুদ্রের দিগন্তসীমায়। কান্নাভেজা গলায় বলল, 'তোমার কথা আমি মনে রাখবো।'

দক্ষিণের আকাশে কালো মেঘের সমারোহ দেখতে পেল রাজু। মাঝে মাঝে দমকা বাতাস বইছিল ঝাউবন এলোমেলো করে। মনে মনে বলল, 'ঝড় আসবে।'

ভাটার টানে সমুদ্র অনেক দূরে চলে গেছে। বহুদূর পর্যন্ত ধূ ধূ বেলাভূমিতে কুয়াশার মতো অন্ধকার জমছে। সন্ধ্যার সেই নির্জন মুহূর্তে রাজু আর পূরবী দু'জনই

নিজেদের ভীষণ অসহায় আর নিঃসঙ্গ বোধ করল। কেউ কোন কথা না বলে পাহাড়ের মাথায় একটুকরো পাথরের উপর বসে রইল।

সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পর জাফর আর দীপু ফিরে এল। পূরবী তখন চা বানাবার জন্য আগুন ধরাচ্ছিল। দীপু ওর পাশে এসে বসল— 'ঠিক সময়ই এসেছি, কি বলো পূরবী?'

পূরবী ম্লান হাসল। রাজু বলল, 'একটু দেরি করেছো। ফেরার কথা ছিল সন্ধ্যের আগে।'

'অকারণে দেরি করিনি কমরেড। জেলেপাড়ার সুচাঁদ মাঝি আর তার ছেলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ওরা এসেছিল জাল বিক্রি করতে। বলল, কালই নাকি আসতো ওরা। আর্মি ক্যাম্প সরিয়ে নিয়েছে। এবার আমরা জেলেপাড়ায় গিয়ে থাকতে পারি।'

জাফর বলল, 'জেলেদের অবস্থা যে কোন পর্যায়ে গেছে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। জাল বিক্রি করার কথা বলতে গিয়ে বুড়ো হাউমাউ করে কাঁদলো, কৃষকরা যেভাবে জমি হারিয়ে কাঁদে।'

রাজু বলল, 'জাল আর পানি ছাড়া জেলেদের আছে কি! অথচ দুটোই এখন মহাজনের দখলে।'

দীপু একটু উত্তেজিত গলায় বলল, 'চলো, কাল থেকেই আমরা কাজ শুরু করে দিই। সুচাঁদ মাঝিকে তাই বলে এসেছি।'

পূরবী নিঃশব্দে ওদের চা পরিবেশন করাল। ওর চেহারা দেখে বোঝার কোন উপায় নেই ভেতরে কি প্রচন্ড ঝড় বইছে। রাজু পূরবীর মুখের দিকে একবার তাকাল। আগুনের শিখার লালচে আভা কাঁপছে সেখানে। একটু ইতস্তত করে রাজু বলল, 'কাজে নামার আগে ছোট আরেকটা কাজ সেরে ফেলতে চাই।' একটু থেমে জাফর আর পূরবীকে দেখল। জাফরের চোখে প্রশ্ন, পূরবী নির্বিকার বসে আছে— চায়ের পেয়ালা হাতে ধরা, দৃষ্টি আগুনের দিকে।

রাজু মৃদু হেসে বলল, 'জাফর আর পূরবীর বিয়ের পর্বটা সেরে ফেলতে চাই।'

দীপু বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল— 'বিয়ে? জাফর আর পূরবীর বিয়ে এখন হবে? এখানে?'

রাজু আগের মতো হেসে বলল, 'কেন, অসুবিধে কি? আমাদের বিয়ের জন্যে যে মোল্লা ডাকার দরকার হয় না, তুমি জানো নিশ্চয়ই।'

'না আমি তা বলছি না। ঠিক বোঝাতে পারছি না। মানে এ সময় বিয়ে !' দীপু স্খলিত কণ্ঠে কথাগুলো বলল।

রাজু দীপুর দিকে তাকিয়ে নরম হাসল। জাফরকে কাছে ডাকল। পূরবী আর জাফরের দুটো হাত নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে শান্ত, অকম্পিত কণ্ঠে বলল, 'আজ থেকে তোমরা দুজন স্বামী স্ত্রী। দুজন আরো ভালো কমরেড হবে, আমরা এটাই আশা করবো।'

রাজু অনুভব করল, পূরবী কাঁপছে। বুকের ভেতর বিকেলে দেখা নিঃসঙ্গ গাংচিলের আর্তকণ্ঠ শুনল। আস্তে আস্তে বলল, 'তোমাদের দুজনকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি।'

দীপু রাজুর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। রাজু ওর দিকে তাকাতেই অপ্রস্তুত হয়ে গেল। রাজুর সঙ্গে সঙ্গে সেও বলল, 'আমিও তোমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি কমরেড।'

জাফর অস্ফুট কণ্ঠে বলল, 'ধন্যবাদ।'

ঠিক এভাবেই জাফর আর পূরবীর বিয়ে হল। রাজু হেসে বলল, 'যাও জাফর, বাজার তো করেই এনেছো। এবার দুজনে মিলে আমাদের খাবারের ব্যবস্থা করো।'

পূরবী কোন কথা না বলে উঠে গেল। জাফর বলল, 'তুমি কিভাবে কাজ শুরু করতে চাইছো?'

রাজু বলল, 'দীপুকে নিয়ে আমি ঢাকা যাবো। রহমান ভাই'র সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। যত শিগগির সম্ভব কংগ্রেস ডাকতে হবে। দেরি করার সময় নেই। দরকার হলে আমাদের পুরোনো এলাকাগুলোতেও যেতে হবে। রফিক ভাইদের সঙ্গে রাজনীতি দিয়েই বোঝাপড়া করতে হবে। তোমরা আরেকটু দেখে শুনে জেলেপাড়ায় যাও। লোক পাঠিয়ে আর্মি ক্যাম্পের ভাবসাব বোঝার চেষ্টা করো। ওরা কি শুধু চোরাচালানী খুঁজছে না আর কিছু খুঁজছে জানা দরকার। এদিকে শুনেছি এস এসদেরও কাজ আছে।'

জাফর কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'তোমরা কবে যেতে চাও?'

'কালই যাবো ভাবছি। ফিরতে দেরি হতে পারে। তোমরা তোমাদের কাজ শুরু করে দাও। কোন ঝামেলা হলে আনিস ভাইকে যদি খবর নাও পাঠাতে পারো, সুচাঁদ বুড়োকে দিয়ে এখানে ম্যাসেজ পাঠিয়ে দিও। আমরা এখানেই ফিরে আসবো। তারপর জেলেপাড়া যাবো।'

জাফর উঠে গেল রান্নার কাজে পূরবীকে সাহায্য করার জন্য। দীপুর তখনও ঘোর কাটেনি। রাজু বলল, 'কী দীপু, তুমি এতো চুপচাপ কেন?' কিছু বলছো না যে?'

দীপু আস্তে আস্তে বলল, 'জাফর আর পূরবীর বিয়েটা তো আরও পরেও হতে পারতো। রহমান ভাইকে অন্তত জানানো উচিৎ ছিল।'

রাজু বিব্রত হল— 'ঠিকই আছে দীপু। রহমান ভাইকে বুঝিয়ে বললে তিনি আপত্তি করবেন না। কালই তো যাচ্ছি তাঁর কাছে।'

দীপু মাথা নাড়ল— 'আমি আপত্তির কথা বলছি না। এত তাড়াহুড়ো না করলেও তো চলতো।'

রাজু ম্লান হাসল— 'আজ আমার সঙ্গে জাফরের অনেক কথা হয়েছে। জাফর কিছুতেই দেরি করতে চাইল না। তুমি তো ওকে চেনো দীপু।'

দীপু মাথা নেড়ে সায় জানাল। রাজুকে আরও অনেক কথা বলতে চাইছিল সে। পরে ভাবল এখন থাক। রাজুর বুকের ভেতর যে ঝড় বইছে বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও কিছুটা সে অনুভব করতে পারছিল। রাজুর জন্য গভীর সমবেদনায় দীপুর মনটা ভরে গেল।

রাতে খেয়ে উঠে দীপু ঘুমিয়ে পড়ল। পূরবী মোমবাতির সামনে ডায়রী নিয়ে বসল। রাজু আর জাফর তখন বাইরে বসেছিল। দক্ষিণের সমুদ্র থেকে তখন অবিরাম ঝড়ো বাতাস বইছে। জাফর একটার পর একটা সিগারেট টেনে চলেছে। এক সময় বলল, 'পূরবী কি আপত্তি করেছিল রাজু?'

রাজু বলল, 'পূরবীর ম্যাচিউরিটি সম্পর্কে তোমার কি কোনো সন্দেহ আছে?'

'না, তা নয়।' অপ্রতিভ হয়ে জাফর বলল, 'আমি জানতে চাইছিলাম, পূরবী কি আমাকে স্বামী হিসেবে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করবে?'

'পূরবী তোমার ভালো চায় জাফর।'

একটু ইতস্তত করে জাফর বলল, 'দুপুরে তোমার সঙ্গে দুর্ব্যবহারের জন্য আমি লজ্জিত রাজু।'

রাজু মৃদু হাসল— 'ঠিক আছে জাফর। তোমার ওপর আমার বিশ্বাস আছে। যাও শুয়ে পড়ো। আমি একটু পরে যাচ্ছি।'

সিগারেট ফেলে জাফর উঠে পড়ল। ভেতরে গিয়ে দেখল, ডায়রী খোলা রেখে পূরবী ঘুমিয়ে পড়েছে। মোমবাতিটা গলে গলে শেষ হয়ে এসেছে। পূরবীর পাশে বসে ডায়রীটা তুলে নিল জাফর। একটা শব্দও লেখেনি পূরবী। সামনে উল্টে দেখল, ছোট ছোট অক্ষরে পাতা বোঝাই হয়ে আছে। ম্লান হেসে জাফর ডায়রীটা ভাঁজ করে রাখল। মোমবাতির শেষ শিখাটুকু কয়েকবার দপ দপ করে জ্বলে উঠতে চেয়ে নিভে গেল। জাফর সাবধানে পূরবীর পাশে শুয়ে পড়ল।

একটা পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে রাজু সারারাত বাইরে বসেছিল। শেষ রাতে পূরবী অনেকগুলো দুঃস্বপ্ন দেখল। একবার দেখল প্রচন্ড ঝড়ের সমুদ্রে খাবি খেতে খেতে ডুবে যাচ্ছে সে। একবার দেখল, কারো তাড়া খেয়ে ভীষণ উঁচু পাহাড় থেকে নিজেকে পড়ে যেতে। জেগে উঠে দেখল, জাফরের একটা হাত আলতোভাবে ওর গলা জড়িয়ে রেখেছে। সন্তর্পণে হাতটা একপাশে সরিয়ে পূরবী উঠে বসল। একপাশে একটা ছোট্ট ছেলের মতো উপুড় হয়ে ঘুমোচ্ছে দীপু। কোন শব্দ না করে পূরবী বেরিয়ে এল।

রাজু যেখানে বসেছিল সেখানেই ঘুমিয়ে পড়েছে। গায়ে শুধু একটা চাদর জড়ানো। ঘন কুয়াশা চারদিকে। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে রাজুকে দেখল পূরবী। তারপর ডাকল— 'রাজু।'

রাজু চোখ মেলে তাকাল। পূরবী শান্ত গলায় বলল, 'ভেতরে গিয়ে ঘুমোও।'

রাজু কথা না বলে উঠে গেল। পূরবী ওর জায়গাটায় বসল। চারপাশে সিগারেটের অনেকগুলো পোড়া টুকরো ছড়ানো। ভোর হতে খুব বেশি দেরি নেই। রাজুর কথা ভাবছিল পূরবী। ওকে সে কথা দিয়েছে সব কিছু স্বাভাবিকভাবে নেবে। অনেক আগে একবার রাজু বলেছিল, কোন ব্যাপারে নাটকীয়তা সে পছন্দ করে না। সব কিছু সহজ ও স্বাভাবিকভাবে নিতে হবে। রাজু নিজে কি পেরেছে স্বাভাবিকভাবে নিতে? নেয়া কি সম্ভব? অনেক ভেবে পূরবী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল, রাজুকে সে এখনও সম্পূর্ণ বুঝে উঠতে পারেনি। বিশেষ করে ওর চাওয়া পাওয়ার ব্যাপারে। পূরবী যখন পার্টিতে আসেনি তখনও রাজুকে মনে হতো ওর চারপাশে অদৃশ্য এক ব্যবধানের দেয়াল রয়েছে, যে দেয়াল পেরিয়ে কেউ ওর বেশি কাছে আসুক এটা সে চায় না। আজও নিজেকে সেই দেয়ালের আড়ালে রেখে দিয়েছে রাজু। এ দেয়াল ভাঙার ক্ষমতা পূরবীরও নেই।

অন্ধকার কিছুটা ফ্যাকাশে হয়ে এলেও সূর্যের মুখ দেখা গেল না। সারা আকাশ মেঘে ঢাকা। পূরবী উঠে আগুন ধরাবার আয়োজন করল। একটু পরে জাফর বেরিয়ে

এল। পূরবীর পাশে বসে বলল, 'এতো ভোরে না উঠলেই পারতে।'

পূরবীর চোখে ধোঁয়া লেগেছিল। চোখ কচলাতে কচলাতে বলল, 'রাজুরা ভোরেই বেরোবে বলেছে।'

জাফর বলল, 'রাজু একটু ঘুমোক পূরবী। মনে হয় সারারাত ও জেগেছিল।'

পূরবী নিরবে ফুঁ দিয়ে ভেজা কাঠে আগুন ধরাবার চেষ্টা করতে করতে দু'চোখ লাল করে ফেলল। জাফর বলল, 'তুমি সরে বসো। আমি আগুন ধরিয়ে দিচ্ছি।'

কিছুক্ষণ চেষ্টার পর জাফর আগুন ধরাল। পূরবী চাল আর ডালের ভেতর কয়েকটা আলু দিয়ে চুলোর ওপর হাড়ি বসিয়ে দিল।

জাফর সহজ গলায় বলল, 'ভাগ্যিস আনিস ভাই তোমার হেঁসেল গুছিয়ে দিয়েছিল। নইলে উপোস মরতে হতো।'

পূরবী কোন কথা না বলে সামান্য হাসল।

দীপু ঘুম থেকে উঠে রাজুকে জাগাল। বাইরে এসে দেখল জাফর আর পূরবী চুলোর ধারে বসে চা খাচ্ছে। দীপু হালকা গলায় বলল, 'কর্তা গিন্নির রাতে ঘুম হয়নি নাকি? এতো তাড়াতাড়ি উঠেছো যে?'

পূরবী বলল, 'বেলা কম হয়নি দীপু। নটা বাজে। জলদি তৈরি হয়ে নাও।'

রাজু কোন কথা না বলে গামছা কাঁধে পাহাড়ের নীচে ঝর্ণার দিকে চলে গেল। দীপুও ওর সঙ্গে গেল। পূরবী উঠে একটা কাপড়ের ঝোলা ব্যাগে ওদের জিনিসপত্র গুছিয়ে দিল।

খাওয়া সেরে রাজু আর দীপু বেরিয়ে পড়ল। দীপু যাওয়ার আগে পূরবীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে বলল, 'গুড লাক পূরবী'। রাজু মৃদু হেসে বলল, 'আসি পূরবী। ভালো থেকো।'

জবাবে পূরবী শুধু হাসল। জাফর ওদের ঝর্ণা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেল।

রাজুদের বিদায় জানিয়ে ঝর্ণার পাশ দিয়ে একা ফেরার সময় জাফর পূরবীর ব্যাপারটা আবার নুতন করে ভাবল। ফিরে এসে ওকে সরাসরি প্রশ্ন করল, 'এ বিয়েতে তুমি মত দাওনি কেন পূরবী?'

পূরবী মৃদু হাসল— 'আমার অমতে তুমি আমাকে বিয়ে করতে পারতে না জাফর।'

'রাজু বলেছে বলেই তুমি মত দিয়েছো। রাজুকে তুমি আমার কাছে ছোট করতে চাওনি।'

পূরবী একটু গম্ভীর হয়ে বলল, 'রাজুর মহত্ত্বকে আমি চিরকালই শ্রদ্ধা করে এসেছি। ও আন্তরিকভাবেই তোমার ভালো চায়। ওকে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতে গেলে ভুল করবে জাফর।'

'তুমি কি আমার ভালো চাও পূরবী?'

'চাই।' জাফরের চোখের দিকে তাকিয়ে পূরবী বলল, 'মেয়ে হিসেবে আমি খুবই সাধারণ একজন। বরং এ ব্যাপারে আমার অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। আমি চাই আমার মতো সামান্য এক মেয়ের চেয়ে পার্টির দায়িত্ব তোমার কাছে বড় হবে। তোমার সকল কাজে আমাকে তোমার পাশে পাবে জাফর। এ বিষয়কে তুমি কোন চ্যালেঞ্জ হিসেবে

নিও না। ধরে নাও এটা একটা রুটিন ব্যাপার। খুবই সাধারণ ব্যাপার।'

জাফর ধীরে ধীরে বলল, 'আমি তোমাকে সত্যিই ভালোবাসি পূরবী। প্রচন্ডভাবে ভালোবাসি। আর সে জন্যেই তোমাকে আরও কাছে পেতে চেয়েছি।'

'ভালো আমিও বাসি তোমাকে। তবে ভালোবাসা বলতে যদি আমার এই শরীরটাকে বোঝাও তাহলে ভুল করবে জাফর। আবিষ্কারের নেশা ফুরিয়ে গেলেই আমাকে তোমার একঘেঁয়ে মনে হবে। আমি তোমাকে কোন বৈচিত্রের সন্ধান দিতে পারবো না। কারণ সেক্স-এর ব্যাপারে আমার কোন ফ্যান্টাসি নেই। তোমাকে আমি ভালোবাসি একজন পার্টিজান হিসেবে, ভালোবাসি তোমার সম্ভাবনাকে, ভালোবাসি তোমার সাহসকে। আমি তোমার ক্ষমতায় বিশ্বাস করি। আমার এ বিশ্বাস তুমি নষ্ট কোরো না।'

'আমার কোন কাজে কি তোমার মনে সন্দেহ জেগেছে পূরবী?'

'না, তবে ভয় হয় তোমার ক্ষণিকের উত্তেজনাকে। তবু আমি তোমাকে বিশ্বাস করি।'

জাফর মৃদু হাসল, 'তুমি সবাইকে সুখী করতে পারবে পূরবী। তোমার সমকক্ষ হতে অনেক সময় লাগবে আমার।'

পূরবীও মৃদু হেসে বলল, 'আমি বলবো রাজুর মতো হওয়া উচিৎ আমাদের।'

জাফর হাসি থামিয়ে বলল, 'রাজু আমাকে বহুবার নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছে পূরবী, এ কথা আমি কোনদিন ভুলবো না।'

বিকেলে পূরবী আর জাফর জেলেপাড়ায় গেল খবর নেয়ার জন্য। উখিয়ার দক্ষিণে সমুদ্রের তীরে জেলেদের এই বসতি বেশি পুরোনো নয়। সুচাঁদ মাঝি, মনাদাস আর হারাধনরা পঞ্চাশের দাঙ্গায় নোয়াখালী ছেড়েছে। এই অঞ্চলে হারাধনের শ্বশুর বাড়ির সুবাদে একজন দু'জন করে ওরা এসে জড়ো হয়েছে— শুধু নিরাপত্তার কারণেই নয়, জায়গাটা মাছ ধরার স্বর্গ বলে। বছর দশেকের ভেতর ছোট ছোট কয়েকটি গ্রাম নিয়ে রীতিমতো জনপদ গড়ে উঠেছে। বছর খানেক হলো বিদেশী এক মাছধরা ট্রলার কোম্পানীর উৎপাত শুরু হয়েছে এখানে। মাঝে মাঝে সরকারী লোকজন আসে জরিপ করতে। জিওলজি ডিপার্টমেন্টের লোকজনরাও মাটি পাথর পরীক্ষা করে, বলে নাকি তেল পাওয়া যাবে সমুদ্রে। জেলেরা অবশ্য এতে খুব বেশি বিচলিত নয়। ওদের ভয় ট্রলার কোম্পানীকে। ট্রলারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মাছ ধরতে পারে না ওরা। তাছাড়া সময় অসময় না বুঝে জাল ফেলে বলে মাছের ডিম ছাড়ার কতগুলো বিশেষ এলাকা ওরা নষ্ট করে দিয়েছে। বুড়ো সুচাঁদ মাঝি বলে, ওদের উখিয়ায় থাকার দিন শেষ হয়ে এসেছে। জীবনের ওপর হামলা থেকে কোন রকমে বেঁচে এলেও জীবিকার ওপর হামলা থেকে বুঝি রেহাই নেই।

পূরবীকে দেখে সুচাঁদ মাঝির বুড়ি বিধবা বোন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল— 'এ্যাদ্দিনে নি আঙ্গো কতা মনে হইড়লো, ও ভাল মাইনষের ঝি, কোনায় আছিলা তোমরা? তোমাগো খবর ভালা নি?' — এইসব বলে তারাপিসি ওকে জড়িয়ে ধরে হাউ মাউ কান্না— 'মারে, এ্যাদ্দিনে কি দেইখতা আইছ। আঙ্গো কি হেই দিন আছে নি!'

চোখের পলকে সুচাঁদ বুড়োর উঠোনে ভিড় জমে গেলো। মুখে মুখে ছড়িয়ে গেল— 'হুরবীদি আইছে।'

জেলেপাড়ার মানুষদের আন্তরিকতা দেখে জাফর অভিভূত হয়ে গেল। পরনে কাপড় বলতে কিছু নেই— সামান্য লজ্জা নিবারনের চেষ্টা মাত্র, চেহারায় অভাব অনটনের ছাপ, খড়ের ছাউনি দেয়া খড়ি আর বেড়ার ঘরগুলোরও জীর্ণদশা, তবু ওরা ব্যস্ত হয়ে উঠল ওদের আপ্যায়নের জন্য। জাফরের দিকে তারাপিসির নজর পড়তেই পূরবীকে জিজ্ঞেস করল, 'অ হুরবী, ইয়া কন? জামাই না কমরেড?'

পূরবী হেসে বলল, 'দুইটাই।'

'ওমা, তুঁই আগে কইতান? অ সাবি, একখান হিঁড়া দে না, আঙ্গো জামাই বইঅক।'

ছোট একটা মেয়ে দু'টো পিড়ি এনে ওদের বসতে দিল। পূরবীরা বসার পর সবাই চারপাশে গোল হয়ে বসল। পূরবী বলল, 'আমাদের কথা পরে বলছি। সুচাঁদ খুড়া, আগে আপনি বলেন আপনাদের অবস্থা কি।'

পূরবী এই এলাকায় প্রথম এসেছিল উনসত্তর সালে। তখন কয়েক গ্রাম মিলে জেলে সমিতি করেছিল একটা। তারপর আরও কয়েকবার এসেছে। শেষে এলাকার দায়িত্ব এখানকার ছেলে বিজনের হাতে ছেড়ে দিয়েছিল— যে বিজন পরে এ্যাকশনে গিয়ে শহীদ হয়।

সুচাঁদ বুড়ো অবস্থা বলতে গিয়ে যা বলল তার সারমর্ম হচ্ছে, বিজন মারা যাবার পরপরই এলাকায় পুলিশের হামলা হয়। গ্রামসুদ্ধ সবাইকে ওরা বেধড়ক পিটিয়েছে। তারাপিসির ছেলেটাকে পিটিয়েই মেরে ফেলেছে। ওর ছ'মাসের পোয়াতি বউটারও পেট খসে পড়ল। মনাদাসের তিনটি জোয়ান ছেলেকে থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে তিনদিন পর আধমরা করে ফেরত পাঠিয়েছে। পঁচা এখনো খুড়িয়ে হাটে। কালার একটা হাত শুকিয়ে শিস হয়ে গেছে।

তারাপিসির ছেলেটার কথা মনে পড়ল পূরবীর। চকচকে স্বাস্থ্য, গ্রামের সবচেয়ে উজ্জ্বল যুবকটি প্রথম থেকেই পার্টির একজন সক্রিয় কর্মী ছিল। ওর বিয়ের খবর পেয়েছিল বিজনের কাছে। বিজন মারা যাওয়ার পর যোগাযোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কারণ ততদিন সি এম লাইনের কঠোরতম গোপনীয়তা বজায় রাখতে গিয়ে নিজের কাছে নিজেই হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

ছেলের প্রসঙ্গ উঠতেই তারাপিসি ডুকরে কেঁদে উঠল— 'অ হুরবী, আঁর হুতগারে যদি তুঁই লগে করি লই যাইতা!'

পূরবীর চোখেও কান্না নামল, 'সঙ্গে নিয়ে কি বাঁচাতে পারতাম পিসি? বিজনকে তো পারিনি।'

বিজনের কথা শুনে ওর বিধবা মা, এদের মধ্যে একমাত্র তার অবস্থাই জমি থাকার কারণে কিছুটা ভালো— ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। পূরবী বিজনের ছোট ভাই'র কথা জিজ্ঞেস করল। সুচাঁদ বুড়ো জানাল— সে নাকি কক্সবাজার কোন ব্যাংকে চাকরি করে। কয়েক গ্রামের মধ্যে বিজনই একমাত্র ছেলে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকেছিল।

মনাদাসের বড় ছেলে ধলাই বলল— আর্মিরা চোরাচালান ধরার জন্য এলেও এলাকার লোকজনদের কাছে গোপন অস্ত্রের সন্ধান চাইছে। ধনাইকে বলেছে খবর দিতে পারলে টাকা দেবে।

পূরবী বলল, 'নয়ন মন্ডলের খবর কি? আগের মতো উৎপাত করে, না ভালো হয়ে গেছে?'

সুচাঁদ বলল, 'কি যে কও মা। কুত্তার ল্যাজ সাত বছর চুঙ্গার ভিতরে রাইখলেও কি সোজা অয় নি! থানা কও, হুলিশ কও, মিলিটারী কও, হ্যাতে আছে সবখানে। ব্যাকের লগে হ্যাতের খাতির। হ্যাতে অন দশখান নৌকা আর চারইখান জালের মালিক। আগে মাছ নিতো অদ্দেক। অন নেয় তিনের দুই ভাগ। কিছু করনের উফায় নাই।'

গ্রামের অবস্থা নিয়ে ওরা আরো কিছুক্ষণ কথা বলল। সুচাঁদ বলছিল সেদিনই ওদের চলে আসতে। মাথা নাড়ল তারাপিসি— 'না, ধলাই আরও খবর আনক। আঁই কাইল মন্ডলগো বাড়িত যাই হুইনছি মিলিটারিরগো ক্যাম্ফ দু'একদিনের ভিতরে তুলি লই যাইবো। হুরবী মা, তোমরাতো থাইকবা বরাবরের লাই। তোমরা কাছে থাইকলে মনে বল হাই। ক্যাম্ফ থাইকতে আইলে মন্ডলে যদি খবর হায়, মেলেটারী ডাকি আইনবো।'

জাফর বলতে গেলে দু'একটা শব্দ ছাড়া ওদের কথা কিছুই বুঝতে পারছিল না। পূরবী ওকে সব বুঝিয়ে বলল। ওরা বলছিল, পার্টি থাকলে ওরা সাহস পায়। পার্টিই ওদের শক্তি। আগে যখন পার্টি ছিল মহাজন পেতো তিন ভাগের একভাগ। পার্টি চলে যাওয়ার পর সেটা প্রথমে হয়েছে অর্ধেক, তারপর হয়েছে উল্টো তেভাগা। ওরা মনে করে পূরবীরাই পার্টি— ওরা বরাবরের মতো থেকে যাক এখানে। খুঁদকুড়ো যা আছে তাই ভাগাভাগি করে খাবে। ওরা থাকলে জেলেদের অবস্থাওতো ভালো হবে!

জাফর ওদের কথা শুনতে শুনতে রীতিমতো উদ্দীপ্ত হল। গতকালও নিজেকে মনে হয়েছিল, সব কিছু থেকে বাতিল হয়ে যাওয়া একজন অপ্রয়োজনীয় মানুষ, এখন মনে হচ্ছে এই অসহায় মানুষগুলোর জন্যই ওকে বেঁচে থাকতে হবে, কাজও করতে হবে।

বিজনের মা খুব কম কথা বলে। তারাপিসির কথা শেষ হতে সে কেঁদে ফেলল। পূরবীকে বলল, 'তোমরা আর যাইও না মা! বিজন শ্যাষবার যাইবার আগে কইছিল, এক বিজন মইরলে হাজার বিজন ওইবো, আঙ্গো মরণ নাই। তোমগোরে দেইখলে মনে অয় বিজন বুজি অ'নও তোমগো লগে আছে।'

জাফর উঠে গিয়ে বিজনের মা'র হাত দু'টো ধরে বলল, 'মা আমরাই আপনার বিজন। আপনাদের ছেড়ে আর কোথাও যাবো না।'

বিজনের মা জাফরের মাথাটা বুকে চেপে ধরে হু হু কান্নায় ভেঙে পড়ল। পূরবীর চোখও শুকনো থাকল না। তারাপিসি, সুচাঁদ খুড়ো ঘন ঘন চোখ মুছতে লাগল।

কথা হল ধলাই সব খোঁজ খবর নিয়ে দুদিনের ভেতর ওদের জানিয়ে আসবে। আকাশে তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। পূরবী আর জাফর ফিরে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল। তারাপিসি গিয়ে কোত্থেকে যেন চাল ভাজা গুঁড়ো করে বানানো কটা নাড়ু আনল। চোখে কান্না, মুখে হাসি— বলল, 'জামাই লই আইলা, কিচ্ছু খাওয়াইতাম হাইরলাম না। দুগা নাড়ু খাইতে খাইতে য'অ।'

পাহাড়ে ফিরতে ওদের রাত হয়ে গেল। রাতের খাওয়া শেষ করে ওরা দুজন বাইরে এসে বসল। জাফর বলল, 'রাজুরা ফিরে আসার আগেই আমরা কাজ শুরু করে দিতে পারবো।'

পূরবী বলল, 'এদের সঙ্গে কাজ করার মতো আনন্দ আমি খুব কমই পেয়েছি। মনটা ওদের সমুদ্রের মতো বড়ো। স্বভাবটাও সমুদ্রের মতো। মানুষের শোষণকে এরা মনে করে নিয়তি, অথচ প্রকৃতির বিরুদ্ধে আজীবন যুদ্ধ করে চলেছে।'

জাফর বলল, 'তোমার কি ঘুম পাচ্ছে?'

'ঘুম তো পাওয়ারই কথা। তোমার পাচ্ছে না?'

'আর একটু বসো পূরবী।'

পূরবী নিঃশব্দে হাসল। আকাশ তখন মেঘে ঢাকা। চারপাশের পাহাড় কুয়াশায় ঢাকা। জাফরের বুকের ভেতর কথার পাহাড় জমেছিল। ঝাউবনে বাতাশের একটানা শাঁ শাঁ শব্দ। পূরবী আপন মনে বলল, 'ঝড় আসবে মনে হচ্ছে।'

জাফরের বুকের ভেতরও ঝড়ের মাতন। বলল, 'ছোটবেলায় একটা গল্পের বই পড়েছিলাম। নাম ছিল প্রলয়ের পরে। মহাপ্রলয়ে গোটা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেছে, মাত্র দুজন মানুষ ছিল বেঁচে।'

কিছুক্ষণ পর পূরবী উঠে দাঁড়াল। বলল, 'ভেতরে চলো জাফর। আমার ঠান্ডা লাগছে।'

কোন কথা না বলে জাফর পূরবীকে অনুসরণ করল। ভেতরে যে মোমবাতিটা জ্বালানো ছিল, গলে গলে শেষ হয়ে এসেছে। পূরবী চাদর বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। জাফর পাশে বসে মোমবাতির শেষ শিখাটুকুর কাঁপন দেখতে বলল, 'তুমি কাল ডায়রী লেখোনি। আজও লিখলে না। কেন পূরবী?'

পূরবী মৃদু হাসল— 'আমার ডায়রীতে এমন মূল্যবান কিছু লেখার নেই, যা রোজ লিখতে হবে।'

'তবু তোমাকে রোজ আমি লিখতে দেখেছি। কাল কেন লেখোনি?'

পূরবী অস্বস্তি বোধ করল— 'লেখার মতো কিছু ছিল না।'

'আমাদের বিয়ের কথাও তুমি লিখতে চাও না?'

পূরবী কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর শান্ত গলায় বলল, 'কাল থেকে লিখবো জাফর। বিয়ের কথাও লিখবো। আর কথা নয়, শুয়ে পড়ো।'

জাফর পলকহীন চোখে মোমের শেষ শিখার দিকে তাকিয়েছিল। একটু পরেই সেটা নিভে গেল। একরাশ জমাট কালো অন্ধকার ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। জাফর পূরবীর পাশে শুয়ে বলিষ্ঠ হাতে ওকে কাছে টেনে নিল। ফিশ ফিশ করে বলল, 'কাছে এসো পূরবী।'

পূরবী একটু চমকাল। জাফরের বুকের ভেতর ওর শরীর কেঁপে উঠল। বলল, 'এখন নয় জাফর!'

জাফর পূরবীর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'আমি চাই আমার সন্তানের মা হবে তুমি। যে আমার মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকবে।'

পূরবী কিছু বলতে চাইল, পারল না। ভীষণ অসহায় বোধ করল। রাজুর কথা মনে হল। রাজু বলেছিল ও নাটক পছন্দ করে না। পূরবী অসহায় কণ্ঠে বলল, 'এ সময়ে আমি সন্তান চাই না জাফর।'

'আমি চাই।'

জাফরের জেদের কাছে ওকে হার মানতে হল।

পরদিন সকালে জাফরকে মনে হল বাজপড়া কোন গাছের মতো। ঘুম থেকে উঠে বাসি মুখে বসে কি যেন ভাবছিল। চোখ দুটো লাল হয়ে আছে।। বোঝা যায় রাতে ভালো ঘুম হয়নি। পূরবী চা বানাতে বানাতে বলল, 'হাত মুখ ধুয়ে এসো জাফর।'

জাফর কোনো কথা না বলে আগের মতো বসে রইল। বাসি মুখে চা খেল। পূরবী কাছে এসে ওর এলোমেলো চুলে আঙুল বুলিয়ে বলল, 'তোমার কি হয়েছে জাফর?'

কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে বসে থেকে জাফর বলল, 'তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে আমি তোমাকে অপমান করেছি পূরবী।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে শান্ত গলায় পূরবী বলল, 'তুমি অন্যায় কিছু করোনি। অযথা এসব ভেবে মন খারাপ করো না।'

জাফর উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আমি ঝর্ণা থেকে ঘুরে আসছি।'

শীতের বাতাসে ঝর্ণার ঠান্ডা পানিতে বহুক্ষণ সাঁতার কাটল জাফর।

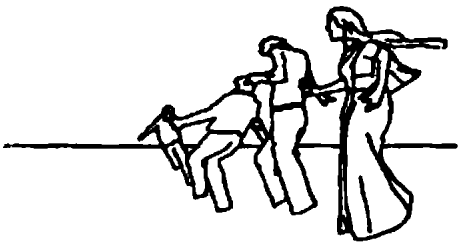

সকালে ঢাকার কমলাপুর স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে রাজু আর দীপু রিকশা নিয়ে সোজা রথখোলা এল। আসার সময় ওরা চট্টগ্রামে আনিসের সঙ্গে দেখা করেছিল। আনিস বলেছে, রহমান ভাই রথখোলার শেল্টারে থাকবেন। বাসাটা আনিসের এক সাংবাদিক বন্ধুর।

তাঁকে ওরা শেল্টারেই পেল। ওদের দেখে বুকে জড়িয়ে ধরলেন রহমান ভাই। প্রায় অন্ধকার পুরোনো ধরনের নোনাধরা দেয়ালঘেরা ছোট্ট সেই ঘর জুড়ে একটা তক্তপোষ ঘরের প্রায় পুরোটাই দখল করে রেখেছিল। ওপরে বসে রহমান ভাই কি যেন লিখছিলেন। রাজুকে বললেন, 'আমি ভেবেছিলাম তোমরা আরও আগে আসবে। যশোর থেকে তোমাদের খতমের সিদ্ধান্ত শুনে তড়িঘড়ি চট্টগ্রামে গেলাম। সেখানে কংগ্রেস শেষ করে চলে এলাম ঢাকা। ভাবলাম যোগাযোগের জন্য ঢাকাই সবচেয়ে ভালো জায়গা। কিন্তু তোমরা দুজন কেন? পূরবী আর জাফর কোথায়? এতোদিন ছিলে কোথায়?'

সাহেবালী খতমের পর থেকে যা যা ঘটেছে সংক্ষেপে সব কথা মতিউর রহমানকে জানাল রাজু। শেষে বলল, 'আমাদের খতম করার সিদ্ধান্ত তাহলে গোটা পার্টি জানে?'

মতিউর রহমান হাসলেন। 'ঘাবড়াচ্ছো কেন? খতম তো ওরা আমাকেও করতে চেয়েছিল। এত সোজা নাকি! তবে সাবধানে চলাফেরা করতে হবে, এই যা। ওরা অবশ্য সিদ্ধান্তটা কেন্দ্রেই সীমাবদ্ধ রেখেছে। জেলাকে শুধু বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত জানিয়েছে। তবে প্রতিক্রিয়া যে হয়নি তা নয়। যশোর আর সিলেট ছাড়া সব জেলাই কারণ জানতে চেয়েছে।'

রাজু হাঁপ ছেড়ে বলল, 'যাক কিছুটা রেহাই পাওয়া গেল। আমি তো ভেবেছিলাম কোথাও পা রাখার জায়গা পাবো না।'

মতিউর রহমান বললেন, 'কাজ আমি মোটামুটি গুছিয়ে এনেছি। ঢাকাতেই বিশেষ কংগ্রেস ডেকেছি টু থার্ড পার্টি মেম্বারের দাবির ভিত্তিতে। চিঠির কপি রফিকদের কাছেও পাঠানো হয়েছে। শুনলাম তিনি নাকি শিলিগুড়ি গেছেন বিপ্লবের সবক নেয়ার জন্য।' নিজের রসিকতায় নিজেই হাসলেন তিনি।

মতিউর রহমান মূলত কৃষক নেতা। পাবনায় তাঁর নিজের এলাকায় প্রচন্ড প্রভাব রয়েছে। যে জন্য তিনি আটষট্টিতে ভাসানীকে নিয়ে লক্ষাধিক কৃষকের লালটুপি সম্মেলন করতে পেরেছিলেন। তাঁর আচরণে এক ধরনের কৃষক সুলভ সরলতা আছে যা রাজুদের ভালো লাগে। ইদানিং বেশ পড়াশোনা করছেন। সংস্কৃতি পত্রিকায় বেনামে কয়েকটা প্রবন্ধও লিখেছেন। অন্যান্য গোপন বিপ্লবী দলের সঙ্গে আগে যথেষ্ট বৈরি সম্পর্ক থাকলেও বিভিন্ন বাহিনীর নির্যাতনে বাধ্য হয়ে সবার সঙ্গে একটা সমঝোতার সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাইছেন। রাজুকে বললেন, 'বশির ভাইদের সঙ্গে একটা যুক্ত বিবৃতি দিয়েছি বিপ্লবীদের ঐক্যের আহ্বান জানিয়ে। সিরাজ সিকদারের সঙ্গে জানুয়ারির মাঝামাঝি বসার প্রোগ্রাম হয়েছে।'

এরপর মতিউর রহমান জানালেন পার্টির বিশেষ কংগ্রেসের জন্য কি কি প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। বার বার বলছিলেন— পূরবী আর জাফরের উপস্থিত থাকা দরকার ছিল। সময়ও বেশি নেই যে খবর পাঠিয়ে আনবেন। রাজুর কাছে ওদের বিয়ের কথা শুনে প্রথমে খুবই বিরক্ত হলেন। বললেন, 'জঙ্গলে থেকে থেকে তোমাদের স্বভাবটাও জংলী হয়ে গেছে। বিয়ের আর সময় পেলে না!' তারপর হঠাৎ সুর পাল্টালেন। কি ভেবে মুচকি হেসে বললেন, 'তাড়াটা নিশ্চয়ই জাফরের ছিল! ওর খামখেয়ালি স্বভাব আর গেল না!' আবার সুর বদলালেন— 'যাই বলো আমি কিন্তু মোটেই খুশি হইনি।'

রাজু ম্লান হেসে বলল, 'আসলে উপায় ছিল না রহমান ভাই। পরিস্থিতি যে রকম দাঁড়িয়েছিল . . . .'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে; অত কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। আমি জানি তুমি সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারো। আসলে আমারই সব তালগোল পাকিয়ে যায়।' এই বলে মতিউর রহমান গলা খুলে হাসলেন— 'এই দেখো না আমাদের কমরেড দীপু পর্যন্ত শ্রেণীশত্রুর রক্তে হাত রাঙিয়ে ফেলল। শুধু আমিই পারলাম না। হাত কাঁপে বলে রফিক মাঝখানে মুরগির ওপর ক'দিন প্র্যাকটিস করিয়েছিল। তাও হল না।'

মতিউর রহমানের কথার ধরনে রাজু, দীপু দুজনই হাসলো। ওরা জানে এটা বুড়োর একটা কৌশল। তাঁর মতে পরিস্থিতি যত খারাপই হোক না কেন, সহজভাবে নিতে

হবে, মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে, হাসতে হবে স্বাভাবিক মানুষের মতো।

গত দুদিন ধরে মতিউর রহমান কংগ্রেসের রিপোর্ট লিখছিলেন। দুপুরে খাওয়ার পর রাজু আর দীপুকে পড়ে শোনালেন। সি এম লাইনের সমালোচনা, আধা ঔপনিবেশিক আর নয়া ঔপনিবেশিক তত্ত্ব, জাতীয় মুক্তির প্রসঙ্গ, বিপ্লবের বর্তমান স্তর এবং অন্যান্য ছোটখাট বিতর্কিত বিষয়গুলো বেশ গুছিয়ে লিখেছেন। কিছু উদাহরণ যোগ করে তাত্ত্বিক বিষয়গুলো আরও সহজ করতে বললো রাজু।

বিকেলে সাইদ, টিপু আর ফারুক এলো রহমান ভাই'র সঙ্গে দেখা করতে। রাজু আর দীপুকে দেখে ওরা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। সাইদ বলল, 'রহমান ভাই'র লো প্রেশার হাই হয়ে গেছে আপনাদের জন্য দুশ্চিন্তায়।' ফারুক বলল, 'রাজু ভাই যখন এসে গেছেন সদর দূর্গে বেশ বড় ধরনের তোপ দাগা যাবে।' আর টিপু বলল, 'জাফর ভাই আর পূরবীদিরও আসা উচিৎ ছিল।'

রহমান ভাই বললেন, 'রাজু যখন এসে গেছে আমি নিশ্চিন্ত।'

দীর্ঘ সময় ওরা সবাই কংগ্রেসের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করল। রহমান ভাই বললেন, 'রাজু একবার চট করে যশোর থেকে ঘুরে আসবে নাকি! জেলা কমিটিতে তোমার রিক্রুট করা দুজন আছে। আমার মনে হয় ওদের বোঝানো যাবে।'

সাইদ বলল, 'না রহমান ভাই, রাজু ভাইকে যশোরের মতো জায়গায় পাঠানো মোটেই উচিত হবে না। আপনার কাছে যশোরের যা খবর শুনলাম, কমরেড পলাশের পক্ষে সেখানে এ্যাকশন করাটাই সবচেয়ে সহজ হবে।'

রাজু বলল, 'এটা ঠিক বললে না সাইদ। আমি যশোর যেতে পারি এটা মানু ধারণাই করতে পারবে না। রহমান ভাই ঠিকই বলেছেন। আমি গেলে ডিসির দুজনকে অন্তত আমাদের পক্ষে পাবো।'

ঠিক হলো পরদিন ভোরেই রাজু যশোর চলে যাবে। সেখানকার জেলা কমিটির হিরু আর মানিককে ও সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। কংগ্রেসে যেসব প্রস্তাব নেয়া হবে রাতে রাজু তার একটা খসড়া দাঁড় করাল। সাইদ যদিও ওদের আলাদা শেল্টারে রাখতে চেয়েছিল মতিউর রহমান নাকচ করে দিলেন— 'এক রাতেরই তো ব্যাপার। এত রাতে অন্য কোথাও গিয়ে কাজ নেই।'

রাতে ওরা তিনজন এক তক্তপোষে ঘুমাল। দীপু রাজুর আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। রাজুর সঙ্গে মতিউর রহমানের কথা আর শেষ হয় না। একবার কথার মাঝখানে তিনি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার বাড়ির সঙ্গে কোন যোগাযোগ আছে রাজু?'

রাজু একটু অবাক হয়ে বলল, 'না।'

'বাসার সবাই কোথায় আছে জানো না?'

'গত দু'বছর কোনো খবর নিতে পারিনি। কোনো খবর জানেন নাকি?'

গত মাসে ঢাকা এসে ফারুককে পাঠিয়েছিলাম। ফারুক এসে বলল, তোমাদের নবরায় লেনের বাসায় এখন আর কেউ থাকে না। তোমার বাবা মারা যাওয়ার পর নাকি সবাই গ্রামের বাড়িতে চলে গেছে।'

পিতার মৃত্যুর সংবাদ এভাবে শুনবে রাজু ধারণাও করতে পারেনি। মতিউর রহমান

এমনভাবে কথাটা বললেন, যেন রাজু আগে থেকেই জানে। কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারল না রাজু। জানারও ইচ্ছে হল না বাবা কখন কিভাবে মারা গেছেন। প্রিয়জনদের মৃত্যু সংবাদ এভাবেই শুনবে এটা জেনেই তো সে এই জীবন বেছে নিয়েছিল।

আজীবন সংসারের ঘানি টেনেছেন বাবা। ছোটবেলায় পিতৃহীন হয়ে ভাইবোনদের বোঝা টেনেছেন, বিয়ের পর নিজের সংসারের বোঝা। প্রেসের চাকরি আর টিউশনি—এভাবেই উদয়াস্ত হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে নিজের সংসার চালিয়ে নিয়ে গেছেন। রাজু অবশ্য কলেজে ওঠার পর টিউশনি করে তার হাত খরচের ব্যবস্থা করেছিল, তাতে সংসারের চেহারা এতটুকু পাল্টায়নি। মা যে কিভাবে সংসার চালিয়েছেন কখনো হিসেব মেলাতে পারেনি সে। বাবা নিশ্চয়ই মৃত্যুর সময় কাছে পেতে চেয়েছিলেন তাঁর বড় ছেলেকে! রাজু নিজেও জানল না কখন যে দু'চোখ বেয়ে কান্নার ধারা নেমেছে তার হতভাগ্য বাবার জন্য।

অন্ধকারে মতিউর রহমানও রাজুর মনের অবস্থা টের পেলেন না। বললেন, 'যশোর থেকে এসে বাড়িতে কিছু টাকা পাঠিয়ে দিও। পারলে চাটগাঁ যাবার আগে একবার ঘুরে এসো। নদীর ওপারেই তো। দূর তো বেশি নয়।'

রাজু কোনো কথা বলল না। ও ঘুমিয়ে গেছে ভেবে মতিউর রহমানও পাশ ফিরে শুলেন।

পরদিন ভোরে রাজু যখন যশোর যাবার জন্য রওনা হচ্ছে, দীপু ইতস্তত করে বলল, 'তুমি তো দুদিনের আগে যশোর থেকে ফিরবে না রাজু। ঢাকায় আমার কোন কাজও নেই। তোমার আপত্তি না থাকলে বাড়ি থেকে একবার ঘুরে আসতে চাই।'

কথাগুলো বলার সময় মনে হচ্ছিল দীপু যেন অন্যায় কিছু করে ফেলেছে। রাজু মৃদু হেসে ওর পিঠে হাত রেখে বলল, 'বেশ তো যাও না। বহুদিন তো মাকে দেখোনি। তবে বাড়ি পৌছবে রাতে। ভোরেই চলে আসবে। জানাজানি হলে বিপদে পড়ে যাবে।'

রাজুর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতায় দীপুর বুকটা ভরে গেল।

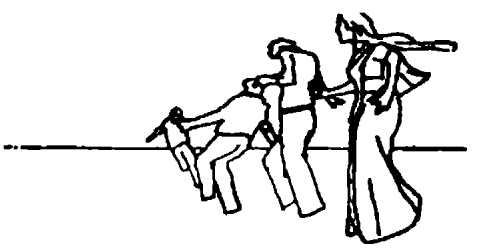

কুমিল্লা থেকে নৌকায় করে গ্রামের বাড়িতে যেতে যেতে দীপুর ঠিকই রাত হয়ে গেল। ওদের উচুঁ টিনের ঘরে তখনো আলো জ্বলছিল। দীপু বাড়িতে গিয়ে দেখল, মা জায়নামাজে বসে তসবি পড়ছেন।

দীপুকে দেখে মা কিছুক্ষণ বিহ্বলের মতো তাকিয়ে রইলেন। তারপর ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন। বললেন, 'বাড়িতে নাইবা এলি। এক বছরে একটা চিঠি লিখেও তো জানাতে পারতি কোথায় আছিস, কিভাবে আছিস। তোর হলের ঠিকানায় লেখা

সবগুলো চিঠি ফেরত এসেছে। ঢাকা থেকে লোক এসে বলে তুই নাকি ক্লাশেও যাস না।'

দীপু হাসল— 'তুমি তো জানো মা, আমার কি রকম ভুলো মন।'

মা উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'তোকে আর যেতে দিচ্ছি না। গোসলখানায় পানি আছে। হাত-মুখ ধুয়ে আয়। আমি খাবার দিচ্ছি।'

মা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। দীপুর মুখের হাসিটা ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে গেল। একটা গামছা নিয়ে গোসলখানায় ঢুকল।

খাবার বেড়ে দিয়ে মা বললেন, 'মা মরা মেয়েটাকে ক'দিন আর এভাবে আগলে রাখি বল। সেদিন ওর সৎ বাপ এসে নাহক কথা শুনিয়ে দিয়ে গেল। এমনিতে আমার শতেক জ্বালা। একা আমি ক'টা দিক সামলাই বলতো। এতো বড়ো গরমের ছুটি গেল। তারপর পূজোর ছুটি গেল। তাও তুই এলি না। আমি শুধু ভাবি, শেষ পর্যন্ত তুই এসে বুঝি আমার কবর দেখবি।'

দীপু বলল, 'এসব কথা কেন ভাবো মা? তুমি অনেক দিন বাঁচবে।'

মা বললেন, 'কতজনকে বলেছি, তোর খবর নিতে। কেউ কিছু বলতে পারল না। ক'দিন আগে মোতি দারোগা এসেছিল। তোর চিঠি-পত্তোর পাই কিনা জিজ্ঞেস করল। আমি তো মোতি দারোগার ভাবসাব দেখে হেসে বাঁচি না। ওর মেয়েটার বিয়ের বয়স হয়েছে। আমি বলেছি, আপনি তো শহরে যান, দেখবেন তো ছেলেটার কোন খোঁজ পান কিনা। তুই সেই বড়দিনের পর গিয়ে শুধু একটা চিঠি দিয়েছিলি। এতো ভুলো মন হলে সংসার করবি কিভাবে।' মা এরপর হাসলেন— 'আমার বিছেহারটা ভাঙিয়ে হাসিনার জন্যে দু'টো বালা বানিয়েছি। বেশ হয়েছে দেখতে। বালা দিয়ে ওকে আমি বরণ করবো।'

দীপু বলল, 'বরণ করবে কি মা। আগে থেকেই তো তুমি ওকে ঘরে তুলে বসে আছো।'

'কি যে বলিস।' মা আবার হাসলেন— 'মা মরা মেয়েটা . . . .

'আচ্ছা মা, মোতি দারোগা কবে এসেছিল বললে?'

মা হিসেব করে বললেন, 'দিন সাতেক হবে। তা একবার গিয়ে দেখা করে আসতে পারিস। এতোবার যখন তোর খোঁজ নিচ্ছিল।'

দীপু বলল, 'হাসিনা কোথায় মা?'

'পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছে। কাল কথা বলিস। ক'দিন ধরে মেয়েটার জ্বর।'

খাবার পর দীপু ওর ঘরে গেল। মা বললেন, 'তুই তাহলে শুয়ে পড়। সারাদিন এতোটা পথ এলি।'

দীপু হাসল— 'এটা আর এমন কি পথ মা। তুমি একটু বোসো। কতদিন তোমার সঙ্গে কথা বলি না। তুমি কেমন আছো, কি করছো কিছুই তো বললে না। তোমার সব খবর বলো মা।'

মা হেসে ওর পাশে বসলেন। মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, 'খবর আমার একটাই। তোর বিয়েটা দিতে পারলে আমি নিশ্চিন্ত হই।'

দীপু কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'তোমার বাবার কথা কি মনে আছে মা?'

'কেনরে!' মা একটু অবাক হলেন— 'বাবার কথা কেন মনে থাকবে না?'

'তিনি তো চট্টগ্রামের যুব বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তাই না মা?'

'সে তো ছিলেনই। বাবা আর কাকুরা মিলে কিভাবে বোমা বানাতেন সেকথা তোকে বলিনি?'

'বলেছো মা।' দীপু হাসল— 'সেজন্যেই তো তোমাকে নিয়ে আমার এত গর্ব!'

সহসা মা'র মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। তাঁর বাবার কথা মনে পড়ল। শুকনো গলায় বললেন, 'বাবার কথা কেন জিজ্ঞেস করছিস দীপু?'

দীপু কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে শান্ত গলায় বলল, 'আমিও তোমার বাবার মতো গোপন বিপ্লবী পার্টির সদস্য।'

মা নিস্পলক দৃষ্টিতে দীপুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ওর দু'চোখ শান্ত আগুন দেখতে পেলেন। যে আগুন তাঁর বাবার চোখেও ছিল। তার মুখটা করুণ হয়ে উঠল। এতদিন এই আগুন তাঁর চোখে পড়েনি। কি অন্ধের মতই না তিনি দিন-রাত অবিরাম স্বপ্নের জাল বুনে চলেছেন!

দীপু বলল, 'আমার নামে ওয়ারেন্ট আছে মা।'

মা'র চোয়াল দু'টো সামান্য ঝুলে গেল। থেমে থেমে বললেন, 'তুই কি এখন পলাতক?'

দীপু মাথা নেড়ে সায় জানাল— 'হ্যাঁ মা।'

মা বিড়বিড় করে বললেন, 'আমার কি হবে! হাসিনাকে নিয়ে আমি কি করবো? তুই আমাদের কথা একটুও ভাবলি না দীপু?'

দীপু একটু অস্বস্তি বোধ করল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'হাসিনাকে তুমি তোমার ছেলের বৌ ভাবতে পারো মা। তবে এই মুহূর্তে ওকে বিয়ে করা সম্ভব হচ্ছে না মা। আমাকে কাল ভোরেই চলে যেতে হবে।'

মা এবার ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন— 'তুই আমার একমাত্র ছেলে দীপু। তোকে হারালে আমি কি নিয়ে বাঁচবো?'

দীপু মৃদু গলায় বলল, 'বাংলাদেশে তোমার মতো আরও অনেক মা আছে। আমি হারাবো কেন ভাবছো। আমি ঠিকই তোমার কাছে ফিরে আসবো।'

মা চোখ মুছে ধরা গলায় বললেন, 'আমার বাবা শেষবার যাবার সময় মাকে সে কথাই বলে গিয়েছিলেন। তারপর কিছুক্ষণ চুপ থেকে শান্ত গলায় বললেন, 'তোর কোনো অমঙ্গলের কথা ভাববো না দীপু। তুই শুধু কথা দে যখন যেখানে থাকিস দু'লাইন চিঠি লিখে জানাবি?'

'দেবো মা।' গভীর গলায় মাকে আশ্বস্ত করল দীপু। 'তুমিও কথা দাও মা যাবার সময় তুমি কাঁদতে পারবে না।'

'তুই ঘুমিয়ে পড়। আবার সকালেই তো উঠতে হবে।'

মা চলে গেলেন। এতো সহজে মাকে বোঝানো যাবে দীপু ভাবতে পারেনি।

মা তাঁর ঘরে এসে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন। তারপর পাশের ঘরে গিয়ে হাসিনাকে ডেকে তুললেন। আস্তে আস্তে সব কথা ওকে খুলে বললেন। হাসিনা একটা কথাও বলল না। জ্বরে ওর চোখ দুটো ছল ছল করছিল। ওর মনে হল জ্বরের ঘোরে বুঝি স্বপ্ন দেখছে। ভোর হলেই মাকে বলবে, কাল রাতে দীপু ভাইকে স্বপ্নে দেখেছি। মা বললেন, 'ওকে আমি চিনি হাসি। ওকে আর ফেরানো যাবে না।' মার দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে মিশে গিয়ে কথাগুলো প্রচন্ড এক হাহাকারের মতো চারপাশে ঘুরতে লাগল। বুকের ভেতর হাহাকার ক্রমাগত মাথা খুঁড়তে লাগল। ওর ইচ্ছে হল চিৎকার করে কেঁদে সব ভাসিয়ে দেয়। কিন্তু হাসিনা এতটুকু কাঁদতে পারল না। পাথরের মূর্তির মতো বসে রইল।

শেষ রাতে বাইরে মোরগ ডাকল। মা দীপুর ঘরে এলেন। তাঁর সঙ্গে হাসিনাও এল। দীপুর মাথার কাছের জানালাটা খুলে দিলেন। কুয়াশার মতো হালকা একটুকরো আলো ওর মুখে এসে পড়ল। ছোট ছেলেদের মতো বালিশ আকঁড়ে শুয়েছিল দীপু। ওর ঠোঁট দুটো সামান্য কেঁপে উঠল। হাসিনার ইচ্ছে হল চিৎকার করে বলে— আমি তোমাকে যেতে দেবো না দীপু।' কিছুই বলতে পারল না। ওর দু'চোখ বেয়ে কান্নার অবিরল ধারা নামল।

মা ওকে দেখলেন। ফিস ফিস করে বললেন, 'এখন কেঁদো না হাসি। কাঁদার জন্যে সারাটা জীবনইতো পড়ে রইল। আমরা ওকে হাসিমুখে বিদায় দেবো।' বলতে বলতে মা নিজেই কেঁদে ফেললেন।

হাসিনা চোখ মুছে বলল, 'আমি রান্নাঘরে যাচ্ছি মা।'

হাসিনা বেরিয়ে যাবার পর দীপুর ঘুম ভাঙল। মা তখন ওর দিকে তাকিয়েছিলেন, দীপু হাসল। হাই তুলে উঠে বসল। বলল, 'সারারাত শুধু তোমাকেই স্বপ্নে দেখলাম মা।'

মা হাসার চেষ্টা করলেন। বললেন— 'বসে থাকিস না। হাসিনা নাস্তা বানাতে গেছে।'

দীপু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মা জানালার কাছে এসে দাঁড়ালেন। আকাশের অন্ধকার কেটে যাচ্ছে। একটা দুটো পাখি ডাকতে শুরু করেছে। একটু পরে আজানের শব্দ শোনা গেল।

দীপুর খাবার সময় হাসিনা দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল। দীপু ডাকল— 'হাসি এদিকে এসো।'

হাসিনা কাছে এসে দাঁড়ালে দীপু ওর মুখের দিকে তাকাল— 'চোখ ভেজা কেন, মাকে বলিনি তোমরা কেউ কাঁদবে না?'

হাসিনা কোনো কথা বলল না। মা নিঃশব্দে ওকে খাবার এগিয়ে দিলেন।

খেয়ে উঠে দীপু ওর ঘরে গেল। গায়ের জামাটা পাল্টে নিল। এক জোড়া জামা আর প্যান্ট একটা কাগজে মুড়ে নিল। হাসিনা কোন কথা না বলে একটা কাপড়ের ব্যাগ এগিয়ে দিল। দীপু দেখল ভেতরে টুথব্রাশ, পেস্ট, সাবান, চিরুনি— এ সব রয়েছে।

ব্যাগ গুছিয়ে দীপু ঘুরে দাঁড়াল। মা বললেন, 'চল আমরা তোকে ঘাট পর্যন্ত এগিয়ে দিই!'

বাড়ির পেছনে একটা আম বাগান আর ধানক্ষেত পেরিয়ে নদীর ঘাট। দীপু যে নৌকাতে করে এসেছিল সেটা ঘাটে ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল। ফসল ওঠা মাঠ পেরিয়ে ওরা ঘাটে এসে দাঁড়াল। হু হু করে অবিরাম বাতাস বইছে। হাসিনার শাড়ির আঁচল, খোলা চুল বাতাসে এলোমেলো উড়ছিল।

দীপু বলল, 'যাই মা।'

মা ওর কপালে চুমো খেয়ে বললেন, 'এসো।'

দীপু হাসিনার সামনে এসে দাঁড়াল, 'যাই হাসি।'

হাসিনা মৃদু গলায় বলল, 'আমাকে কি কিছুই বলবে না?'

দীপু কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল। নদীতে তাকিয়ে দেখল। পুব দিকের আকাশটা লাল হয়ে উঠেছে। গেরুয়া রং-এর পাল উড়িয়ে একটা ছোট নৌকা শাঁ শাঁ করে চলে যাচ্ছে। দীপু বলল, 'আমি আবার আসবো হাসি।'

দীপু নৌকোয় উঠল। নোঙর তুলে মাঝি নৌকা ছেড়ে দিল। দিগন্ত জোড়া ধান ক্ষেত আর বিশাল আকাশের নিচে হালকা কুয়াশায় পা ডুবিয়ে দুটো পাথরের মূর্তি ওর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল। নৌকা যখন স্রোতের টানে পড়ল— দীপু হাত নেড়ে বলল, 'আমি আবার আসবো মা।'

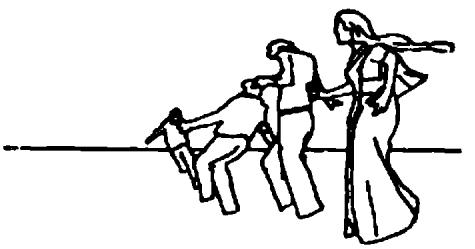

রাজুরা ঢাকা যাবার চার দিন পর ধলাই এলো জাফর আর পূরবীকে নেয়ার জন্য। দুদিন আগে প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড় বয়ে গেছে গোটা এলাকা তছনছ করে। ঝড়ের পরদিনই আর্মি ক্যাম্প গুটিয়ে ফেলা হয়েছে। রাতে পাথরের গুহার ভেতরে থাকার জন্য ঝড়ের ভয়াবহতা টের পায়নি পূরবীরা। অবশ্য রাজুরা যাবার পর থেকেই ওর ভেতর মানসিক অশান্তির যে ঝড় বইছিল তাতে বাইরের ঝড় কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে নি। শুধু ঝড়ো বাতাস আর বৃষ্টির জন্য গত দুদিন আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা গুহার ভেতরই করেছে। ভেতরে বৃষ্টির পানিও ঢোকেনি।

ধলাইর কাছে ঝড়ের বিবরণ শুনে পূরবী হতভম্ব হয়ে গেল। জেলেপাড়ার বেশিরভাগ কাঁচা ঘরই পড়ে গেছে। ওদের গ্রামে নয়ন মন্ডলের ভিটার কয়েকটা ঘর আর বিজনদের ঘর দুটো শুধু রক্ষা পেয়েছে। পাশের গ্রামের দুটো নৌকার কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না। মাঝি সহ দশজন ছিল নৌকা দুটোয়।

পূরবীরা আর দেরি করল না। রাজুর জন্য চিঠি রেখে তখনই জিনিসপত্র গুছিয়ে ধলাইর সঙ্গে রওনা হল। পাহাড় থেকে নামার আগে শুধু জাফর একবার ফিরে তাকাল বহু স্মৃতি জড়ানো গুহাটার দিকে।

জেলে পাড়ায় এসে পূরবী অবাক হল। ভেবেছিল সবাই বুঝি ভাঙা ঘরের পাশে বসে বিলাপ করছে। না, তার কোন লক্ষণ নেই। বন থেকে গাছ কেটে সবাই যে যার ঘর মেরামত করতে ব্যস্ত। ধলাই ওদের এনে তুলেছে বিজনদের বাড়ি। বিজনের মা বার বার বলেছে ওরা যেন এ বাড়িতেই ওঠে। ঘরতো খালিই পড়ে আছে।

বিজনের স্মৃতি জড়ানো বহু জিনিস ঘরে গুছিয়ে রাখা হয়েছে। বাঁশের তাকে ওর পড়ার বই, বেড়ার গায়ে ওর ছবি ঝোলানো, কাঠের আলমারিতে ওর কাপড়— সবই গোছানো রয়েছে। যেন কিছুদিনের জন্য ও বাইরে গেছে। বিজনের মা আর তারাপিসি সবাইকে বলে দিয়েছে-বাইরের কেউ জাফরের কথা জানতে চাইলে যেন বলা হয় ও বিজনের ছোট ভাই তপনের বন্ধু। গ্রামে বেড়াতে এসেছে।

ব্যাগ আর ঝোলা নামিয়ে রেখে জাফর ধলাইকে নিয়ে ছুটল সুচাঁদ মাঝির বাড়িতে। একদিনেই ঘর দাঁড় করিয়ে ফেলেছে বুড়ো তার তিন ছেলেকে নিয়ে। যাদের ঘর এখনও তোলা হয়নি তাদের ঘর তুলতে লেগে গেল জাফর। ওর পরিশ্রম করার ক্ষমতা দেখে ওর সমবয়সীরাও বিস্মিত। শক্ত ব্যায়াম করা পেটা শরীর, দুজনের কাজ একা করে, কোন ক্লান্তি নেই, সব কথা বোঝে না, শুধু হাসে— একদিনেই রীতিমতো নায়কের মর্যাদা পেয়ে গেল সে। রাতে ঘুমোবার সময় পূরবীকে মহা উৎসাহে বলতে গিয়ে হতাশ হল জাফর। পূরবী বলল, 'এমন কিছু কোরো না— যা দশজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ওদের একজন হওয়ার চেষ্টা করো।'

পূরবীর কথা শুনে জাফর কিছুক্ষণ গুম হয়ে থাকল। তারপর বলল, 'কাল আমি ওদের সঙ্গে নৌকায় মাছ ধরতে যাবো।'

পূরবী মৃদু হেসে বলল, তোমার কোন অভিজ্ঞতা নেই। সাগরের ভেতর বাতাসের পাল্লায় পড়লে জান খারাপ হয়ে যাবে। জমির একবার গিয়ে বমি করতে করতে দম আটকে মরার দশা হয়েছিল।'

'আমি ননীর পুতুল নই পূরবী। অভিজ্ঞতার জন্যই আমার যাওয়া দরকার।' বিরক্তির সঙ্গে কথাগুলো বলে জাফর পাশ ফিরল। গত চার রাতের ভেতর এই প্রথম সে পূরবীকে স্পর্শ করল না। পূরবীও উদ্বেগমুক্ত হয়ে শান্তিতে ঘুমালো।

সমুদ্রে গেলে এক নাগাড়ে পনের বিশ দিন পর্যন্ত থাকে জেলেরা। সুচাঁদ মাঝিরা আগে সবরকম মাছ ধরত। নয়ন মন্ডল গত দুই বছর ধরে শুধু হাঙ্গর ধরছে। ওর নৌকায় যারা যায় তাদের কাজ একরকম, অন্যদের আরেক রকম। অন্য যারা শুধু মাছ ধরে, তারা সমুদ্রে উপকূল থেকে কিছুটা দূরে একটা দ্বীপে মাছ ধরে প্রথমে শুকোতে দেয়। শুকোনোর জন্য দু'একজন সেখানে থাকে। নৌকা বোঝাই হওয়ার মতো মাছ শুকোলে ফিরে আসে তারা। আর যারা হাঙ্গর ধরে তাদের নৌকা থাকে বড়। যা কিছু করার সব নৌকাতেই সারে। সাত আট দিন থাকে সমুদ্রে।

জাফর প্রথমবার গেল সুচাঁদের সঙ্গে নয়ন মন্ডলের নৌকায়। দু'টো বড় নৌকা পাশাপাশি সারাদিন চলল গভীর সমুদ্রের দিকে। ছোট ইঞ্জিন লাগানো আছে নৌকায়, বৈঠা বাইতে হয় না, একজন শুধু হাল ধরে থাকে। নৌকায় পালও আছে।

দুপুরে প্রথমবার নৌকার রান্না খেল জাফর। ভাত আর লাল মরিচের ভর্তা জাফর শুধু ভাত খেল লবণ আর পানি মিশিয়ে। রাতেও তাই। সুচাঁদ বলল— কাল থেকে মাছ খাওয়াব, চাইলে আস্ত হাঙ্গরও ভেজে দিতে পারি।

প্রথমে ভেবেছিল বুঝি রসিকতা করছে বুড়ো। পরদিন দেখলো রসিকতা নয়। সকালে প্রথম জাল টানার সঙ্গেই গোটা তিরিশেক হাঙ্গর উঠলো। বেশির ভাগ দেড় থেকে দুই ফুট লম্বা। ছোটও আছে। নীলচে পিঠ, চকচকে মুক্তো সাদা মসৃন পেট— না বললে বিশ্বাস করত না এগুলো হাঙ্গর। দেখে অতি সাধারণ সামুদ্রিক মাছের মতো মনে হয়। হাঙ্গর সম্পর্কে জাফরের ধারণা ছিল, অতিকায় হিংস্র সামুদ্রিক প্রাণী—দেখল জেলেরা অবলীলাক্রমে জাল থেকে তুলে নৌকার খোলের মধ্যে ফেলছে। আর হাঙ্গরগুলো ডাঙায় তোলা নিরীহ মাছের মতোই তড়পাচ্ছে।

সুচাঁদের কাছে জাফর শুনল, 'ওরা পানি দেখে বলতে পারে হাঙ্গরের বাচ্চা কোথায় আছে। মাঝে মাঝে দুর্ঘটনা যে ঘটে না তা নয়। জালে কখনও চার পাঁচ হাত বড় হাঙ্গরও আটকা পড়ে। তবে সেগুলো জাল কেটে বেরিয়ে যায়— সে আরেক ভোগান্তি।

দুপুর পর্যন্ত হাঙ্গর ধরা হল। মাছের আঁশটে গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে আছে। জাফর খুবই উত্তেজিত। ওর মনে হলো অনন্তকাল ধরে এভাবে সুচাঁদ মাঝিদের একজন হয়ে থেকে যেতে পারবে।

দুপুরের পর নৌকার পাটাতনে বসানো চুলোর ওপর বড় একটা তেলের কাটা ড্রাম বসানো হল। প্রথমে ওরা হাঙ্গরের পাখনা কেটে আলাদা করল। এরপর পেট চিরে কাঁচা তেল বের করে ড্রামে ফেলল। হাঙ্গরের পাখনা অত্যন্ত উপাদেয় খাদ্য হিসেবে বিবেচিত হয় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে। নয়ন মন্ডল এই সব পাখনা শুকিয়ে উখিয়ার ট্রলার কোম্পানীকে চড়া দামে বিক্রি করে। হাঙ্গরের তেলও ভালো দামে বিক্রি হয়।

পাখনা কেটে তেল বের করে বাকিটুকু ওরা সমুদ্রে ফেলে দেয়। এভাবেই মৃত হাঙ্গরের দেহাবশেষ জ্যান্ত হাঙ্গরের খাদ্যে পরিণত হয়। তেল জাল দেয়ার সময় বিশ্রি আঁশটে গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল নৌকায়। বিকট গন্ধ সহ্য করতে না পেরে জাফর হড় হড় করে বমি করে ফেলল। সুচাঁদ বলল, 'হইলা হইলা এরকম অয়, আস্তে আস্তে সই যাইবো।'

নৌকায় ছোট বর্শার মতো এক ধরনের অস্ত্র ছিল— যেগুলো বড় হাঙ্গর বা ওই জাতীয় উৎপাতের জন্য ব্যবহার করতে হয়। তিন দিনের মাথায় জাফর নিজেই একটা মাঝারি গোছের হাঙ্গর গেঁথে ফেলল। জাল টানার সময় ওটা আটকা পড়েছিল। না মারলে জাল কেটে ফেলতো। সুচাঁদের ছোট ছেলে নেতাই প্রথম দেখতে পেয়ে বর্শা ছুঁড়ে মারতে গিয়েছিল। জাফর ওর হাত থেকে বর্শা নিয়ে নিজেই মারল। বর্শার গোড়ায় নাইলনের সরু রশি বাঁধা। পানিতে কয়েকবার ওলটপালট করে হাঙ্গরটা কাবু হয়ে গেল। টেনে কিনারে আনার পর লেজ ধরে ওটাকে নৌকায় তোলা হল। হাত তিনেকের কাছাকাছি হবে। সবাই জাফরের হাতের টিপের প্রশংসা করল। বর্শা দিয়ে হাঙ্গরের চোখ বিঁধিয়েছিল সে।

এরপর জাফরের শিকারের নেশা পেয়ে বসল। জাল টানার সময় বড় কোন মাছ

দেখলেই বর্শা ছুঁড়ে মারে। লাগলে ছোট ছেলের মতো আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে। আস্তে আস্তে তেল পোড়া আশঁটে গন্ধ, শুকোতে দেয়া পাখনা এবং হাঙ্গরের ফিনকি দেয়া রক্ত— সব কিছুতেই জাফর অভ্যস্ত হয়ে গেল।

দশদিন পর ওর রোদে পোড়া শরীর দেখে পূরবীও অবাক হল। জাফর বলল, 'আর কয়েকটা ট্রিপে যেতে পারলে আমাকে আর আলাদা করে চিনতে পারবে না।'

গত কদিনে জেলে সমিতি গড়ার কাজে পূরবী বেশ কিছুটা এগুলেও সুচাঁদের অভাবে অনেক কাজ আটকা পড়েছিল। জাফরকে বলল, 'শুধু মাছই মারবে, না এদিকে পার্টির কাজ কিছু করবে!'

জাফর বলল, 'পার্টির এখন যা কাজ, তুমি ভালো পারবে।'

সুচাঁদরাও জাফরকে ওদের সঙ্গে রাখতে চাইছিল।

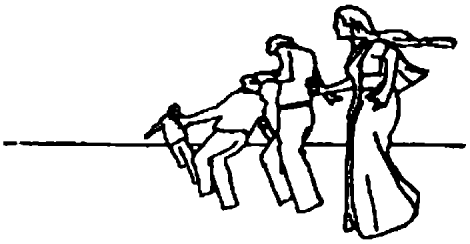

কেন্দ্রীয় কমিটিকে কংগ্রেস ডাকার জন্য মতিউর রহমান যে চিঠি দিয়েছিলেন তার উত্তর পেলেন সাতদিন পর, তাও নেতিবাচক। রফিক ঢাকা এসে কামালউদ্দিনের বাসায় মতিউর রহমানের সঙ্গে দেখা করে বলল, 'এ ভাবে কংগ্রেস ডাকার অধিকার আপনার নেই। আপনি বড়জোর দাবি করতে পারেন পার্টিতে আপনার দলিল সার্কুলেট করার জন্য।'

মতিউর রহমান কাষ্ঠ হেসে বললেন, 'আন্তঃপার্টি সংগ্রামের সব পথ তোমরা বন্ধ করে দিয়েছো। দলিল তো আমি এক বছর আগেই দিতে চেয়েছিলাম। তুমি তখন বলেছো, এটা পার্টির শৃঙ্খালাবিরোধী কাজ। আমাকে খতম করার কথাও তখন বলেছিলে। এখন যেমন রাজুদের গোটা গ্রুপকে খতম করার সিদ্ধান্ত নিয়েছো।'

রফিক তার স্বভাবসুলভ কর্তৃত্বব্যঞ্জক কণ্ঠে বলল, 'সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় কমিটি। আপনি সিসির বৈঠকের কথা জেনেও সেদিন উপস্থিত থাকেন নি। একই সঙ্গে সিসির অনুমতি না দিয়ে জেলায় জেলায় ঘুরছেন।'

'ঘুরছি বেশ করেছি। কংগ্রেসে তোমরা থাকবে কিনা তাই বলো।'

'কংগ্রেস ডাকবে কেন্দ্রীয় কমিটি। আর সেটা সময় হলেই ডাকা হবে। কারো হুমকিতে পার্টি চলে না এটা আপনার জানা উচিৎ'

'আমার চেয়ে এটা তোমার বেশি জানা উচিৎ।'

'এ ধরনের কাজের পরিণতি কি হতে পারে আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে?'

'যা পারো করোগে। আমি টু-থার্ড পি এম*-এর অনুমোদন পেয়েছি। কংগ্রেস

*পার্টি মেম্বার

ডাকার ষোল আনা এখতিয়ার আমার আছে।'

রফিক রেগে উঠে চলে গেল। মতিউর রহমান কামালউদ্দিনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কংগ্রেসে থাকবেন তো?'

কামালউদ্দিন আগে থেকেই চটেছিলেন মতিউর রহমানের ওপর। বললেন, 'আপনাদের যা খুশি করুন গে। আমি কারও সঙ্গে নেই।'

শেল্টারে ফিরে মতিউর রহমান রাজু, দীপু আর সাইদদের সব বললেন। রাজু যশোরে গোটা জেলা কমিটির সঙ্গেই বসেছিল। মতিউর রহমান যা পারেননি রাজু তাই পেরেছে। ডিসির সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন পেয়েছে সে। কংগ্রেসে অংশ নেয়ার জন্য যশোর ডিসি তিনজন প্রতিনিধি পাঠিয়েছে।

সাইদের ছুটোছুটির অন্ত নেই। বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিনিধিরা আসছে কংগ্রেসে যোগ দেয়ার জন্য। তাঁদের জন্য শেল্টারের ব্যবস্থা করা, কুরিয়ার ঠিক রাখা, শুভানুধ্যায়ীদের কাছ থেকে চাঁদা তোলা, প্রেস যোগাড় করা— সবই করতে হচ্ছে ওদের।

মতিউর রহমান কংগ্রেসে আলোচনার জন্য রাজনৈতিক রিপোর্ট, রণনীতি ও রণকৌশলের দলিল, প্রস্তাব সব কিছু ঠিক করে ফেলেছেন। প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষকদের চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করেছেন। বসার জায়গাও ঠিক হয়েছে। তবে গোপনীয়তা রক্ষার কারণে রাজু আর সাইদ ছাড়া কেউ জানে না। সবাইকে শুধু বলা হয়েছে সময় মতো একটা নির্দিষ্ট জায়গার যাবার জন্য।

কংগ্রেসে বসার দুদিন আগে মতিউর রহমান খবর পেলেন রফিকরা নাকি সিদ্ধান্ত নিয়েছে কংগ্রেস হতে দেবে না। টিপু বলল, মানুকে নাকি সে ঢাকায় দেখেছে। মতিউর রহমান রাজু আর সাইদকে নিয়ে আবার বসলেন সমস্ত প্রস্তুতি খুঁটিয়ে দেখার জন্য। বার বার বললেন, 'সব কিছু ভালোমতো চেক করো। শেল্টারগুলোতে সিক্রেসি ঠিকমতো মেনটেইন হচ্ছে কিনা দেখো। বাইরে থেকে যারা এসেছে তারা যেন শেল্টার ছেড়ে কোথাও না বেরোয়। কুরিয়ারদের আরো সাবধান হতে বলো। রফিকদের কথা বাদ দাও, পুলিশেরই এখন হাজারটা চোখ। আইবির লোকেরা টের পেলো কিনা কে জানে। কংগ্রেস যদি ঘেরাও হয়, বের হওয়ার পথও চেক করো। এ্যাকসিডেন্ট একটা হওয়া মানে পার্টি শেষ হয়ে যাওয়া।'

সাইদদের পুরো গ্রুপের রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেল। গোটা পার্টির নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব পড়েছে ঢাকা জেলা কমিটির ওপর। নিচের পার্টি গ্রুপ আর ইউনিট থেকে বাছাই করা ছেলেদের নিয়ে সাইদ সরাসরি ডিসির অধীনে একটা গেরিলা স্কোয়াড গঠন করেছে— যাদের পাহারার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। সবার কাছে রিভলবার নয় পিস্তল আছে। চরম পরিস্থিতিতে ওদের অস্ত্র ব্যবহারের নির্দেশ দিল সাইদ। রাজু স্কোয়াডের সঙ্গে বসে প্রত্যেকের কাজ আলাদাভাবে বুঝিয়ে দিল।

নির্ধারিত তারিখে মিরপুরের এক বাড়িতে বসল পার্টির কংগ্রেস অধিবেশন। মতিউর রহমান এর নাম দিয়েছেন বিশেষ কংগ্রেস। সকাল আটটা থেকে নটার মধ্যে

সবাই আলাদা আলাদাভাবে কংগ্রেসে এসে উপস্থিত হল। প্রতিনিধি আর পর্যবেক্ষক মিলিয়ে মোট সাতাশ জন। পার্টির পতাকা তুলে কংগ্রেস উদ্বোধন করলেন মতিউর রহমান। সবাই উঠে দাঁড়াল। সাইদ নিচু গলায় 'ইন্টারন্যাশনাল'* গাইল। তারপর তিনজনের সভাপতিমন্ডলী নির্বাচন করা হল। সভাপতির অনুমতি নিয়ে রাজু প্রথমে শোক প্রস্তাব পাঠ করল। রাজু লক্ষ্য রেখেছিল শোক প্রস্তাবে যেন শহীদ কমরেডদের সবার নাম থাকে। তবু দু'একটা নাম বাদ গিয়েছিল। খুলনা আর চট্টগ্রামের প্রতিনিধি আরো তিনজনের নাম যোগ করতে বলল। শোক প্রস্তাব গৃহীত হবার পর মতিউর রহমান তাঁর রাজনৈতিক রিপোর্ট পড়লেন।

রিপোর্টের ওপর আলোচনা বিকেল পর্যন্ত গড়াল। দুপুরে খাওয়ার বিরতি ছিল একঘন্টা। বিরতির সময়ও প্রতিনিধিরা আলোচনা করেছে। মতিউর রহমানের রিপোর্টের সবচেয়ে বিতর্কিত প্রসঙ্গ ছিল সি এম লাইনের মূল্যায়ন। তিনি তাঁর রিপোর্টে সি এম-এর 'জনে জনে চক্রান্ত' আর 'শ্রেণীশত্রু খতম'কে পেটিবুর্জোয়া সন্ত্রাসবাদী প্রতিবিপ্লবী লাইন বললেন। পাবনার প্রতিনিধি আপত্তি তুলল— 'সি এম লাইন ভুল হতে পারে কিন্তু এক কথায় এটাকে প্রতিবিপ্লবী বলা আমি সঠিক মনে করি না। সি এম লাইনের ইতিবাচক দিকও আছে। বিশেষ করে সংশোধনবাদী এবং শ্রেণী আপোষকারীদের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম এই উপমহাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে বলে আমি মনে করি।'

পক্ষে বিপক্ষে যুক্তি আর পাল্টা যুক্তির আবর্তে এই আলোচনা একটানা তিনঘন্টা ঘুরপাক খেলো। শেষে ভোটাভোটিতে মতিউর রহমান জিতলেন। তিনি পেলেন বাইশ ভোট, বিপক্ষে পড়লো এক ভোট। চারজন কোনো পক্ষে হাত তোলেনি। অন্যান্য বিতর্কিত বিষয়গুলো আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি হল।

একটানা দুদিন চলল পার্টির বিশেষ কংগ্রেস। শেষ অধিবেশনে রণনীতি আর রণকৌশলের আলোচনায় দেশে বিরাজমান পরিস্থিতিতে পার্টি গোপন রেখে প্রকাশ্যে গণসংগঠন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হল। নিজেদের গণসংগঠন করার সুবিধা না থাকলে অন্য গণসংগঠনে কাজ করতে হবে। একই সঙ্গে বিপ্লবীদের অন্যান্য গোপন দলের সঙ্গে আলোচনা এবং ঐক্যমোর্চা গঠনের দায়িত্ব নতুন কেন্দ্রীয় কমিটিকে দেয়া হল। নয় জনের কেন্দ্রীয় কমিটিতে মতিউর রহমান পার্টি সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। ঢাকা থেকে রাজু আর সাইদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হল।

অধিবেশন সমাপ্তির ভাষণে মতিউর রহমান দেশের ভয়াবহ রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা আবারও বললেন। সামরিক অভ্যুত্থানের সম্ভাবনার কথা বললেন। 'এদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনে নতুন এক ধারা সৃষ্টি হতে যাচ্ছে, এটা আজ হোক কাল হোক সরকার জানবেই। আমাদের কাগজপত্র যত গোপনে ছাপা বা বিলি হোক না কেন আই বি'র কাছে যাওয়া এখনও আমরা আটকাতে পারিনি। হামলা একটা আসবেই। গোপনীয়তাকে চোখের মণির মতো রক্ষা করুন। একই সঙ্গে গোপনে পার্টি সংগঠন এবং প্রকাশ্যে গণ সংগঠন, গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। অত্যন্ত কঠিন কাজ এটা।

---

*কমিনিউস্টদের আন্তর্জাতিক সঙ্গীত 'জাগো জাগো সর্বহারা . .

একসময় আমরা প্রকাশ্য কাজকে প্রধান করে যেমন ডান বিচ্যুতির দিকে গিয়েছিলাম, সেটাকে ঠেকাতে গিয়ে সবরকম প্রকাশ্য কাজ বর্জন করে আমাদের বাম বিচ্যুতি ঘটেছে। গোপন কাজ আর প্রকাশ্য কাজের মধ্যে সমন্বয় না ঘটাতে পারলে আমরা কখনও জনগণের আস্থাভাজন বিপ্লবী পার্টি গড়ে তুলতে পারবো না।'

অধিবেশন শেষ হওয়ার পর মতিউর রহমান সাইদের সঙ্গে আলোচনা করলেন যত দ্রুত সম্ভব কংগ্রেসের দলিল ছেপে বের করতে হবে। সাইদ চারদিন সময় চাইল। ঠিক হল প্রত্যেক জেলার একজন করে প্রতিনিধি চারদিন অপেক্ষা করে কাগজপত্র নিয়ে এলাকায় যাবে। অন্যরা পরদিন সকালেই ঢাকা ছাড়ল।

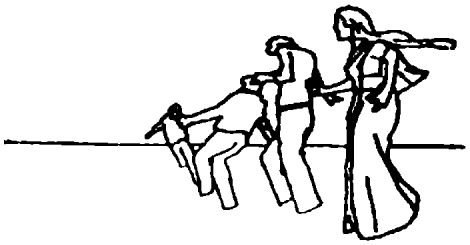

পার্টির কংগ্রেসে গণসংগঠন করার লাইন গৃহীত হবার আগেই পূরবী কক্সবাজারের বড় একটা এলাকা জুড়ে জেলে সমিতি আর কৃষক সমিতির কাজ শুরু করে দিয়েছিল। জাফরকে শুধু কাজে লাগাতে পারেনি। ওর সঙ্গে গত কয়েক দিন দেখাও হয়নি। গভীর সমুদ্রে গিয়ে হাঙ্গর শিকারের নেশায় মেতে আছে সে। প্রতিবার সাত আটদিন করে নৌকায় কাটিয়ে আসে। রোদে পুড়ে, পানিতে ভিজে গায়ের ফর্শা রং কালো হয়ে গেছে। তবে শরীর আরো শক্ত হয়েছে। জাফরের পেছনে সময় নষ্ট না করে পূরবী দিন রাত বৈঠক করেছে। জেলেপাড়ার পুরুষদের বেশির ভাগই এ সময়ে মাছধরায় ব্যস্ত থাকে। তবে আশে পাশের গ্রামে কৃষকদের কোনো কাজ ছিল না। যে জন্যে দিনে কৃষকদের সঙ্গে আলোচনা আর রাতে জেলেদের সঙ্গে— এভাবে রুটিন করে নিয়েছিল পূরবী। বিজনের মা, তারাপিসি, সুচাঁদের মেজো ছেলের বৌ হরিদাসী, ধলাই, রহমত— এদেরকে নিয়ে ঝড়ের মতো গ্রাম থেকে গ্রামে ছুটছিল সে।

পূরবীর সামনে তখন সবচেয়ে বড় ইস্যু ছিল জেলেদের তেভাগার দাবী, যা তারা সত্তর সালেও পেত। তাছাড়া পূরবী জেলেদের সমবায়ের কথাও বলল। বিদেশী ট্রলারের বেহিসেবী চলাফেরার বিরুদ্ধেও জেলেদের ক্ষোভ ছিল। একই ভাবে কৃষক এলাকায় গিয়ে দেখল বন্যার পর বেশির ভাগই ধান লাগাতে পারেনি, বীজধান খেয়ে ফেলেছে। বন্যার সময়ে বেশির ভাগ গরু হয় মারা গেছে, নয় বিক্রি করে ফেলেছে। নতুন কেনার অবস্থা নেই। চালের সের দশ টাকায় উঠেছে, গম সাত টাকা, ঘরে বিক্রি করার মতো যা ছিল সবই গ্রামের মহাজন নয় শহর থেকে আসা দালালদের কাছে বিক্রি করতে হয়েছে। পূরবী শুনল এক বিঘা জমি বিক্রি হয়েছে একশ সোয়াশ টাকায়, এক তোলা সোনা বিক্রি হয়েছে সত্তর, আশি টাকায়। পূরবী বলল, দুর্ভিক্ষের সময় মানুষের অভাবের কারণে যারা পানির দামে জমি বিক্রি করেছে সরকারকে আইন করতে হবে,

সে জমি ফিরিয়ে দেয়ার জন্য। আশু দাবির ভেতর কৃষকরা রিলিফ, বীজধান, সার আর গরু কেনার জন্য ঋণের কথা বলল।

পূরবী ওদের বোঝাল— চাইলেই এসব পাওয়া যাবে না, এর জন্য আন্দোলন করতে হবে, দরকার হলে উনসত্তর সালের মতো ঘেরাও করতে হবে, তবে সবার আগে চাই সংগঠন। সংগঠন ছাড়া আন্দোলন হয় না, আন্দোলন ছাড়া দাবিও আদায় হবে না। যতটা সহজভাবে বোঝানো সম্ভব পূরবী ওদের বোঝাল।

রহমত ওকে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষা শেখানোর দায়িত্ব নিয়েছে। জেলেরা আবার নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষা বলে। ক্রিয়াপদের ব্যবহার এবং উচ্চারণের সামান্য পার্থক্য ছাড়া দুটো ভাষাই এক রকম দুর্বোধ্য। পূরবী দ্রুত ভাষার ব্যবধান কাটিয়ে উঠল। পূরবী আগেও লক্ষ্য করেছে গ্রামে কাজ করার জন্য ভাষা একটা বড় সমস্যা।

উখিয়ার সার্কেল অফিসার বয়স্ক, নিরীহ গোছের লোক। রহমত আর ধলাই যখন তাকে কৃষক আর জেলেদের পক্ষ থেকে দাবি জানিয়ে গণ দরখাস্ত দিল, ভদ্রলোক বললেন, 'বাবারা, এটা তোমরা কক্সবাজার গিয়ে এস ডি ও সাহেবরে দাও। তোমাদের অনেক দাবি ন্যায্য, আমি অস্বীকার করবো না, তবে দেয়ার ক্ষমতা আমার নাই। কিছু দিতে পারেন এস ডি ও সাহেব। আর জমি ফেরত পাওয়ার জন্য আইন লাগবে। ওটা এস ডি ও, ডিসির ক্ষমতার বাইরে।'

পূরবীর সমস্যা দাঁড়াল সমিতির সদস্যদের তালিকাভুক্ত করার। হিসেব করে দেখল দুই সমিতির জন্য ওর পঞ্চাশ হাজার রশিদ দরকার। সদস্য হওয়ার জন্য সবার সঙ্গে পরামর্শ করে এক টাকা ফি ধার্য করা হল। মাঝে মাঝে প্রচণ্ডভাবে রাজুর অভাব বোধ করলেও পূরবী ওর কাজ থামিয়ে রাখল না। বিজনের ছোট ভাই খবর পেয়ে ছুটি নিয়ে তিন দিনের জন্য বাড়ি এসেছিল। পূরবী ওকেই ধরল— 'কক্সবাজার থেকে যদি না পারো, চাটগাঁ চলে যাও। আমাদের এক বন্ধু আছে সেখানে। সাতদিনের ভেতর আমার পঞ্চাশ হাজার সদস্যের জন্য রশিদ বই চাই।'

বহুদিন ধরে ঝিমিয়ে থাকা গ্রামগুলোর ভাঙাচোরা মানুষরা নতুন জীবনের স্পর্শ পেয়ে জেগে উঠল। সবাই ঠিক করল, 'জানুয়ারির চার তারিখে বিশ হাজার কৃষক আর জেলে মিছিল করে কক্সবাজার গিয়ে এস ডি ও-কে দাবি মেনে নেয়ার জন্য স্মারকপত্র দেবে।

তপন বলল, 'মিছিলে ব্যানার, ফেস্টুন এসব থাকবে না দিদি?'

'রাখতে পারলে তো ভালোই হতো। এক কাজ করো। রাজুরা কবে আসবে ঠিক নেই। তুমি বরং চাটগাঁ গিয়ে আনিসকেই খবর দাও। ও ক'দিনের জন্য চলে আসুক। ফিরে এসে তুমি আমাকে দশ বারো সের খবরের কাগজ আর রং এনে দিও। তুমি, আমি, জাফর, আনিস চারজনে বসে একদিনে শ পাঁচেক ফেস্টুন লিখে ফেলতে পারবো।' জাফরকে আটকানোর একটা পথ পাওয়া গেছে ভেবে পূরবী মনে মনে হাসল।

রতন চাটগাঁ যাওয়ার দু'দিন পর রাজু আর দীপু এলাকায় ফিরল। উখিয়া বাজারেই পূরবীদের কাজের খবর পেয়েছিল। রহমত ওদের বাস স্ট্যান্ডে দেখে নাম জিজ্ঞেস

করেছে। পূরবী কয়েকজনকে বলে রেখেছিল ঢাকা থেকে যে কোন সময়ে ওরা আসতে পারে। রাতে বিজনদের বাড়িতে জেলেপাড়ার নেতৃস্থানীয় কয়েকজনের সঙ্গে পূরবী আলোচনা করছিল। ঘরে ঢুকে রহমত চেঁচিয়ে বলল, 'হূরবীদি ঢাকার কমরেডরা চলি আইছে!'

দীপু হেসে বলল, 'পূরবীর কাজ দেখে মনে হচ্ছে বিপ্লবের আর বেশি দেরি নেই।'

পূরবীও হাসল— 'রহমত সব সময় বাড়িয়ে বলে।'

বিজনের মা উঠে ভেতরে গেল রাজুদের খাবারের ব্যবস্থা করতে। রাজু বৈঠকে অন্যান্যদের সঙ্গে আলোচনায় পূরবীর কাজের ধারা দেখে চমৎকৃত হল। বৈঠক শেষ হওয়ার পর কংগ্রেসের খবর দিল পূরবীকে। বলল, 'এবার পার্টির কাজ শুরু করতে হবে।'

পূরবী হাসতে হাসতে বলল, 'ওটার দায়িত্ব তোমাকে আর দীপুকে নিতে হবে। এরা তো সমিতিকেই পার্টি ভেবে বসে আছে!'

রাজু মৃদু হেসে বলল, 'চট্টগ্রাম থেকে আসার পথে প্রচুর আর্মির ট্রাক দেখেছি। তোমাদের প্রোগ্রামের ব্যাপারে কিছু জানাজানি হয়ে গেল নাকি!'

পূরবী ভুরু কুঁচকে বলল, 'জানাজানি হলে ক্ষতি কি! আমরা তো বেআইনী কিছু করছি না!'

সামরিক বাহিনীর তৎপরতা বৃদ্ধির কারণ বোঝা গেল পরদিন রাতেই। সেদিন ছিল ডিসেম্বরের আটাশ তারিখ। রাতে বিজনদের বাড়িতে বৈঠক বসেছিল কক্সবাজার পর্যন্ত মিছিলের প্রস্তুতি চূড়ান্ত করার জন্য। কে যেন খবর শোনার জন্য ট্রানজিস্টার খুলেছিল। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'হূরবীদি হুন, রেডিওয় কি কয়।'

ভলিউম বাড়িয়ে সবাই খবর শুনল— রাষ্ট্রপতি মাহমুদউল্লাহর নির্দেশে সারা দেশে জরুরী অবস্থা জারি করা হয়েছে। কারণ হিসেবে প্রধানত দায়ী করা হয়েছে চরমপন্থীদের, যাদের হাতে আওয়ামী লীগের লোকজন নিহত হচ্ছিল। নির্দিষ্ট ভাবেই বলা হল এ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের পাঁচজন সংসদ সদস্যকে হত্যা করেছে চরমপন্থীরা।

ঘোষক একের পর এক অর্ডিন্যান্সের বিভিন্ন ধারা বর্ণনা করছিলো। অন্যরা এর গুরুত্ব ততটা বুঝতে না পারলেও রাজু, পূরবী আর দীপু হতভম্ব হয়ে বসে রইল। জরুরী অবস্থা ঘোষণার অর্থ ওদের কাছে খুবই পরিষ্কার মনে হল। নির্যাতনের মাত্রা আরও বাড়বে। পূরবী তিক্ত হেসে বলল, 'আইনী আন্দোলনের সব পথ এরা বন্ধ করে দিচ্ছে।'

ধলাই বলল, 'আঙ্গো মিছিল ওইতো ন হূরবীদি?'

পূরবী চিন্তিত মুখে বলল, 'দু'একদিন গেলে কইতে ফারুম। তোমরা চাইরদিকে নজর রাখ। অচেনা কোন মানুষ এলাকায় ঢুইকলে খবর নিবা।'

রাতে জাফরের ব্যাপারে রাজুর সঙ্গে কথা বলল পূরবী। রাজু বলল, 'আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে যেভাবেই হোক জাফরকে মুক্ত করতে হবে।'

পূরবী ম্লান হেসে বলল, 'আমি তো চেষ্টা করেও পারলাম না। দেখো, তুমি পারো কিনা।'

দীপু বলল, 'রাজু কখনও লক্ষ্য করেছো কিনা জানি না, জাফর শিকারের গল্প করতে ভালোবাসতো সব সময়। আমার মনে হয় খতমটাকে ও একটা চ্যালেঞ্জিং শিকার হিসেবে নিয়েছে। যদিও পরে কষ্ট পেয়েছে এর জন্য। কিন্তু ভেতরে একটা নেশা সব সময় থেকে গেছে।'

রাজু বিরক্ত হয়ে বলল, 'জাফরকে এসব ছাড়তে হবে। এখন আমাদের যা অবস্থা, কোন পেটিবুর্জোয়া বিলাস প্রশ্রয় দেয়া যাবে না।'

দু'দিন পর রহমত খবর আনল উখিয়ায় আবার নতুন করে আর্মি ক্যাম্প বসানো হয়েছে। বাসের লোকজনদের নামিয়ে দেহতল্লাশী চালানো হচ্ছে। গতকাল তিনটি ছেলেকে বাস থেকে নামিয়ে নিয়ে গেছে।

পূরবী রতনের কথা ভেবে উদ্বেগ বোধ করল। রশিদ বইর সঙ্গে লিফলেটও ছেপে আনার কথা। রাজু বলল, 'আনিসের কাছে যখন পাঠিয়েছো, ভয়ের কিছু নেই। আমার মনে হয় না আনিস এখন লিফলেট নিয়ে এলাকায় আসবে।'

জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর থেকে নিয়মিত রেডিয়োর খবর শুনতো ওরা। চারদিন পর আরেকটা ভয়াবহ সংবাদ শুনল। সেটা ছিল সিরাজ সিকদারের গ্রেফতার এবং মৃত্যুর সংবাদ। খবরে বলা হল পালাবার চেষ্টা করাতে পুলিশ নাকি বাধ্য হয়ে গুলি করেছে।

রাজু কিছুক্ষণ বজ্রাহতের মতো বসে থেকে বলল, 'ঠান্ডা মাথায় গুলি করে হত্যা করেছে।'

দীপু উত্তেজিত হয়ে বলল, 'কিন্তু ধরা পড়লেন কিভাবে! আমিতো শুনেছি ওদের পার্টিতে সবচেয়ে বেশি গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।'

রাজু বলল, 'দলের কেউ নিশ্চয় বিট্রে করেছে। রহমান ভাই'র সঙ্গে যোগাযোগ করা দরকার।'

পূরবী বলল, 'তপনের সঙ্গে যদি আনিস আসে তাহলে খবর পাওয়া যাবে।'

রাজু বলল, 'মিছিলের প্রোগ্রাম বাদ দিয়ে দাও পূরবী। জাফর ফিরে এলে ওকে নিয়ে আমি ঢাকা যাবো।'

সাতদিন পর জাফর ফিরল সমুদ্র থেকে। রাজুর কাছে জরুরী অবস্থা ঘোষণা আর সিরাজ সিকদারের হত্যার সংবাদ শুনে পাথরের মতো জমে গেল সে। অনেকক্ষণ পর স্খলিত কণ্ঠে বলল, 'আমরা এখন কি করবো?'

রাজু কংগ্রেসের কথা বলল— 'আমাদের কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে, যত দ্রুত পারা যায়।'

পরদিন শুকনো মুখে রতনের সঙ্গে আনিস এল এলাকায়। খালি হাতেই এসেছে। আনিসের চেহারা দেখে ওরা মনে মনে দুঃসংবাদ শোনার জন্য প্রস্তুত হল। কোনোরকম ভূমিকা না করে আনিস বলল, 'ঢাকায় রহমান ভাই, রফিক ভাই সহ ছত্রিশ জন ধরা পড়েছে। গত রাতে ঢাকা থেকে টেলিফোনে খবর জানিয়েছে সাইদ। পটুয়াখালীতে কেন্দ্রের জরুরী বৈঠক বসবে। তোমাদের বলেছে সেখানে চলে যেতে।'

জাফর বলল, 'কিভাবে ধরা পড়লেন বলেনি কিছু?'

'মানু বিট্রে করেছে।' আনিস ঠান্ডা গলায় বলল, 'আগের দিন মানু ধরা পড়েছিল। সেই নাকি কয়েকটা শেল্টারের কথা বলে দিয়েছে।'

ঠিক হল ওরা পরদিন ভোরেই জেলেদের নৌকায় সমুদ্র পথে পাড়ি জমাবে পটুয়াখালীর দিকে। ধলাই বলল, 'আমনেরা কোন চিন্দা করিয়েন না কমরেড, মাছ ধইরতে ধইরতে আমনেরগোরে লই ঠিকই জাগামত চলি যামু।'

নেতৃস্থানীয় সবাইকে কাজ বুঝিয়ে দিয়ে ওরা ঘুমোতে গেল রাত দুটোর দিকে। তিন ঘন্টাও ঘুমোতে পারেনি— রহমত এল আরেক বিপদের খবর নিয়ে। আর্মি এলাকা ঘিরে ফেলেছে। ওদের কাছে নাকি খবর এসেছে এই এলাকায় কয়েকজন চরমপন্থী আছে। শুনে দাঁতে দাঁত ঘষে রাজু বলল, 'কর্ডন ভেঙেই আমরা বেরুবো। রহমত আর ধলাই, গ্রামের সবাইকে খবর দাও এখানে আসার জন্য।'

তখনও সূর্য ওঠেনি। পুবের আকাশটা সামান্য ফ্যাকাশে হয়েছে মাত্র। খবর পেয়ে আশে পাশের গ্রাম থেকে সবাই দলে দলে আসতে লাগল।

তারাপিসি গিয়ে একটা ভালো খবর আনল, আর্মি সংখ্যায় বেশি নয়। ঘন্টা খানেকের জন্য ওদের ঠেকিয়ে রাখা কঠিন হবে না। রাজুদের কাছে অস্ত্র বলতে দুটো পিস্তল আর রাউন্ড পনেরো গুলি। তারাপিসি বলল, 'চিন্দা করিও না হূরবী। আমরা আছি না? দা, কুড়াইল, বল্লম যা আছে লই বাইর ওমু। মেলেটারি ক্যান্নে তোমগোরে ধরে দেখুম!'

জেলে পাড়ায় বাড়িগুলো বেশ ফাঁকা ফাঁকা। বাড়িতে গাছপালাও বেশি নেই। ওরা বিজনদের বাড়িতে বসেই দূরে কয়েকজন সৈন্যকে পজিশন নেয়া অবস্থায় দেখল। নৌকাগুলো যেখানে বাঁধা সেখানেও তিনজন সৈন্য পজিশন নিয়ে বসেছিল।

রহমতকে দিয়ে খবর পাঠাবার ঘন্টা খানেকের মধ্যে কয়েক হাজার লোক এসে জড় হয়েছে। গোটা জেলেপাড়া লোকে লোকারণ্য। হঠাৎ একটা বন্দুকের গুলির শব্দ হল। সুচাঁদ বুড়ো এল ছুটতে ছুটতে— সর্বনাশ করেছে মন্ডলের ছেলে। ওই নাকি গুলি ছুঁড়েছে।

গুলি কারো গায়ে লেগেছে কিনা বোঝা গেল না কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই পাল্টা গুলি এল। সুচাঁদের বাড়ি লক্ষ্য করে রাইফেল তাক করে কয়েক রাউন্ড গুলি ছুঁড়ল আর্মি। দীপু দাঁড়িয়েছিল সুচাঁদের ঘরের বারান্দায়। বুকে গুলি খেয়ে চোখের পলকে ছিটকে পড়ল উঠোনে।

কয়েক মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গেল কয়েক হাজার মানুষ। তারাপিসি হঠাৎ আকাশফাটা চিৎকার করে উঠল— 'দীফুরে মারি হালাইছে।'

ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা গেল কয়েক হাজার মানুষের কণ্ঠে। গুলি ছুঁড়ে এদিকে এগিয়ে আসছিল দশ বার জন সৈন্য। সহসা সহস্র কণ্ঠে সেই ক্রুদ্ধ গর্জন শুনে ওরা থমকে দাঁড়াল। সমুদ্রের গর্জনের চেয়ে বিশাল সেই শব্দ ওদের গিল খেতে চাইল। সৈন্যদের সামনে ছিল অফিসার গোছের একজন। দেখলেই বোঝা যায় সেই

দলপতি। রাজু আর পূরবী তারাপিসির চিৎকার শুনে বিজনদের বাড়ি থেকে ছুটে এসেছে। জাফর তাকিয়ে দেখল দীপুর ঘাতকদের। দীপুর পিস্তলটা ওর কাছেই ছিল। ভিড় ঠেলে এগিয়ে কাছে গিয়ে পর পর দু'বার গুলি করল অফিসারকে লক্ষ্য করে। অফিসার পড়ে যেতেই স্টেনগানের এক ঝাঁক গুলি ওর শরীরটাকে ঝাঁঝরা করে দিল।

এবার আর শুধু ক্রুদ্ধ গর্জন নয়। কয়েক হাজার মানুষ একসঙ্গে ছুটে গেল সৈন্যদের লক্ষ্য করে। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো লক্ষ লক্ষ মানুষ ছুটে আসছে চারপাশের গ্রাম থেকে। জাফরের মনে হল সে বুঝি সমুদ্রের ঢেউয়ের ভেতর তলিয়ে যাচ্ছে। পূরবী ছুটে এসে ওকে ধরল। রক্তে ভেসে যাচ্ছে ওর সারা শরীর। আস্তে আস্তে ওকে শুইয়ে দিল মাটিতে। জাফর অস্ফুট কণ্ঠে বলল, 'পূরবী।'

ওর মাথাটা দুই হাতে বুকে চেপে ধরল পূরবী। কিছুই বলতে পারল না। দুচোখ বেয়ে কান্নার বাঁধভাঙা স্রোত নেমেছে। পূরবীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সব কিছু ঘন কুয়াশার মতো ঝাপসা মনে হল জাফরের। চোখ বোজার আগে মনে হল— একটা সাদা বুনোহাঁস হয়ে সে উড়ে যাচ্ছে বিশাল এক মহাসমুদ্রের দিকে।

সৈন্যরা এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে দ্রুত পিছু হটে গেছে। গুলি খেয়ে জেলেপাড়ার বেশ কয়েকজন পড়ে গেছে। রাজু সুচাঁদের দলবল নিয়ে উত্তাল জনসমুদ্রকে নিয়ন্ত্রণে আনল।

আর সময় নেই। সৈন্যরা অয়ারলেসে কক্সবাজার খবর পাঠালে এক ঘন্টার ভেতর কয়েক'শ সৈন্য এসে পড়বে। সুচাঁদ পূরবীকে বলল, 'দেরি করিও না মা! তোমরা রওনা অও।'

সুচাঁদ, রহমত, তারাপিসি, বিজনের মা, ধলাই, হরিদাসী সবার চোখে কান্না। রহুমত বলল, 'কমরেড জাফর আর কমরেড দীফুরে আমরা লাল কাফড়ের কাফন হিন্দাই কবর দিমু হূরবীদি।'

শেষবার প্রিয় সঙ্গীদের দেখল রাজু আর পূরবী। সুচাঁদের উঠোনে রাখা হয়েছে জাফর আর দীপুর লাশ। কান্নার স্রোত কারো চোখেই বাধা মানছিল না। পূরবী হাঁটু গেড়ে বসল জাফরের পাশে। সন্তর্পনে হাত ছোঁয়াল ওর চোখে!

জাফরকে বলা হয়নি ওর সন্তানের মা হতে যাচ্ছে পূরবী। দীপুর মা আর হাসিনা কতদিন অপেক্ষা করবে তিতাসের তীরের গ্রামে বসে কে জানে! ওতো বলেছিল ফিরে আসবে।

রাজু, আনিস আর পূরবী যখন নৌকায় উঠল, সমুদ্রের তীরে তখন কয়েক হাজার মানুষ। দূর থেকে বাইনোকুলারে ওদের দেখে হতভম্ব সুবেদার সৈন্যদের ক্যাম্পে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিল।

বাতাস দেখে নৌকায় পাল তুলে দিল ধলাই। দীপু যেভাবে ওর মাকে বলেছিল, ঠিক সেভাবে সমুদ্রের তীরে অপেক্ষমান মানুষদের রাজু বললো, 'আমরা আবার আসবো।'

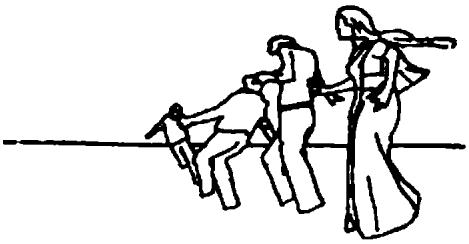

পুনশ্চ

গ্রেফতারের পর মতিউর রহমান আর জাফরকে বিশেষভাবে জেরা করার জন্য মালিবাগে গোয়েন্দা বিভাগের সাদা বাড়িতে আনা হয়েছিল। রফিককে গ্রেফতার করা হয়েছে গ্রীন রোডের এক শেল্টার থেকে আর মতিউর রহমানকে বনগ্রাম থেকে। বনগ্রামের এই শেল্টার মানু চিনতো।

সাদা বাড়িতে এনে রাতে কয়েক ঘন্টার জন্য মতিউর রহমানকে যে খুপরির মতো ঘরে ঢোকানো হল— সেখানে দেখলেন রফিক বসে আছে। রাগে তাঁর পিত্ত জ্বলে গেল। নিষ্ঠুর হেসে বললেন, 'যোগ্য নেতাই বানিয়েছিলে তোমার লেফটেন্যান্ট মানুকে। ধরা পড়া মাত্র হড় হড় করে সব নাম বলে দিয়েছে।' ক্ষোভে দুঃখে কথা বলতে পারছিলেন না মতিউর রহমান। মাথায় হাত দিয়ে গুম হয়ে অনেকক্ষণ বসে থেকে বিড় বিড় করে বললেন, 'সব শেষ হয়ে গেল!'

রফিক তাঁর কাছে এসে কাঁধে হাত রেখে বলল, 'এভাবে ভেঙে পড়লে চলবে কেন রহমান ভাই!'

মতিউর রহমান কিছুটা বিস্ময়ের সঙ্গে তাকালেন রফিকের দিকে— 'কি বলতে চাও তুমি!'

'গ্রেফতারের পর গত চব্বিশ ঘন্টা অনেক ভেবেছি রহমান ভাই। সি এম লাইন ভুল না সঠিক এ নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলবো না। তবে আমি মনে করি এদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনে আমার চেয়ে আপনার প্রয়োজন অনেক বেশি। আপনার বিরাট গণভিত্তি আছে, যোগ্যতা আছে। গায়ের জোরে সব কিছু অস্বীকার করে যে ভুল করেছি, শোধরাবার যদি পথ থাকতো শুধরে নিতাম।' কথা বলতে বলতে গলা ধরে এল রফিকের। কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, 'শেষবারের মতো বিপ্লবের জন্য কিছু করার সুযোগ দিন আমাকে। বলুন কিভাবে আপনাকে বাঁচাতে পারি!'

রফিককে কি বলবেন কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না মতিউর রহমান। রফিক কি সত্যিই তাঁকে বাঁচাতে পারবে? গ্রেফতারের পর তিনি নিশ্চিত ধরে নিয়েছেন জেরা করা শেষ হলে নিয়ে মেরে ফেলবে— সিরাজ সিকদারকে যেভাবে মেরেছে। হঠাৎ বাঁচার একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা দেখা দিল মনের ভেতর। কিছুটা উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'জেরার সময় একটা কথা ওদের বলতে পারো রফিক। তুমি ওদের বলো যে— আমাকে পার্টি থেকে বের করে দিয়েছো খতমের লাইনের বিরোধিতা করার জন্য। আমাকে সহ সিএম বিরোধীদের তোমরা খতমের সিদ্ধান্ত নিয়েছো। আমি বলবো আমরা আইনী সংগঠন করতে চাই।'

ম্লান হেসে রফিক বলল, 'আপনি যদি এতে বাঁচতে পারেন তাই বলবো।'

রফিক ওর কথা রেখেছিল। জেরার সময় পুলিশ অফিসারের সঙ্গে কথা বলল পার্টি সম্পাদকের কর্তৃত্ব আর মর্যাদা নিয়ে। পার্টির সাংগঠনিক অবস্থান সম্পর্কে একটা কথাও ওর কাছ থেকে বের করা যায়নি। তবে রাজনীতির কথা বলল কোন কিছু গোপন না করেই। পাবনায় আওয়ামী লীগের এমপিকে হত্যার কথাও বলল। আরও বলল একবার বেরোতে পারলে এই লাইনই অনুসরণ করবে।

কথা বের করার জন্য সাতদিন সাতরাত রফিকের ওপর যে নারকীয় নির্যাতন চালানো হয়েছিল— সভ্য মানুষ মাত্রেই আতঙ্কিত হবেন তার বিবরণ শুনলে।

রফিকের বাড়ি ছিল সিরাজগঞ্জে। দশদিন পর সিরাজগঞ্জের রেল স্টেশনের ধারে হাত পা বাঁধা মস্তকবিহীন একটি লাশ পড়ে থাকতে দেখা গেল। সারা শরীরে অত্যাচারের নির্মম স্বাক্ষর।

আপন সন্তানের লাশ সনাক্ত করতে রফিকের মায়ের কোন অসুবিধে হয়নি।

ওদের কারও বয়স পঁচিশের বেশি নয়।
ওরা মুক্তিযুদ্ধ করেছে। দেশ ও সমাজের প্রতি অঙ্গীকার,
শ্রমজীবী মানুষের জন্য ভালোবাসা,
অধঃপতিত বিত্তবিলাসীদের প্রতি ঘৃণা
ওদের টেনে এনেছে রাজনীতিতে।
মুক্তিযুদ্ধের পর ওরা নিজেদের আবিস্কার করে
এক বৈরি সমাজে, প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিবেশে।
ওরা নিগ্রহের শিকার হয় রাষ্ট্রের, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে
সেই মানুষদের কাছ থেকেও যাদের জন্য লড়তে তারা
জীবন দিতেও কুণ্ঠিত নয়। জনবিচ্ছিতার উপলব্ধি
ওদের জন্য সৃষ্টি করে নতুন সংকট। দলের নেতৃত্বের কাছে
ওরা চিহ্নিত হয় বিশ্বাসঘাতক হিসাবে।
ওরা পালাচ্ছে-তাড়া করছে রাষ্ট্র এবং নিজ দলের ঘাতকরা।
রাজু, পূরবী, জাফর, দীপু, তাদের মতো আরও অনেক
তরুণ তাজা প্রাণ-ওরা কি পেরেছিলো
ঈপ্সিত গন্তব্যে পৌঁছতে?
সত্তর দশকের শুরুতে যে রাজনীতি এই উপমহাদেশে
প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো,
যার ঢেউ বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও পৌঁছেছিলো,
সেই 'নকশাল' আন্দোলনের পটভূমিতে লেখা
বাংলাদেশের প্রথম প্রামাণ্য উপন্যাস
ওদের জানিয়ে দাও।